সেরা সব
ডাকাতের গল্প

সেরা সব
ডাকাতের গল্প

উত্থানপদ বিজলী
সম্পাদিত
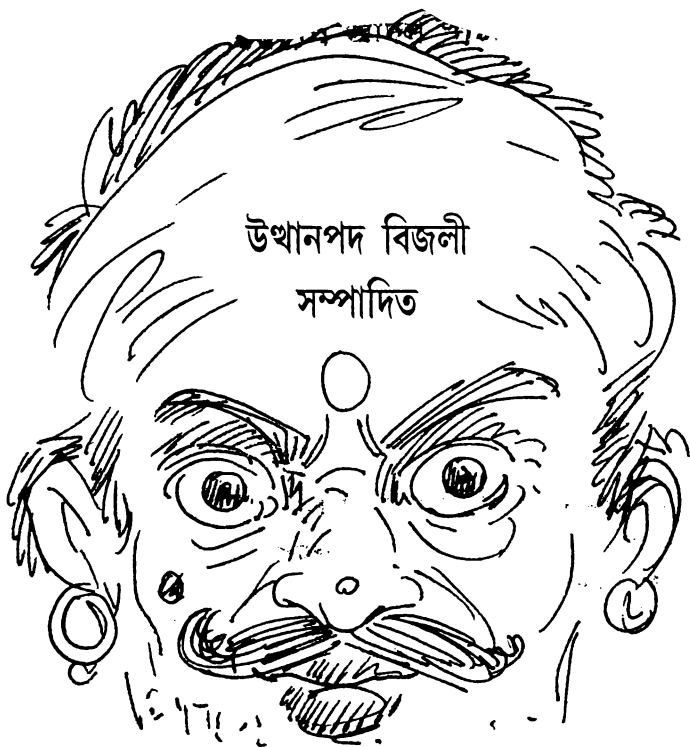
অভিষিক্তা পাবলিকেশন

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
২৪এ, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

SERA SAB DAKATER GALPA

Edited by :

UTTHANPADA BIJALI

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০৬

প্রকাশক :
আশীষ মোদক
২৪এ, কলেজ রো,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

অলংকরণ : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস ঃ অভিজিৎ সাঁতরা ও সুদীপ্ত

মুদ্রণ ঃ
আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স
২৪৩/২সি, এ.পি.সি. রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

ডাকাতের গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুপ্তিপাড়ার বিশ্বম্ভরবাবু পাল্‌কি চ'ড়ে চলেছেন সপ্তগ্রাম। ফাল্গুন মাস। কিন্তু এখনো খুব ঠাণ্ডা। কিছু আগে প্রায় সপ্তাহ ধ'রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিশ্বম্ভরবাবুর গায়ে এক মোটা কম্বল। পাল্‌কির সঙ্গে চলেছে তাঁর শম্ভু চাকর, হাতে এক লম্বা লাঠি। পাল্‌কির ছাদে ওষুধের বাক্স, দড়ি দিয়ে বাঁধা। শম্ভুর গায়ে অদ্ভুত জোর। একবার কুম্ভীরার জঙ্গলে তাকে ভল্লুকে ধরেছিল। সঙ্গে বন্দুক ছিল না। শুদ্ধ কেবল লাঠি নিয়ে ভল্লুকের সঙ্গে তার যুদ্ধ হ'ল। শম্ভুর হাতের লাঠি খেয়ে ভল্লুকের মেরুদণ্ড গেল ভেঙে। তার আর উত্থানশক্তি রইল না। আর-একবার শম্ভু বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে গিয়েছিল স্বর্ণগঞ্জে। সেখানে পদ্মানদীর চরে রান্না চড়াতে হবে। তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন। পদ্মার ধারে ছোটো ছোটো ঝাউ গাছের জঙ্গল। উনান ধরানো চাই। দা দিয়ে শম্ভু ঝাউডাল কেটে আঁটি বাঁধল। অসহ্য রৌদ্র। বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে। নদীতে শম্ভু জল খেতে গেল। এমন সময় দেখলে, একটা বাছুরকে ধরেছে কুমীরে। শম্ভু এক লম্ফে

জলে প'ড়ে কুমীরের পিঠে চ'ড়ে বসল। দা দিয়ে তার গলায় পোঁচ দিতে লাগল। জল লাল হয়ে উঠল রক্তে। কুমীর যন্ত্রণায় বাছুরকে দিল ছেড়ে। শম্ভু সাঁতার দিয়ে ডাঙায় উঠে এল।

বিশ্বম্ভরবাবু ডাক্তার। রোগী দেখতে চলেছেন বহু দূরে। সেখানে ইস্‌টিমার ঘাটের ইস্‌টেশন-মাস্টার মধু বিশ্বাস। তাঁর ছোটো ছেলের অম্লশূল, বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

বিষ্ণুপুরের পশ্চিম ধারের মাঠ প্রকাণ্ড। সেখানে যখন পাল্‌কি এল তখন

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাখাল গোরু নিয়ে চলেছে গোষ্ঠে ফিরে। বিশ্বম্ভরবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে বাপু, সপ্তগ্রাম কত দূরে বলতে পার?"

রাখাল বললে, "আজ্ঞে, সে তো সাত ক্রোশ হবে। আজ সেখানে যাবেন না। পথে ভীষ্মহাটের মাঠ, তার কাছে শ্মশান। সেখানে ডাকাতের ভয়।"

ডাক্তার বললেন, "বাবা, রোগী কষ্ট পাচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।"

তিপ্পনি খালের ধারে যখন পাল্‌কি এল রাত্রি তখন দশটা। বাঁধন আলগা হয়ে পাল্‌কির ছাদ থেকে ডাক্তারের বাক্সটা গেল প'ড়ে। ক্যাস্টর অয়েলের

শিশি ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। বাক্সটা তো ফের শক্ত ক'রে বাঁধলে। কিন্তু আবার বিপদ। খাল পেরিয়ে আন্দাজ দু ক্রোশ পথ গেছে, এমন সময় মড় মড় ক'রে ডাণ্ডা গেল ভেঙে, পাল্‌কিটা পড়ল মাটিতে। পাল্‌কি হালকা কাঠে তৈরি। বিশ্বম্ভরবাবুর দেহটি স্থূল।

আর উপায় নেই, এইখানেই রাত্রি কাটাতে হবে। ডাক্তারবাবু ঘাসের উপর কম্বল পাতলেন, লণ্ঠনটি রাখলেন কাছে। শম্ভুকে নিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

এমন সময় বেহারাদের সর্দার বুদ্ধু এসে বললে, "ঐ-যে কারা আসছে, ওরা ডাকাত সন্দেহ নেই।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "ভয় কী, তোরা তো সবাই আছিস।" বুদ্ধু বললে, "বল্লু পালিয়েছে, পল্লুকেও দেখছিনে। বক্সি লুকিয়েছে ঐ ঝোপের মধ্যে। ভয়ে বিষ্ণুর হাত-পা আড়ষ্ট।"

শুনে ডাক্তার তো ভয়ে কম্পিত। ডাকলেন, "শম্ভু।"

শম্ভু বললে, "আজ্ঞে।"

ডাক্তার বললেন, "এখন উপায় কী?"

শম্ভু বললে, "ভয় নেই, আমি আছি।"

ডাক্তার বললেন, "ওরা যে পাঁচজন।"

শম্ভু বললে, "আমি যে শম্ভু।" এই ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে এক লম্ফ দিলে, গর্জন ক'রে বললে "খবর্দার"।

ডাকাতেরা অট্টহাস্য ক'রে এগিয়ে আসতে লাগল। তখন শম্ভু পাল্‌কির সেই ভাঙা ডাণ্ডাখানা তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারলে। তারি এক ঘায়ে তিনজন একসঙ্গে পড়ে গেল। তার পরে শম্ভু লাঠি ঘুরিয়ে যেই ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি দুজনে দিল দৌড়।

তখন ডাক্তারবাবু ডাকলেন, "শম্ভু।"

শম্ভু বললে, "আজ্ঞে।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "এইবার বাক্সটা বের করো।"

শম্ভু বললে, "কেন, বাক্স নিয়ে কী হবে?"

ডাক্তার বললেন, "ঐ তিনটে লোকের ডাক্তারি করা চাই। ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।"

রাত্রি তখন অল্পই বাকি। বিশ্বম্ভরবাবু আর শম্ভু দুজনে মিলে তিনজনের শুশ্রূষা করলেন।

সকাল হয়েছে। ছিন্ন মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্যের রশ্মি ফেটে পড়ছে। একে একে সব বেহারা ফিরে আসে। বল্লু এল, পল্লু এল, বক্সির হাত ধরে এল বিষ্ণু, তখনো তার হৃৎপিণ্ড কম্পমান।

বিনুর জলপান

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদ যখন সেকেন্ড ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাসে উঠল, তখন তার স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'বিনু, এখন থেকে তোমাকে স্কুলের মাইনে দিতে হবে; না দিলে নাম কাটা যাবে।'

বিনুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে ভারি গরিবের ছেলে; মাইনে দিয়ে স্কুলে পড়বার তার ক্ষমতা নেই। এতদিন সে বিনা বেতনেই পড়েছে। কিন্তু আজ হঠাৎ এ কী হল? সে ক্ষীণস্বরে বললে, 'কিন্তু স্যার, আমি তো বেশ ভালো করেই পাশ করেছি।'

হেডমাস্টার মহাশয় দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'সে আমি জানি বিনু; তুমি ভালো ছেলে। আমার যদি কোনো হাত থাকত তা হলে আমি তোমায় জলপানি দিতাম—কিন্তু—'বলে তিনি আবার মাথা নাড়লেন।

বিনু ধরা ধরা গলায় বললে, 'আমি কি কোনো দোষ করেছি, স্যার?'

মাস্টারমহাশয় বিনুর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'না, তুমি কোনো দোষ করোনি। কিন্তু তোমার বাবা—' এই পর্যন্ত বলে কথাটা পালটে নিয়ে বললেন, 'এর ভেতর অনেক কথা আছে, তুমি ছেলেমানুষ, সব বুঝবে না। আমি বলি তুমি এক কাজ করো। জমিদার ভূপতিবাবু হচ্ছেন স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট, তুমি তাঁকে গিয়ে ধরো। তিনি যদি হুকুম দেন তা হলে আর কোনো গোল থাকবে না।'

বিনু আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল। দশখানা গ্রামের মধ্যে এই একটি হাই স্কুল। বিনুর কত আগ্রহ, কত উৎসাহ ছিল, এখন থেকে জলপানি পেয়ে যদি পাশ করতে পারে তাহলে কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়বে। বি.এ., এম.এ পাশ করে আবার গ্রামে ফিরে আসবে। কিন্তু এখন? কলেজে পড়া তো দূরের কথা, স্কুলের মাইনে জোগাবে সে কোথা থাকে? তার বাবা অন্যধরনের লোক। বিনু লেখাপড়া ছেড়ে দিলেই বোধ হয় তিনি বেশি খুশি হন। তিনি কেবল দুনিয়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াতে ভালোবাসেন। বিনু নিজের আগ্রহেই এতদূর পর্যন্ত পড়তে পেরেছে—বাবাকে পড়ার খরচ দিতে হলে কোনকালে স্কুল ছেড়ে দিতে হত।

রাস্তায় যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল, জমিদার ভূপতিবাবু বেশ ভালো লোক—খুব দয়ালু আর ধার্মিক। তিনি কি তার এই সামান্য প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন না? তাঁর এত টাকা আছে—তা থেকে কয়েকটি টাকা তিনি মাসে মাসে বিনুকে দেবেন না? ভূপতিবাবুর দয়ার ওপরেই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে— ভাবতে ভাবতে বিনুর চোখ দিয়ে জল পড়ল।

জমিদারবাড়িতে গিয়ে সে দেখলে, ভূপতিবাবু বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক খাচ্ছেন। সে বিনীতভাবে নমস্কার করে দাঁড়াতেই জমিদারবাবু তার দিতে ফিরে বললেন, 'কী চাও?'

বিনু সংকুচিতভাবে থেমে থেমে নিজের বক্তব্য বললে। নিজের দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করতে তার ভারি লজ্জা করতে লাগল—কিন্তু তবু সে সব কথা বললে। লেখাপড়ার দিকে তার এত আগ্রহ যে সেজন্য সে আগুনে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করত না।

সমস্ত শুনে জমিদার ভূপতিবাবু বললেন, 'হুঁ'। তুমি হারাণ হালদারের ছেলে না?'

ক্ষীণস্বরে বিনু বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জমিদার প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বাবা তোমার স্কুলে মাইনে দিতে পারে না?'

বিনু চুপ করে রইল।

জমিদার তখন চড়া সুরে বললেন, 'ছেলের স্কুলের মাইনে যে দিতে পারে না, সে জমিদারের সঙ্গে মামলা করতে আসে কোন সাহসে?'

একথার বিনু কী উত্তর দেবে? সে ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার বুকের মধ্যে কান্না গুমরে উঠতে লাগল।

জমিদারবাবু ফটকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'যাও। এখানে কিছু হবে না।'

গ্রামের পূর্বদিকে তিন-চার মাইল জায়গা জুড়ে জঙ্গল। আগে বোধ হয় ওই জায়গাটায় কোনো বড় শহর ছিল। তারপর ভূমিকম্প বা ওইরকম কোনো কারণে নগর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখনও জঙ্গলে ঢুকলে বড় বড় বাড়ির ইট পাথর স্তূপীকৃত হয়ে আছে দেখা যায়। সেইসব ভাঙা ইমারতের ফাটলে ফাটলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট অশ্বত্থ আরও কতরকম গাছ গজিয়েছে। কেবল একটি পাথরের কালীমন্দির এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে অটুট আছে—এমনকী তার লোহার ভারী দরজাটা পর্যন্ত নষ্ট হয়নি। কিন্তু দিনের বেলায় এখানে অন্ধকার হয়ে থাকে—জঙ্গলের ঘন পাতা আর ডালপালা ভেদ করে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। গ্রামের লোকেরা সহজে এ জঙ্গলে ঢুকতে চাইত না; তবে মেয়েরা কখনো মানতের পুজো দেবার জন্যে কালীমন্দিরে যেত—কিন্তু সন্ধে হবার আগেই আবার গ্রামে ফিরে আসত। সন্ধ্যের পর এ জঙ্গলে ঢোকবার কারও সাহস ছিল না।

এই জঙ্গলটি ছিল বিনুর বেড়াবার জায়গা। দিনের বেলা একটু অবকাশ পেলেই সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ত। বনের মাঝখানে কালীমন্দিরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড উঁচু অশ্বত্থ গাছ ছিল। তার মাথা অন্যসব গাছের মাথা ছাড়িয়ে গ্রাম থেকে দেখা যেত। এই গাছটি ছিল বিনুর বৈঠকখানা। ছুটির দিনে সে বই পকেটে করে সেই গাছে গিয়ে উঠত। গাছের প্রায় মগডালের কাছে সে দড়ি দিয়ে একটি দোলনা বানিয়েছিল। তাইতে আরাম করে বসে সে বই পড়ত—ঘুম পেলে ঘুমিয়েও নিত। তার এই গোপন আস্তানাটির কথা কেউ জানত না।

সেদিন বিকেলবেলা জমিদারবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিনু বাড়ি গেল না। পা দুটো তার অজান্তেই তাকে বনের দিকে টেনে নিয়ে চলল। জমিদারবাবুর কড়া কথাগুলো তার প্রাণে বিঁধেছিল; কিন্তু তার চেয়েও বেশি কষ্ট দিচ্ছিল তাকে এই চিন্তা যে সে আর পড়তে পাবে না। কোথায় পাবে সে টাকা? বাবাকে বলতে গেলে তিনি বলবেন, 'ঢের ল্যাখাপড়া হয়েছে; এবার আদালতের মুহুরির কাজ শেখো। কাল থেকে আমার সঙ্গে সদরে বেরোতে হবে।' বাবার সঙ্গে মোকদ্দমার কাগজ বগলে করে সদরে যেতে হবে, ভাবতেই বিনুর চোখ জলে ভরে উঠল।

ঘনঘন চোখের জল মুছতে মুছতে যখন সে তার প্রিয় গাছটির তলায় গিয়ে দাঁড়াল তখন সন্ধে হতে আর দেরি নেই—গাছের নীচে অন্ধকার জমাট বেঁধে এসেছে। কিন্তু তবু বাড়ি ফিরে যেতে আজ তার মন সরল না। সে গাছে উঠে দোলনার ওপর চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। গাছের মগডালে তখনও বেশ আলো আছে; সেখান থেকে জমিদারবাবুর উঁচু পাকা বাড়িটা স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছে।

ভেবে ভেবে বিনু কোনো কূলকিনারা পেল না। জমিদারবাবুর ওপর বিনু রাগ করতে পারেনি, শুধু নিজের ব্যর্থ জীবনের কথাই সে ভাবছিল। ক্রমে রাত্রি ঘনিয়ে এল। পাখিরা যে যার বাসায় রাত্রির মতো আশ্রয় নিলে। তখন সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামতে আরম্ভ করলে।

যখন সে গাছের প্রায় গুঁড়ির কাছ পর্যন্ত নেমেছে তখন হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

নীচের অন্ধকারে হাঁড়ির মতো গলায় কে বললে, 'গঙ্গারাম বাতি জ্বাল।'

কিছুক্ষণ পরে একটা ধোঁয়াটে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলল। বিনু ছিল মাটি থেকে প্রায় পনেরো হাত উঁচুতে, সে ঘন পাতার আড়াল থেকে গলা বাড়িয়ে দেখলে দু-জন ভীষণ কালো আর ষণ্ডা লোক ঠিক তার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, হাতে সড়কি লাঠি। তাদের মধ্যে যে লোকটা সবচেয়ে জোয়ান আর কালো, তার কোমরে তলোয়ার বাঁধা। তাদের চেহারা দেখেই বিনু বুঝলে—এরা ডাকাত, ওই তলোয়ার-বাঁধা লোকটা এদের সর্দার।

গাছের ওপর একজন লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কার্যকলাপ দেখছে, এ যদি ডাকাতরা জানতে পারত, তাহলে বিনুর প্রাণের আর কোনো আশা থাকত না, তখনই তাকে কেটে তারা মাটিতে পুঁতে ফেলত। তাই বিনুর বুকের ভেতর যদিও ধড়াস ধড়াস করছিল, তবু সে মাটির পুতুলের মতো নিশ্চল হয়ে বসে রইল—একটু নড়লে চড়লে পাছে শব্দ হয়।

ডাকাতের দল লণ্ঠন ঘিরে বসল। সর্দার বললে, 'আমি সব খবর নিয়েছি। দেউড়িতে দুজন খোট্টা দারোয়ান থাকে; কিন্তু খিড়কির দরজায় কেউ পাহারা দেয় না—বুঝেছিস?'

একজন ডাকাত জিজ্ঞেস করলে, 'গয়নাগাঁটি কোথায় থাকে?'

সর্দার বললে, 'দোতলার একটা ঘরে। ঘরটা আমি বাইরে থেকে চিনে রেখেছি। গঙ্গারাম, তামাক সাজ।'

গঙ্গারাম বোধ হয় ডাকাতের দলে নূতন ভর্তি হয়েছে—লোকটা ওদের মধ্যে সবচেয়ে রোগা, তার কোমর থেকে একটি ছোট্ট ডাবা হুঁকো ঝুলছিল, সে সেটা খুলে নিয়ে তামাক সাজতে বসল, 'কিন্তু সর্দার, শুনেছি জমিদারের বন্দুক আছে। যদি—'

সর্দার বিদ্রূপ করে বললে, 'তোর ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে? এত প্রাণের ভয় যার সে ডাকাতের দলে ভিড়েছে কেন? তুই যা, ছাগল চরাগে।'

অন্য ডাকাতগুলো হেসে উঠল।

গঙ্গারাম মুখে সাহস দেখিয়ে বললে, 'ভয় আমি কাউকে করি না। কিন্তু যদি তারা বন্দুক চালায় তখন কী করবে? মালও হাতছাড়া হবে, মাঝ থেকে প্রাণটা

যাবে।'

সর্দার তখন বললে, 'সে বন্দোবস্ত কি আমি না করেই এসেছি রে! এই দেখ, যে ঘরে জমিদারের বন্দুক পিস্তল সে ঘরের চাবি চুরি করে এনেছি। দুদিন যে তার বাড়িতে বাসন মেজেছি সে কি আর সাধে?'

এই শুনে ডাকাতরা ভারি উৎসাহিত হয়ে উঠল বললে, 'সাবাস সর্দার! তোমার সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে। আমাদের সর্দার হবার উপযুক্ত লোক তুমি।'

সর্দার আরাম করে তামাক টানতে টানতে বললে, 'এই কাজটা যদি মা কালীর দয়ায় ভালোয় ভালোয় উতরে যায়, তাহলে কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল লোটা যাবে—বুঝেছিস? আখেরে আমাদের আর খেটে খেতে হবে না।'

বিনু ডালে বসে বসে তাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। তারা যে কার বাড়িতে ডাকাতি করবার মতলব আঁটছে তা বুঝতে তার বাকি ছিল না। তার ইচ্ছে হল, কোনোমতে ছুটে গিয়ে যদি খবরটা জমিদারবাবুকে দেওয়া যায় তাহলে এখনও ডাকাতদের ধরা যেতে পারে। কিন্তু গাছ থেকে নামবার তো উপায় নেই। ঠিক নীচেই ডাকাতগুলো বসে আছে।

ক্রমে রাত্রি গভীর হতে লাগল। বিনুর মা নিশ্চয় তার জন্যে ভাবছেন। হয়তো চারদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেছে। কিন্তু বিনুর এই আস্তানাটির কথা তো কেউ জানে না, কাজেই এদিকে কেউ খুঁজতে আসবে না। আহা! যদি আসত তা হলে কী ভালোই হত! ডাকাতগুলোও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে যেত।

গাছের ডালে নিঃসাড়ে বসে বসে বিনুর হাত-পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল। কিন্তু তবু ডাকাতদের নড়বার নাম নেই—তারা বসেই আছে। বসে বসে গল্প করছে আর তামাক খাচ্ছে।

শেষে যখন রাত্রি দুপুর হতে আর দেরি নেই, তখন সর্দার হুঁকো রেখে উঠে দাঁড়াল। কোমরে তলোয়ার কষে বললে, 'জোয়ান সব, এবার চলো সময় হয়েছে। গঙ্গারাম, তুমি এই গাছতলায় লণ্ঠন নিয়ে বসে থাক। এ জঙ্গলটা ভারি বিশ্রী, পথ হারিয়ে যাবার ভয় আছে। কাজ সেরে ফিরে এসে আমি 'কুক' দেব, তখন তুই লণ্ঠন নাড়বি—তা হলে আমরা বুঝতে পারব তুই কোথায় আছিস। এই গাছতলায় ফিরে এসে আমরা মাল ভাগ-বাটোয়ারা করব, বুঝলি?'

গঙ্গারাম ভয় পেয়ে বললে, 'আমি একলা থাকব? কিন্তু যদি—'তার গলা কাঁপতে লাগল।

সর্দার তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'ভয় কীসের? বাঘ-ভালুকে তোকে খেয়ে ফেলবে না, এ বনে শেয়াল ছাড়া আর কোনো জানোয়ার নেই।'

গঙ্গারাম বললে, 'বাঘ ভালুক নয়, কিন্তু যদি—যদি তেনারা, রাত্তিরে যাঁদের নাম করতে নেই—'

সর্দার হো হো করে হেসে উঠে বললে, ‘ও—ভূত। তা যদি ভূতের ভয় করে, রাম নাম করিস।’

তারপর ‘জয় মা কালী’ বলে ডাকাতের দল অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। গঙ্গারাম লণ্ঠনটি দুই হাঁটুর মধ্যে নিয়ে উপুর হয়ে বসে রইল আর ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

হঠাৎ গুরুতর বিপদে পড়লে অনেকের বুদ্ধি লোপ হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ আছে, বিপদ যত ঘিরে ধরে তাদের বুদ্ধিও তত পরিষ্কার হয়। ডাকাতরা যখন গঙ্গারামকে রেখে চলে গেল, তখন বিনুর মাথায় একটা চমৎকার মতলব খেলে গেল। কী করে ডাকাতদের জব্দ করা যেতে পারে, তার প্ল্যান সে চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পেলে।

ডাকাতরা চলে যাবার পর আধ ঘণ্টা কেটে গেল। তখন বিনু গাছের ওপর একটু নড়েচড়ে বসল। খড়খড় শব্দ শুনেই গঙ্গারাম সভয়ে একবার ওপর দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগল, ‘রাম রাম রাম রাম—’

এমনিভাবে দশ মিনিট রাম নাম জপ করবার পর গঙ্গারাম যেই থেমেছে, অমনি পাতাসুদ্ধ অশ্বত্থ গাছের একটি ডাল তার সুমুখে পড়ল।

গঙ্গারাম আঁতকে উঠে আরও জোরে রাম নাম করতে লাগল। আর চমকে চমকে চারদিকে তাকাতে লাগল।

বিনু দেখলে, গঙ্গারামের অবস্থা শোচনীয় হয়ে এসেছে, সে তখন নাকি সুরে গাছের ওপর থেকে বললে—‘কোঁ—’

গঙ্গারাম আর থাকতে পারলে না, ‘বাবা গো’ চলে চিৎকার করে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড় মারলে। এ জঙ্গলের মধ্যে সে যে আর আসবে না তাতে কোনো সন্দেহ রইল না।

বিনু তখন হাত পা ছড়িয়ে শরীরটাকে ঠিক করে নিলে, কিন্তু গাছ থেকে নামল না।

প্রায় দুঘণ্টা কেটে যাবার পর বিনু দূর থেকে সর্দারের ‘কুক’ শুনতে পেলে—একটা অনৈসর্গিক দীর্ঘ হুংকার। বিনু তৈরি হয়েই ছিল, চট করে নেমে এল। নিজের ধুতির পাড় আগেই ছিঁড়ে রেখেছিল, তাইতে লণ্ঠনের হাতলটা বেঁধে গাছের একটা নিচু ডালে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর লণ্ঠনটাকে বেশ একটা দোলা দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

খানিক পরে ডাকাতের দল এসে পৌঁছুল। সর্দারের পিঠে একটা সাদা কাপড়ের পোঁটলা। আনন্দে তাদের চোখ বাঘের চোখের মতো জ্বলছে।

লণ্ঠনটা গাছ থেকে ঝুলছে দেখে সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, ‘এ কী, গঙ্গারাম কোথায়!’

সর্দার বললে, ‘নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও গেছে। লণ্ঠনটা এখনও দুলছে দেখছ না?’

তখন সকলে গঙ্গারামের জন্যে অপেক্ষা করতে বসল। অনেকক্ষণ কেটে

গেল; কিন্তু গঙ্গারামের দেখা নেই। সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল, তারা লুঠের মাল ভাগ করে নিয়ে সরে পড়তে চায়—কারণ ভোর হলে আর এ জঙ্গলে থাকা নিরাপদ হবে না। সর্দার অধীর হয়ে বললে, 'তাই তো। গঙ্গারামটা গেল কোথায়?'

সে মুখের মধ্যে আঙুল পুরে একরকম লম্বা শিস দিল; তারপর কান খাড়া করে বসে রইল; কিন্তু গঙ্গারামের শিস শুনতে পেলে না।

শেষে অধৈর্য হয়ে একজন ডাকাত বলে উঠল, 'সর্দার, গঙ্গারামের জন্যে বসে থেকে কাজ নেই, এদিকে ভোর হয়ে আসছে। এসো, আমরা পাঁচজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে যে যার সরে পড়ি।'

সর্দার বড় বড় লাল চোখদুটো তার দিকে ফিরিয়ে বললে, 'আমার দলে ওসব দাগাবাজি চলবে না। মা কালীর পা ছুঁয়ে এ কাজে নেমেছি, দিব্যি গেলেছি কখনো স্যাঙাতের সঙ্গে দাগাবাজি করব না। মাল চুলচিরে সাত ভাগ হবে। দুভাগ আমি নেব, বাকি পাঁচ ভাগ তোমরা পাঁচজনে নেবে। গঙ্গারাম এ কাজে যখন আমাদের সঙ্গে আছে, তখন তাকেও তার বখরা দিতে হবে।

একজন বললে, 'সে তো ভালো কথা। কিন্তু গঙ্গারাম যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে কী হবে?'

সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চলো, আমরা পাঁচজন পাঁচদিকে গঙ্গারামকে খুঁজি গিয়ে। আধ ঘণ্টার মধ্যে যদি তাকে খুঁজে পাওয়া না যায়, তখন আমরা আবার এখানে ফিরে আসব। তারপর আমরা কজনেই মাল বখরা করে নেব। কী বলো?'

ডাকাতরা সবাই সায় দিলে।

সর্দার তখন বললে, 'এই পোঁটলা এখানে এই আলোর তলায় রইল। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ এতে হাত দেবে না। যদি কেউ হাত দাও—তা হলে—' বলে প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার তাকালে। সেই ভয়ংকর দৃষ্টির মানে বুঝতে কারও কষ্ট হল না।

তারপর পাঁচজন পাঁচদিকে বেরিয়ে গেল। বিনু যখন দেখলে তারা অনেক দূরে চলে গেছে তখন সে পা টিপে টিপে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর পুঁটালিটা কাঁধে করে কাঠবেড়ালির মতো গাছে উঠতে আরম্ভ করল।

দশ মিনিটের মধ্যে পুঁটলি নিজের দোলার মধ্যে লুকিয়ে রেখে বিনু আবার নীচে নেমে এল। যাক, লুঠের মাল তো হস্তগত হয়েছে, এবার ডাকাতদের ধরা চাই।

আধ ঘণ্টা শেষ হতে আর দেরি নেই, এখনই ডাকাতের দল ফিরে আসবে। বিনু অন্ধকারে ছায়ার মতো কালীমন্দিরের দিকে মিলিয়ে গেল।

ডাকাতরা সবাই প্রায় একসঙ্গেই ফিরে এল। দেখলে বোঁচকা নেই।

সর্দার গর্জন করে উঠল, 'বোঁচকা কোথায় গেল?'

কারও মুখে কথা নেই। সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। সকলের চোখেই সন্দেহের ছায়া। এ ভাবছে ও নিয়েছে, ও ভাবছে এ নিয়েছে।

সর্দার তলোয়ার বার করে ভীষণস্বরে বললে, 'কে সরিয়েছ এখনও বলো, নইলে আজ সকলের মাথা এখানে কেটে রেখে যাব।'

ডাকাতরাও সড়কি ছোরা বাগিয়ে দাঁড়াল। একজন বললে, 'সর্দার, এ তোমার কাজ। তুমিই মাল এখানে রেখে গঙ্গারামকে খুঁজতে যাবার ফন্দি বার করেছিলে।'

সর্দার বললে, 'ওরে মুখ্যু, আমি নিলে কি আর ফিরে আসতুম? এ তোদের কারও কাজ।'

ডাকাতদের মধ্যে লড়াই বাধে আর কী, এমন সময় তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বুঝেছি—বুঝেছি—এ গঙ্গারামের কাজ।'

সকলে অস্ত্র নামাল। সর্দার একটু ভেবে বললে, 'তা হতে পারে। গঙ্গারাম হয়তো কাছেই লুকিয়ে ছিল, আমাদের ডাকাডাকিতে ইচ্ছে করেই সাড়া দেয়নি। তারপর যেই আমরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি অমনি—। উঃ! গঙ্গারামটা কী নেমকহারাম!'

ঠিক এইসময় ঠুং করে কালীমন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠেই থেমে গেল, যেন অসাবধানে বেজে ওঠার পর কে ঘণ্টাটা হাত দিয়ে চেপে ধরল।

ডাকাতরা উত্তেজিতভাবে পরস্পর মুখের পানে তাকাতে লাগল। তারপর

সর্দার চাপা গলায় বললে, 'গঙ্গারাম! কালীমন্দিরে লুকিয়েছে! তোমরা সকলে আস্তে আস্তে আমার পেছনে এসো।'

ডাকাতরা হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে ব্যাধের মতো নিঃশব্দে মন্দিরের দিকে চলল।

বিনু মন্দিরের চাতালের আড়ালে হাঁটু গেড়ে লুকিয়ে বসে ছিল, যখন দেখলে পাঁচটা অন্ধকার মূর্তি পা টিপে টিপে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল, তখন সে বিদ্যুতের মতো এসে প্রাণপণ জোরে মন্দিরের লোহার দরজাটা টেনে কড়াৎ করে বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে দিলে।

তারপর সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উঠি কি পড়ি করে সে গ্রামের দিকে ছুটতে আরম্ভ করল। কাঁটায় হাত পা ছড়ে গেল, কাপড় ছিঁড়ে গেল, কিন্তু সেদিকে দৃকপাতও করলে না। গ্রামের সীমানায় যখন এসে পৌঁছুল তখন পুব আকাশে একটুখানি দিনের আলো দেখা দিয়েছে।

বেলা দশটার সময় জমিদার ভূপতিবাবুর বৈঠকখানায় মস্ত সভা বসেছিল। গাঁসুদ্ধ লোক সেখানে হাজির ছিলেন। এমনকি বিনুর বাবা হারাণ হালদারও বাদ পড়েননি।

ডাকাতেরা গতরাত্রে যে সমস্ত জিনিস লুঠে নিয়ে গিয়েছিল সেই সবই পাওয়া গেছে; পুঁটলির মধ্যেই ছিল। ডাকাতদের কালীমন্দির থেকে বার করে পুলিশ থানায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। উপস্থিত সবাই বসে বিনুর গল্প শুনছিল—কী করে সে ডাকাত ধরলে। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, কারও মুখে একটি কথা নেই।

বিনুর গল্প শেষ হবার পর খানিকক্ষণ বৈঠকখানা নীরব হয়ে রইল। তারপর জমিদার ভূপতিবাবু কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'বাবা, তুমি আজ যে সাহস আর বুদ্ধি দেখিয়েছ, গল্পের বইয়েও সেরকম পড়া যায় না। আর আমার যে উপকার করেছ তা তো জীবনে ভোলবার নয়। কাল আমি তোমার প্রতি বড় অবিচার করেছিলুম, তোমার বাবার ওপর রাগ করে তোমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলুম। ভগবান তাই আমাকে ভালোরকম শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার বাবা আমার সঙ্গে যত ইচ্ছে মামলা করুন, কিন্তু আজ থেকে তোমার সমস্ত লেখাপড়ার ভার আমি নিলুম। তুমি যতদিন পড়বে—বি.এ., এম.এ. পাশ করে যদি তুমি বিলেতে যেতে চাও, সে খরচও আমি জোগাব। তোমার মতো রত্ন যদি পয়সার অভাবে পড়াশুনো করতে না পায় তা হলে আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। আশীর্বাদ করি, তুমি বিদ্বান হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করো।'

জমিদারবাবুর কথা শুনে সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন। বিনু কৃতজ্ঞতা-ভরা বুকে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে।

ডাকাত সর্দার বিশ্বনাথ

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সেকালে ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁহার যেমন ছিল বিদ্যা, তেমনি ছিল অগাধ ধন-সম্পত্তি। একদিন সর্দার বিশ্বনাথ তর্ক পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া বলিলেন: 'তর্ক' পঞ্চানন মহাশয়, শাস্ত্রে কৃপণের ধনে কাহার অধিকার লেখে?'

তর্ক পঞ্চানন বলিলেন, 'দস্যু, চোর ও রাজার'। বিশ্বানাথ তখন হাসিয়া বলিলেন: 'পণ্ডিত মহাশয় একখানা ব্যবস্থাপত্র আমাকে দিতে হবে।'

তর্ক পঞ্চানন বলিলেন, 'ব্যবস্থাপত্র কি বাবু অমনি হয়। ব্যবস্থাপত্র নিতে একটি টাকা লাগবে।'

বিশ্বানাথ তখনই একটি টাকা তর্ক পঞ্চাননের হাতে দিলেন। তর্ক পঞ্চাননও শাস্ত্রের ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন।

ব্যবস্থাপত্র লইয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, 'মহাশয়, আমি বিখ্যাত দস্যু বিশ্বনাথ সর্দার। আপনার লিখিত এই শাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে, আপনার ধনে আমার

অধিকার, কারণ আপনি অতিশয় কৃপণ।'

বিশ্বনাথের নাম না জানে তখন এমন লোক ছিল না—দেশের লোক তখন বিশ্বনাথবাবুর নামে কাঁপিত।

তর্ক পঞ্চানন বিশ্বনাথের নামে কাঁপিতেন।

সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত দেখিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। ভাবিলেন এতদিনের কর্মে সঞ্চিত অর্থ ত নিয়াছেই, আরও কত না জানি লাঞ্ছনা হয়। মুহূর্তমধ্যে বিশ্বনাথ যেমন বাঁশী বাজাইলেন, অমনি প্রায় দুই শত অস্ত্রধারী দস্যু আসিয়া তর্ক পঞ্চাননের বাড়ি ঘিরিয়া ফেলিল। তর্ক পঞ্চানন দস্যুদের ভীষণ আকৃতি দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

বিশ্বনাথ তখন হাসিমুখে তর্ক পঞ্চানন মহাশয়কে বলিলেন, 'মহাশয় ভয় পাবেন না। আমি কারো প্রতি কোন অত্যাচার করবো না....কিংবা অসৎ ব্যবহারও করবো না। মা ঠাকরুণদের চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে বলে পাঠান যে, তারা নিজ বস্ত্র ও অলঙ্কার নিয়ে অন্য কারো গৃহে আশ্রয় নিন। আমি স্ত্রী-লোকের ধন গ্রহণ করি না। কেবল আপনার ব্যবস্থা অনুসারে আপনার টাকা, কড়ি, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি যা আছে তাহাই নেবো।'

কাজে তাহাই হইল। তর্ক পঞ্চাননের বহুকালের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া সর্দার বিশ্বনাথ প্রস্থান করিলেন।

শোনা যায় এ ঘটনার পর হইতে তর্ক পঞ্চানন আর কৃপণতা করেন নাই। একদিন নৈহাটির কাছে গঙ্গার পাড় দিয়া বিশ্বনাথবাবু চলিয়াছেন। দলের লোকেরা পেছনে আসিতেছে। একটা বটগাছের কাছে বড় একটি বকুল গাছের তলায় বসিয়া এক ব্রাহ্মণ কাঁদিতেছেন। বিশ্বনাথ কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরমশাই, আপনি কাঁদছেন কেন?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'বাবা, আমি বড় গরিব। এক মা ভিন্ন ত্রি-সংসারে আমার কেউ ছিল না। রাঁধুনি বামুনের কাজ করে যা কিছু উপার্জন করতাম, সে-টাকা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। মা সে টাকা ব্যয় না করে সুদে খাটিয়ে কিছু টাকা জমিয়ে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। অল্পদিন হলো আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। স্ত্রী আগেই মারা গেছে। আমি ভিক্ষা করে মার শ্রাদ্ধের জন্য প্রায় তিনশত টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু পথে ডাকাতরা সে টাকা লুঠ করে নিয়েছে। এখন আমার এমন উপায় নেই যে মায়ের শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করি'—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ খুব কাঁদিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণের দুঃখে বিশ্বনাথবাবু দয়া হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে তৎক্ষণাৎ এক সহস্র টাকা দিয়া বলিলেন—'আর কাঁদবেন না। এই নিন, এতে আপনার মাতৃশ্রাদ্ধ ও বিয়ে দুই-ই হবে।'

ব্রাহ্মণ অর্থ পাইয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

কার্তিকের শেষ অন্ধকার রাত্রি। ঘন বন-জঙ্গলে ঢাকা পল্লীগ্রাম। বিশ্বনাথবাবু বারান্দায় বসিয়া গড়গড়া টানিতেছেন। তাঁহার দলের লোকেরা—কোথায় ডাকাতি করিতে যাওয়া যাইতে পারে, কোন জেলায় কোন অঞ্চলে লিখন বা চিঠি যাইবে, সে বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। বিশ্বনাথ শুনিতেছিলেন এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। গ্রাম নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। কুকুরেরা মাঝে মাঝে চিৎকার করিতেছে। শেয়ালের দল—হুক্কা—হুয়া করিয়া চিৎকার করিতেছে। শীতের বাতাস শীর্ণ গাছের পাতা কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে।

এমন সময় দূর হইতে শোনা গেল, ভীষণ হল্লা—শত শত লোকের করুণ আর্তনাদ, বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ, কাশীনাথ ও দলের অন্যান্য ডাকাতেরা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল সেই বিকট চিৎকার।

বিশ্বনাথ বলিলেন, 'বৈদ্যনাথ, এ কিসের চিৎকার? কারা আসছে এদিকে?.....কাশীনাথ, খোঁজ নাও ত একবার।' কাশীনাথ একটু পথ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'সর্দার লোকগুলো লণ্ঠন হাতে করে পিদিম জ্বালিয়ে এদিকেই আসছে যে। বোধ হয় ওরা নীল চাষীর দল।'

বিশ্বনাথ একটি কথাও বলিলেন না। নীরবে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন! এমন সময়ে পিপীলিকার সারির মতো প্রায় শতাধিক লোক করুণ ক্রন্দনে চারিদিক মুখরিত করিয়া বিশ্বনাথের বাড়ির সামনের বিরাট মাঠের মাঝে আসিয়া উপস্থিত হইল। একসঙ্গে সকলে করুণস্বরে বলিল,—'সর্দার, আমাদের বাঁচান। আমাদের মান সম্ভ্রম নীলকর সাহেবের হাত হতে রক্ষা করুন। বাঁচান সর্দার।'

বিশ্বনাথ ক্রুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'কি হয়েছে তোদের? কি হয়েছে? বল না।'

নীল চাষীদের একজন মণ্ডল—রক্তাক্ত কলেবরে দাঁড়াইয়া বলিল, 'এই দেখ। এই দেখ, কোড়া মেরে আমার পিঠ ঘায়েল করে দিয়েছে, পিঠ কেটে গেছে—দেখ্ দেখ্ সকলের দিকে চেয়ে দেখ্ বিশ্বনাথ বাবু।'

'কে করলে তোদের প্রতি এমন নির্মম অত্যাচার। কে তারা। কে সে?'

'তারা নীল কুঠির সাহেব। জানিস ত সব! আমাদের খেজুর বাগান নষ্ট করে নীল বুনিয়েছে। জোর করে ধরে নিয়ে বন্দী করে মেরেছে বেত, মেরেছে জুতো। দেড় মাসের মধ্যে চৌদ্দ কুঠির জল খাইয়েছে। আমরা যখন নীল বুনতে রাজী হইনি তখনি সাহেব হুকুম দিয়েছেন বেটাদের ধরে এনে সাত কুঠির জল খাওয়াও। ভিন্ন ভিন্ন কুঠিতে ঘুরিয়ে এনে না খাইয়ে জুতো মেরে আর বেত মেরে কি হাল হয়েছে।'

'একবার চেয়ে দেখ! বিশ্বনাথ বাবু।'

বিশ্বনাথ বাবু বলিলেন, 'হারে তোরা মানুষ না কুকুর? আধমরা সাপটাও

একবার শত্রুকে কামড়াবার জন্য ফণা তুলে ওঠে, আর তোরা এতগুলো মানুষ নীলকর সাহেব বেটাদেরও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে তাদের মাথা ভেঙে চুরমার করে চূর্ণীর জলে ভাসিয়ে দিতে পারলি না।'

—পারলাম কই?

—তবে মরলি না কেন?

—মরতে পারলাম কই?

—ব-টেরে! তবে আমার কাছে কি চাস?

—আমাদের বাঁচাতে হবে নীল কুঠির সাহেবদের হাত হতে। দোহাই তোমার সর্দার। আমাদের রক্ষা কর, রক্ষা কর।

একসঙ্গে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল চাষীর দল।

বিশ্বনাথ বলিলেন। 'চট্‌পট কুঠির সাহেবদের নাম বল না মণ্ডল।'

পাঁচু মণ্ডল বলিল, 'ফেড্ডি (Mr. Faddy), লেডিয়ার্ড (Mr. Lediard)।

বিশ্বনাথ বলিয়া উঠিলেন, 'মায়ের নামে শপথ কর। তোরা কারো কাছে আমাদের দলের কথা বলবি না। আর দলের গোয়েন্দার কাছে খবর দিবি.......কোন বেটা সাহেবের খবর যোগায় বুঝলি?'

প্রজারা দলে দলে সেই নিবিড় নিশীথে বিশ্বনাথের গৃহ-সংলগ্ন ভীষণ দর্শনা জগজ্জননীর মন্দিরের দ্বারে প্রতিজ্ঞা করিল অন্যায়ের প্রতিশোধ তারা নিবে।

তারপর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া নীলচাষীর দল অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

একদিন ফেড্ডি সাহেব কুঠির বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছেন এমন সময় একটা লোক তাঁহার টেবিলের ওপর একখানা চিঠি রাখিয়া পলকের মধ্যে মিলাইয়া গেল। ফেড্ডি সাহেব চিঠিখানা খুলিয়া পড়িলেন। চিঠিতে লিখিত আছে।

ফেড্ডি সাহেব সাবধান। তুমি নীল চাষীদের ওপর যে অত্যাচার করেছ এবং করছো তার জন্য উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে-কোন দিন সুযোগমতো তোমার কুঠি লুঠ করবো। সাবধান—বিশ্বনাথ সর্দার।

ফেড্ডি সাহেব এইরূপে চিঠি পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, 'The famous out law, by name Biswanath Sardar, who had for years terroized the district! Awful'. সাহেব তৎক্ষণাৎ ঘোড়সোয়ার পাঠাইলেন নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট (Mr. Balnquire) সাহেবের কাছে বিশ্বনাথের চিঠিসহ, উপযুক্ত পুলিশ দারোগা পাঠাইয়া তাহাদিগকে বিশ্বনাথের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য।

ঘোড়সোয়ার বেগে কৃষ্ণনগরের দিকে ছুটিয়া গেল। সাহেব তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য জয়নালকে কুঠিরের চারিদিকের বন-পথে, গাঁয়ের কিনারায় গোপন সন্ধান লইতে নিযুক্ত করিলেন। সাহেব নিজেও সতর্ক হইলেন পাইক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল, তীরন্দাজ, বন্দুক-ধারী সব সতর্ক প্রহরী রহিল কুঠির চারদিকে

বেড়িয়া। ফেড্ডিও লেডিয়ার্ড কৃষ্ণনগর হইতে পুলিশ ফৌজের আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, মিঃ ফেড্ডি ও লেডিয়ার্ড সারারাত জাগিয়া দস্যুদের আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া সবে বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। এমন সময় বিশ্বনাথ সর্দার তাঁহার আটজন মাত্র দলের লোক লইয়া দেওয়াল টপকাইয়া বাংলোর কাছে আসিয়া পড়িলেন। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। দশমীর চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে। শেষরাত্রির ঘনবর্ষণে আর ঠাণ্ডা বাতাসে লোকজন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বিশ্বনাথ সিঁড়ি বাহিয়া ওপরে উঠিলেন, আর একটা জানালা ভাঙ্গিয়া সাহেবদের শুইবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

দুমদাম্ গুড়ুম শব্দে ঘরের লণ্ঠনগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিশ্বনাথ ও তাঁহার দুইজন সঙ্গী পলক মধ্যে এই কাজটি করিয়া ফেলিলেন।

মিঃ ফেড্ডি ও লেডিয়ার্ড সামান্য একটু নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। ভীষণ শব্দে জাগিয়া দেখিলেন ঘর অন্ধকার। বাইরে মেঘের ঘন ঘন গর্জন আর ঘরের ভিতরে ও বাহিরে ডাকাতদলের কল কল শব্দ। সাহেব দুইজন দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া অসীম সাহসের সহিত বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিলেন। ব্যর্থ হইল সব

গুলি। সাহেব দুইজন নিরুপায়। বিশ্বনাথের গুলির ঘায়ে সাহেব দুইজনের পায়ের গোড়ালি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এবার দু'জনকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইল। বরকন্দাজ, পাইক ও কুঠিরের অন্যান্য সব লোক লাঠি-শোটা, বন্দুক লইয়া ছুটিয়া আসিল—কিন্তু এক পাও যাইতে পারিল না! গুডুম গুডুম শব্দে হতভম্ব সাহেবদের হাতের বন্দুক, রিভলবার, পিস্তল ডাকাতেরা সব কাড়িয়া লইয়াছিল।

ফেড্ডিকে চারিজন ডাকাত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া তাঁহার হাতের বন্দুক কাড়িয়া লইয়া এমনভাবে প্রহার করিতে লাগিল যে তাঁহার সামান্য নড়িবার শক্তি রহিল না। ফেড্ডি প্রাণপণে শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন এবং একেবারে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। লেডিয়ার্ড সাহেবের বুকের উপর একজন ডাকাত এমন জোরে একটা বল্লম নিক্ষেপ করিয়াছিল যে তিনিও হত-চেতন হইয়া লুটিয়া পড়িলেন। নিরুপায় ফেড্ডি ও লেডিয়ার্ড রক্তাক্ত দেহে হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে পড়িয়া রহিলেন।

বিশ্বনাথ ও তাহার আটজন সঙ্গী সাহেবের বাংলোর সমুদয় আর জিনিষপত্র তছনছ করিয়া টাকা কড়ি যা কিছু ছিল লুটিয়া লইল। তারপর দুইজন দূরে চূর্ণী নদীর প্রান্তদেশে এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে ভীষণ কালীমূর্তির নিকট টানিতে টানিতে লইয়া গেল। হতভাগ্য নীলকর সাহেব দুইজন এইরূপে নিবিড় বনে পড়িয়া রহিল মৃত্যুর প্রতীক্ষায়! প্রত্যুষে নগদ সাতশত টাকা, ঘরের সমুদয় বন্দুক, পিস্তল, তরোয়াল, চাবুক, কাগজপত্র, দলিলের স্টাম্প, চাষীদের দস্তখতি কাগজ সব কিছু কাড়িয়া লইয়া ডাকাত দল চলিয়া গেল। যাইবার সময় পাইক, বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালদের বাড়িতে আগুন ধরাইয়া দিয়া জ্বালাইয়া পোড়াইয়া হাঁ-রে-রে শব্দে চারিদিক সন্ত্রস্ত ও ভীত চকিত করিয়া ডাকাত দল প্রস্থান করিল।

সাহেবদের বিশেষত নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্দার বিশ্বনাথই সর্বপ্রথম ভীষণভাবে বীরত্বের সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। অত্যাচারিত উৎপীড়িত নীল চাষীরা সর্বপ্রথম পাইয়াছিল উপযুক্ত প্রতিবিধান। বিশ্বনাথের এই নির্ভীক সাহসিকতা ও তেজস্বিতার বলে বহুদিন পর্যন্ত নদীয়া জেলার নীলকর সাহেবরা প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। বিশ্বনাথ এই সব কারণে জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে এইরূপ অস্ত্রধারণ ও তাহাদিগকে দমন করা বিশ্বনাথ সর্দারের এক অপূর্ব কীর্তি। নীলকুঠির সাহেবরা দাঙ্গা করিয়া ফৌজদারী মকদ্দমা বাঁধাইল। উভয়পক্ষের কত লোক খুন-জখম করিয়াছে এবং কত লোককে সর্বস্বান্ত করিয়াছে তাহার অবধি ছিল না। বিশ্বনাথের বীরত্বে এই সব অত্যাচার বিশেষভাবে দমিত হইয়াছিল। বাংলার ডাকাতের ইতিহাসে নীলকর দমনের ইতিবৃত্তে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

ফাঁসুড়ে ডাকাত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার যখন বাইশ বছর বয়েস তখন নানা দেশে বেড়ানোর একটা কাজ জুটে গেল আমার অদৃষ্টে। তখন আমি দৈব ওষুধের মাদুলি বিক্রি করে বেড়াতুম। চুঁচড়োর শচীশ কবিরাজের তরফ থেকে মাইনে ও রাহাখরচ পেতুম। অল্প বয়সের প্রথম চাকরি, খুব উৎসাহের সঙ্গেই করতুম।

আমাকে কাপড়চোপড় পরতে হত সাধু ও সাত্ত্বিক বামুনের মতো। ওটা ছিল ব্যবসায়ের অঙ্গ। গিরিমাটির রঙে ছোপানোর কাপড় পরনে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় মালা, হাতে থাকতো একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তারই মধ্যে মাদুলি ও অন্যান্য ওষুধ থাকতো।

বছর তিনেক সেই চাকরি করি; তারপর শরীরে সইলো না বলে ছেড়ে দিলুম।

একবার যাচ্ছি বর্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর বলে একটা গ্রামে। এটা মাদুলি বিক্রির জন্যে নয়, মাখমপুরে শচীশ কবিরাজের শ্বশুরের

বাড়ি। সেখানকার জমিজমার ওয়ারিশান দাঁড়িয়েছিলেন শচীশবাবু—শ্বশুরের ছেলেপুলে না থাকায়। আমাকে পাঠিয়েছিলেন পৌষ-কিস্তির জমিজমার খাজনা যতটা পারি আদায় করে আনতে।

কিন্তু তা হলেও পরনে আমার গেরুয়া কাপড়, হাতে মাদুলি ও ওষুধভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি সবই ছিল, যদি পথেঘাটে কিছু বিক্রি হয়ে যায়, কমিশনটা তো আমি পাব। কখনও ওই অঞ্চলে যাইনি। মেমারি স্টেশনে নেমে বেলা দু'টোর সময়ে হাঁটছি তো হেঁটেই চলেছি, পথ আর সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পথ হাঁটি।

গ্রামে গ্রামে ওষুধ বিক্রি করে বেশ কিছু রোজগার করা গেল, দেরিও হল বিশেষ করে সেই জন্যে। আর একটা বাজার পড়ল। সেখানে দোকানদারদের কাছে শুনলুম, আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে অন্তত রাত ন'টা বাজবে। কিন্তু সকলেই বললে,—"সন্ধ্যের পরে আগে গিয়ে আর পথ হাঁটবেন না, ঠাকুরমশায়। এইসব দেশে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বড় ভয়, বিদেশি দেখলে মেরেধরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রায়ই বনের ধারে বড় বড় মাঠের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সাবধান, একটা দীঘি পড়বে মাঠের মধ্যে ক্রোশ তিনেক দূরে, জায়গাটা ভালো নয়....."

বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, এমন সময় দূরে একটা তালগাছ ঘেরা দীঘি দেখা গেল বটে। আমার বুক ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। দীঘির ও-পাশে সঞ্জয়পুর বলে একটা গ্রাম, সেখানেই রাত্রের জন্যে আশ্রয় নেওয়ার কথা বাজারে বলে দিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা তো হয়ে গেল তালদীঘির এদিকেই—হবার দেরি নেই, কোথায় বা সঞ্জয়পুর, কোথায় বা কী?

মনে ভারী ভয় হল। কি করি এখন? সঙ্গে মাদুলি ও ওষুধের বিক্রির দরুন অনেক টাকা। পরক্ষণেই ভাবলাম, কিছু না পারি, দৌড়তে তো পারব? না হয় ব্যাগটাই যাবে,—প্রাণ তো বাঁচবে।

ভয়ে ভয়ে দীঘির কাছাকাছি তো এলুম। বড় সেকেলে দীঘি, খুব উঁচু পাড়, পাড়ের দু'ধারে বড় বড় তাল গাছের সারি। তার ধার দিয়েই রাস্তা। দীঘির পাড়ে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই। যে ভয় করছিলুম, দেখলুম সবই ভুয়ো। মানুষ মিথ্যে যে কেন এ-রকম ভয় দেখায়।

প্রকাণ্ড দীঘিটার পাড় ঘুরে যেমন তালবনের সারি ও দীঘির উঁচু পাড়কে পেছনে ফেলেছি, সামনেই দেখি ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা গ্রাম লি-লি করছে—নিশ্চয় ওটা সেই সঞ্জয়পুর। ....বাঁচা গেল বাবা! কি ভয়টাই না দেখিয়েছিল লোকে! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাছেই লোকের বসতি, গাঁয়ের গরু বাছুর চরছে মাঠে—কেন এ সব জায়গায় বিপদ থাকবে?

আমি এই রকম ভাবছি, এমন সময় তালপুকুরের ওদিকের পাড়ের আড়ালে যে পথটা, সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। বৃদ্ধ

বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এই বয়সেও মাংসপেশী বেশ সবল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোট একটা লাঠি।

বৃদ্ধ আমায় বললে, "ঠাকুরমশাই কোথায় যাবেন?"

"যাব মাখমপুর......."

"মাখমপুর! সে যে এখনও তিন ক্রোশ পথ.....কাদের বাড়ি যাবেন?"

"শচীশ কবিরাজের বাড়ি।"

"ঠাকুরমশাই কি কবিরাজমশায়ের গোমস্তা?"

"গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে।"

"এ অঞ্চলে আর কাউকে চেনেন?.......মশাইয়ের নিজের বাড়ি কোথায়?"

"আমি এদিকে কখনও আসিনি, কাউকে চিনিও নে। মাখমপুরেও নতুন যাচ্ছি...."

"সেখানেও কেউ তাহলে আপনাকে চেনে না?"

"নাঃ, কে চিনবে?"

আমার এই কথায়, আমার যেন মনে হল বুড়ো একটু ভাবলে, তারপর আমায় বললে,—"কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি.....রাত্রে আজ দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন। আমরা জাতে বারুই, জল আচরণীয়, আপনার অসুবিধা হবে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবান্না করে খাবেন....আসুন দয়া করে...."

আমি বৃদ্ধের কথায় ভারি সন্তুষ্ট হলুম। সত্যিই তো, সেকালের লোকেরা অন্য ধরনের শিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করেই এদের তৃপ্তি। বৃদ্ধ এই প্রস্তাব না করলে রাঢ় অঞ্চলের অজানা মেঠো পথ বেয়ে এই সুমুখ আঁধার রাতে আমায় যেতে হত মাখমপুরে। তিন ক্রোশ হেঁটে।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড় মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ি। বৃদ্ধের নাম নফরচন্দ্র দাস। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উঠতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

কুকুরের এই ডাকটা আমার ভালো লাগল না, এর আমি কোন কারণ দিতে পারব না,—কিন্তু এই কুকুরের চিৎকারে যেন একটা ছন্নছাড়া অমঙ্গলজনক অর্থ আছে—মঙ্গলসন্ধ্যায় কোন গৃহস্থবাড়িতে আসি নি, যেন শ্মশানভূমিতে এসেছি....

বৃদ্ধের বাড়ি দেখে মনে হল বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ির উঠোনে সারি সারি তিনটি বড় বড় ধানের গোলা—গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে কুড়ি বাইশটা। অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড় বড় আটচালার ঘর। বাইরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে আর একখানা কুঠুরি!

আমার কথাটা ভালো করে বুঝতে গেলে এই কুঠুরিটার কথা আর একটু ভালো করে শুনতে হবে। কুঠুরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটা কামরা বলা যায়, কারণ একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছন দিকের সঙ্গে সংলগ্ন;

অথচ দোর বন্ধ·করে দিলে বাইরের বাড়ির সঙ্গে এর সম্পর্ক চলে গিয়ে এটা ভেতর বাড়ির একখানা ঘরের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমায় বাসা দেওয়া হল এই কুঠুরিতে। কুঠুরির একপাশে ছোট একটা চালা। সেখানে আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে আমি বিশ্রাম করছি।

গৃহস্বামী এসে বলল, "ঠাকুরমশায় রান্না চাপান, আর রাত করেন কেন?"

আমি রান্নাচালায় বসে রান্না চড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি একটি বাড়ির বৌ ভেতর থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে এসে আমার রান্নাচালার সামনে দিয়ে ঢুকল ও ঝাঁট দিতে লাগল।

কুঠুরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে সেখান থেকে কুঠুরিটার ভেতর দেখা যায়। আমি দু-একবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম বৌটি ঝাঁট দিতে দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, দু'তিন বার ভালো করে লক্ষ্য করে মনে হল বৌটি ইচ্ছে করে আমার দিকে অমন করে চাইছে।

আমি দস্তুর মত অবাক হয়ে গেলুম। ব্যাপার কি? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লীর গৃহস্থবধূ—এমন ব্যবহার তো ভাল নয়? কি হাঙ্গামায় আবার পড়ে যাব রে বাবা। কর্তাকে কাছে বসিয়ে রাঁধতে রাঁধতে গল্প করব নাকি?

এমন সময় বৌটি ঝাঁট শেষ করে চলে গেল। কিন্তু বোধহয় পাঁচ মিনিট পরেই আবার এল। দেখে মনে হল সে যেন খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এবার সে কুঠুরির মধ্যে ঢুকে এটা ওটা সরাতে লাগল এবং আমার দিকে চাইতে লাগল, তারপর হঠাৎ রান্নাচালার দরজায় এসে চকিত দৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে আরও সরে এল এবং নিচুস্বরে বললে, "ঠাকুরমশায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে"—বলেই চট করে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

শুনে তো আর আমি নেই! হাতের খুন্তি হাতেই রইল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—আর সারা হাত-পা অবশ ও ঝিমঝিম করতে লাগল। বলে কী! দিব্যি গেরস্তবাড়ি, গোলাপালা, ঘরদোর—ডাকাত কী রকম?

কিন্তু পালাবই বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েছে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ বসে লোকজনের সঙ্গে কথা কইছে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো সন্দেহ করবে।

কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছি একেবারে—হাতে পায়ে জোর নেই, কিছু ভাববারও শক্তি লোপ পেয়েছে। মিনিট পাঁচেক এমনিভাবে কাটল—এমন সময়ে দেখি সেই বৌটা আবার একটা কাজে কুঠুরির মধ্যে ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি কথা বলবার পূর্বেই আমি বললুম, "তুমি যে হও, তুমি পরম

দয়াময়ী—বলে দাও কোন পথে কীভাবে পালাব....”

বৌটি চাপা গলায় বললে, “সেইজন্যেই এলুম। পালাবার পথ নেই—ওরা ঘাঁটি আগলে রেখেছে.........”

আমি বললুম, “তবে উপায়!”

মেয়েটি বললে, “একটা মাত্র উপায় আছে। তাও আমি ভেবে এসেছি। আমি এ-বাড়িতে আর ব্রহ্মহত্যা হতে দেব না।—অনেক সহ্য করেছি, আর করব না...দাঁড়ান ঠাকুরমশায়, আর একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।”

মিনিট পাঁচেক পরে বৌটি আবার এল, চকিতদৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে বললে, “শুনুন, আমার উপায়—এই কথা কটা মনে রাখুন। মনে যদি রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারব।....আমার নাম বামা, আমি এ বাড়ির মেজবৌ, আমার বাপের বাড়ির গ্রামের নাম কুসুমপুর, জেলা বর্দ্ধমান, থানা রায়না—আমার বাপের নাম হরিদাস মজুমদার, জ্যাঠামশায়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার, আমার দুই বোন, আমার দিদির নাম ক্ষান্তমণি, বিয়ে হয়েছে সামন্তপুর-তেওটা, বর্দ্ধমান জেলা। শ্বশুরের নাম দুর্লভ দাস—সবাই জাতে বারুই। আমার বাবা,

জ্যাঠামশায় সব বেঁচে আছেন, কিন্তু মা নেই....”

আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে—যা বলে মেয়েটি তাই করে যাই। এতে কি হবে? বৌটি কিন্তু এক একবার বাড়ির মধ্যে যায়, আবার অল্প দু'মিনিটের জন্যে ফিরে এসে আমায় তালিম দিয়ে যায়—“মনে আছে তো? জ্যাঠামশায়ের নাম কি?”

আমি বললুম, “হরিদাস মজুমদার...”

“না—না, পাঁচকড়ি মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার..... আমার দিদির নাম কি? শ্বশুরবাড়ি কোন্ গাঁয়ে?”

‘ক্ষান্তমণি, শ্বশুরবাড়ি হল—শ্বশুরবাড়ি....”

“আপনি সব মাটি করলেন দেখছি। সামন্তপুর-তেওটা, বলুন...”

“সামন্তপুর-তেওটা—শ্বশুরের নাম রামযদু দাস—দুর্লভরাম দাস.......”

অবশেষে মিনিট দশ-বারোর মধ্যে আমার সব পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

বৌটি বললে, “রান্না-খাওয়া করে নিন ঠাকুরমশায়, কোন ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ির নাম-ধাম যখন জানা হয়ে গেছে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি। এখন শুনুন,—খাওয়া-দাওয়ার পরেই শ্বশুরমশায়ের কাছে আমার বাপের বাড়ির পরিচয় দিয়ে বলবেন—আপনি তাদের গুরুবংশ, আমার নাম বলে জিজ্ঞেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েছে কোথায়, জানো নাকি? গলা যেন না কাঁপে, কোনরকম সন্দেহ যেন না হয়....আমি চললুম, আবার আসব আপনি শ্বশুরকে বলবার পরে; কিন্তু দেরি করবেন না বেশি, বিপদ কখন হয় বলা তো যায় না?”

রান্না-খাওয়া শেষ না করলেও তো সন্দেহ করতে পারে। রান্না-খাওয়া করতেই হল। রাত্রের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে এসেছে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহারাদির পর নিজের কুঠুরিতে বসেছি, আর আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ির সবাই যেন খাঁড়ায়, রাম-দাতে শান দিচ্ছে, আমার গলাটি কাটবার জন্যে।

এই সময় গৃহস্বামী স্বয়ং আমার জন্যে পান নিয়ে এল। বললে, “কি ঠাকুরমশায়, আহারাদি হল? এখন দিব্যি করে শুয়ে পড়ুন। মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; রাত হয়েছে আর দেরি করবেন না...”

আমি বললুম, “হ্যাঁ, একটা কথা বলি...আমাদের এক মন্ত্রশিষ্য, বাড়ি কুসুমপুর, থানা রায়না, নাম পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম বামা—এ দিকেই কোথায় বিয়ে হয়েছে। তারাও জাতে তোমাদের বাড়ুই কিনা—তাই হয়তো চিনলে চিনতে পার। মেয়েটির জ্যাঠা দুর্লভরাম—ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিল মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি খোঁজ করে একবার সেখানে যেতে—তা যখন এলুমই এ দেশে....”

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেল, আমার দিকে অবাক হয়ে

চেয়ে বললে, "কুসুমপুরের হরিদাস মজুমদার? বামা?.....আপনি তাদের চিনলেন কি করে?"

বামার কথা স্মরণ করে গলা না কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে বললুম, "আমি যে তাদের গুরুবংশ—আমার বাবার ওরা মন্ত্রশিষ্য কী-না?"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, "বসুন, আমি আসছি...."

আমি একটা কুঠুরির মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনও কিছু যায় নি। আর এরা যে গুরুদেবকেই রেহাই দেবে তা কে বলেছে?

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এল; পেছনে পেছনে সেই বধূটি, আর একজন ষণ্ডামার্কা গোছের যুবক এবং একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক—সম্ভবত বৃদ্ধের স্ত্রী।

বৃদ্ধ বললে, "এই যে বামা, ঠাকুরমশায়। আমারই মেজছেলের সঙ্গে ....এই আমার মেজছেলে শম্ভু...গড় কর সব, গড় করো....মেজবৌমা, দেখ তো চিনতে পারো একে?

চমৎকার অভিনেত্রী বটে বামা। অদ্ভুত অভিনয় করে গেল বটে।

ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে গলায় আঁচল দিয়ে। জীবনদাত্রী, দয়াময়ী বামা! আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়ল।

তারপর সে রাত্রি তো কেটে গেল। খাবার জল দেবার ছুটো করে এসে বামা আমায় আশ্বাস দিয়ে গেল। বললে, "বিপদ কেটে গিয়েছে; আমার চোখে না পড়লে সর্বনাশ হত, ভিটেতে ব্রহ্মহত্যে হত। অনেক হয়েছে,—এই কুঠুরিতে,—এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোঁতা...."

আমার মনের অবস্থা বলবার নয়। বললুম, "পুলিশ কি গাঁয়ের লোক টের পায় না,—কিছু বলে না?"

"কে কী বলবে! এ ফাঁসুড়ে ডাকাতের গাঁ। সবাই এ-রকম। আগে জানলে কি বাবা এখানে বিয়ে দিতেন? বিয়ের পর সব ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। এখন আমার একটি সন্তান হয়েছে—এ পাপ-ভিটেয় বাস করলে তার অকল্যাণ হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কী করবে? মাথায় ওপর শ্বশুরমশায় রয়েছেন—পুরনো ডাকাত, দাদারা রয়েছে.........আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আর ভয় নেই..."

সকাল হল। বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরু-প্রণামী দিলে। বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম, "তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্বাদ করি চিরসুখী হও মা...."

বামার মত বুদ্ধিমতী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়েনি। কতকাল হয়ে গেল, এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই দয়াময়ী পল্লীবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ডাকাতে বামুন

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

মুকুন্দপুরের রেল-স্টেশন থেকে বকুলডাঙা পাক্কা সাড়ে চার ক্রোশ। মাঝে হাড়ভাঙা বিল। পথটা গেছে বিলের উত্তর ধার দিয়ে। সে সময় ঐ দিকটা জুড়ে ছিল একটা প্রকাণ্ড শরবন। লোকে সন্ধ্যার পর একা সে-পথে চল্‌ত না।

সেদিন গোবিন্দ চক্রবর্তীমশায় চলেছেন বকুলডাঙায় তাঁর এক শিষ্য গোবর্দ্ধন দাসের বাড়ী। আগে থেকে খবর-পত্র দেন নি। সেজন্য স্টেশনে গাড়ী বা লোকজনের ব্যবস্থা ছিল না। ট্রেন থেকে নেমে চক্রবর্তীমশায় দু'একজন সঙ্গী বা গাড়ী খুঁজলেন। প্রথমটি ত পাওয়া গেলই না, দ্বিতীয়টিও যা একখানা পেলেন, তার গাড়োয়ান সোজাসুজি জানিয়ে দিলে—'ওদিকে যেতে পার্‌ব না বাবু।'

তখনও বেলা ছিল। চক্রবর্তীমশায় ভাবলেন, সাড়ে চার ক্রোশ পথ আর এমন কি? তার ওপর জায়গাটাও নিতান্ত অচেনা নয়, হেঁটেই পথটা কাবার

ক'রে দেবেন। সেজন্য আর কালবিলম্ব না ক'রে সাদা ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে 'শ্রীদুর্গা' ব'লে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

আষাঢ় মাস। আকাশে মেঘ ছিলই। পোয়াটেক পথ পার না হ'তেই পুবদিক থেকে আরও একরাশ মেঘ এসে সব ঢেকে ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি নামল। চক্রবর্তীমশায় ছাতাটা খুলে মাথায় দিলেন। বৃষ্টির ধরন দেখে তাঁর মনে হ'ল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ধ'রে যাবে। কিন্তু ক্রোশ দেড়েক গিয়েও ধর্‌ল না, বরং বেশ চেপে এল। সেই সঙ্গে এমন অন্ধকার ক'রে এল যে, মনে হ'তে লাগ্‌ল—সন্ধ্যা লেগেছে।

একে জল-কাদাভরা কাঁচা পথ, তার ওপর এ-রকম বৃষ্টি। চক্রবর্তীমশায় কিছু বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগ্‌লেন, যদি কোথাও একখানা আটচালা বা একটা বড় গাছও থাকে, যার নীচে গিয়ে খানিক দাঁড়াতে পারেন। জল-কাদায় সাদা ক্যাম্বিসের জুতোজোড়াকে আর জুতো ব'লে চেনা যায় না। বৃষ্টির ছাঁটে ব্যাগটা, পরনের কাপড়, গলার সিল্কের চাদরখানা, এমন কি পৈতাগাছটি পর্যন্ত ভিজে জাব হ'য়ে গেছে। এর ওপর আরও দুটি উপসর্গ আছে —বাতাসের ঝাপ্‌টা ও বিদ্যুতের ঝিলিক। ছাতার কাপড় চুঁইয়ে এবং বাঁটের ওপরদিক থেকেও জল গড়িয়ে হাত ও কনুই ভিজে যাচ্ছে। কিন্তু কোন আশ্রয়ই তাঁর চোখে পড়ল না। অগত্যা ছাট আড়াল দেবার জন্যে ছাতাটা একটু কাত্ ক'রে ধীরে ধীরে এগোতে লাগ্‌লেন। এইভাবে কতদূর যে গেছেন, তার হিসেব নেই হঠাৎ একটা সোঁ-সোঁ শব্দে মাথা তুলে দেখেন, সাম্‌নে জঙ্গল। অন্ধকার তখন আর একটু ঘন ও ভারী হ'য়ে এসেছে। সেজন্যে জঙ্গলটা যে ঠিক কিসের তা প্রথমটা ঠাহর হ'ল না। আরও কয়েক পা গিয়ে বুঝলেন, হাড়ভাঙা বিলের উত্তরে শরবনের মুখে পৌঁছেছেন। এবার তাঁকে ঐ বন ভেঙে যেতে হবে। একে বর্ষার অন্ধকার সন্ধ্যা; তার ওপর চক্রবর্তীমশায় বনটার মধ্যে গিয়ে ঢুকতেই তাঁর মনে হ'ল, মাথা-সমান উঁচু শরগাছগুলো যেন পথের দু'পাশ থেকে তাঁকে ধরবার জন্যে সরু সরু আঙ্গুল বাড়িয়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বনের মাথায় পিট্‌পিট্ ক'রে জোনাকী জ্বল্‌ছিল, তলায় ব্যাঙ ও ঝিঁঝিগুলো পাল্লা দিয়ে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। ঐ সামান্য আলোর ফোঁটাগুলো ও ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোর ডাকও তাঁর ভাল লাগ্‌ল না।

তিনি একপাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথের মাঝখানে স'রে আসতেই দেখেন সাম্‌নে একটা ছায়ামূর্তি। মূর্তিটা দেখেই তিনি প্রথমটা চম্‌কে উঠ্‌লেন; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কে যায়?'

মূর্তিটা কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে চক্রবর্তীমশায়ের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। সেই সময় তিনি বিদ্যুতের আলোয় দেখ্‌লেন, লোকটার গায়ের রঙ কালো, মাথায় বাবরি, শরীর বলিষ্ঠ, লম্বায় সে তাঁর মত হবে। হাতে লাঠি বা কোন অস্ত্র নেই, কেবল মাথায় একটা ছাতা রয়েছে। সে একটু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—

'যাওয়া হবে কোথায়?'

চট্ ক'রে চক্রবর্তীমশায়ের মনে প'ড়ে গেল, জায়গাটা ভাল নয়। সত্য কথাটা একটু গোপন ক'রে তিনি বল্‌লেন—'পুবে। তুই আমাদের ফট্‌কে না?'

—'কোন্ ফট্‌কে?'

—'ঐ যে আমাদের—সেই যে—ওরে শোন্, আমার পিছনে দু'খানা গরুর গাড়ী আস্‌ছে। একজন চৌকীদার, চাকরবাকররা সব তাইতে আছে। আমি রশি দুই পথ থেকে নেমে এগিয়ে যাচ্ছি—'

লোকটার মুখ দেখতে না পেলেও চক্রবর্তীমশায়ের মনে হ'ল সে হাসতে হাসতে বললে—'পেন্নাম হই ঠাকুরমশায়! যাক্, এগিয়ে এসে ভালই করেছেন। আপনার ব্যাগটা আমার হাতে দিন—'

—'না বাপু। এতে আমার পুজোর কাপড়, গঙ্গাজল আছে। তুই যাচ্ছিস্ কোথায়?'

—'আজ্ঞে, এসেছি আপনাকেই নিতে—'

—'তার দরকার নেই বাপু। তুই বরং এগিয়ে গাড়ী দু'খানা ধর—'

—'গাড়ী গড়িয়ে-মড়িয়ে ঠিক আস্‌বে, ঠাকুর। পথটা খারাপ, আপনিই এগোতে পার্‌বেন না—'

চক্রবর্তীমশায় ঢোক গিলে বললেন—'একটা আলো নেই রে ফটিক?'

—'এই জঙ্গলে আলো কোথায় পাওয়া যাবে? আলো পাবেন গাঁয়ে। চলুন, আবার বুঝি জল আসে—'

—'তবে আমার আগে আগে চল্—'

—আপনি বেরাহ্মণ মানুষ। আপনার আগে আগে হাঁটতে পার্‌ব না ঠাকুর।" বলে লোকটা চক্রবর্তীমশায়ের পিছনের দিকে স'রে গেল।

চক্রবর্তীমশায় দেখলেন আর নিস্তার নেই; বললেন—'তবে পিছনেই আয়। কিন্তু গাড়ী দু'খানার একটু খোঁজ—'

—'গাড়ী ঠিক আস্‌বে, ঠাকুরমশায়—'

দু'জনে চলেছেন। কারও মুখে কথা নেই। বৃষ্টিটা একটু আগে ধ'রে গিয়েছিল। কিন্তু পথের কাদা ক্রমেই বাড়্‌ছে। তার ওপর আঠাল মাটি। চক্রবর্তীমশায়ের পা এক একবার পিছলে যায়। তিনি টাল সামলাবার জন্য ছাতাটাকে মুড়ে লাঠির মত ক'রে নিলেন। আরও কিছুদূর গিয়ে তিনি সেই লোকটাকে বল্‌লেন—'হাঁ বাপু ফটিক—'

—'কি বলছেন বাবাঠাকুর?'

—'বিলটা এখান থেকে কতদূর?'

—'ঐ যে বাঁ-ধারে। ওখানে মানুষ জন কিছুই নেই—'

—'আমি তা বল্‌ছি নে—'

তাঁর কথা শেষ না হ'তেই দূরে বার কয়েক 'কোক্' পাখী ডেকে উঠ্‌ল।

শরবনেও 'কোক্' পাখী থাকে, সাপ ধ'রে খায় এবং রাতের বেলায় ডাকে—এ কথা চক্রবর্তীমশায় জানেন। তবুও তাঁর বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্ল। তাঁর পিছনেও একটা পাখী বার দুই ডেকে উঠ্ল—'কুক্, কুক্!' তারপরই সব চুপ্। কেবল ব্যাঙ ও ঝিঁঝি ডাকছে, শরবনের মধ্যে বাতাসের শব্দ হচ্ছে—সো-ও—ও-ও! চক্রবর্তীমশায়ের মনে হ'ল, ওটা যেন মেয়েছেলের কান্না। তিনি ভাব্লেন, 'কি অশুভ লগ্নে আজ যাত্রা করেছিলাম। এই শরবনে অপঘাতে প্রাণ নষ্ট হবে?'

আরও কিছুদূর গিয়ে বাঁ ধার থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল কানে; চক্রবর্তীমশায় জিজ্ঞাসা করলেন—'ফটিক, ডাহুক-ডাহুকীর ডাক শোনা যায় না?'

ফটিক ব'লে উঠল—'জঙ্গলে কত কি থাকে। ঐ ত বাঁয়ে বিলের ধারে শ্মশান—ঐ আলো দেখা যায়—'

চক্রবর্তীমশায়ের বাঁ ধারে তাকিয়ে দেখলেন, সত্যই জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় একটু আলো দেখা যায়। তাঁর মন হঠাৎ ভয় ও ভরসায় দোল খেতে লাগ্ল। একবার ভাবলেন, ওদিকপানে ছুট্ দেন। নিশ্চয়ই কেউ ওখানে শবদাহ কর্ছে! আবার মনে হ'ল, তার বদলে যদি ওখানে কোন কাপালিক থাকে, তবে তাঁকেই বলি দিয়ে সে সিদ্ধিলাভ কর্বে।

এমন সময় ফটিক বল্লে—'বাবাঠাকুর, বাঁয়ের পথ ধর—'

ঠিক তখনই ডানধার থেকে কয়েকটা শিয়াল বড় করুণ স্বরে ডেকে উঠল। ঐ যে আবার সেই শব্দটা। ও যে বাঘের ডাকের মত বোধ হয়। চক্রবর্তীমশায়ের তালু শুকিয়ে এল; তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বল্লেন—'ফটিক, ওটা বড়শিয়ালের ডাক নয়?'

—'হ্যাঁ। কেঁদো ডাকছে। পা চালিয়ে চলুন।'

—'কোন্ দিকে?'

—'বাঁয়ে—'

—'ওদিকে ত বাপু, শ্মশান। শব্দটাও যে ঐ দিক থেকেই আস্ছে!'

—'তাতে আপনার ভয় কি? কেঁদোয় খেলে আমাকেই খাবে—'

—'তুমি সঙ্গে আছ যখন, তখন ভয় কিছু নয়। তবে ওদিকের পথটা ঘুর হবে না?'

—'ঐখানেই ত পথটা শেষ হয়েছে—'

—'বলিস্ কিরে? তবে কি—'

—'হ্যাঁ গো ঠাকুর, কেঁদোর আড্ডায় এসেছ। এখন ভাল মানুষের মত চল। না হ'লে টুঁটি কেটে ফেল্ব—' বলে ফটিক কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা রাম-দা বার করে চক্রবর্তীমশায়ের নাকের সাম্‌নে ধর্‌লে।

চক্রবর্তীমশায় আর কিছু বললেন না, বাঁ-ধারের পথ ধ'রে চুপচাপ চল্‌তে লাগ্‌লেন। কয়েক পা যেতেই তাঁর সাম্‌নে আর একটা ছায়া-মূর্তি এসে দাঁড়াল

কিন্তু সে তাঁদের দু'জনের কাউকেই কিছু বল্‌লে না, যেমন ছায়ার মত এসেছিল, তেমনি ছায়ার মত চল্‌তে লাগ্‌ল।

পথটা এবার খুব আঁকা-বাঁকা ও পিছল। চক্রবর্তীমশায় বড় কষ্টে সোজা হয়ে চলেছেন। কিন্তু বেশিদূর তাঁকে কষ্টভোগ করতে হল না; আন্দাজ মিনিটদশেক চলে একেবারে বিলের ধারে পৌছলেন।

ফটিক বল্‌লে—'ডাইনে—'

চক্রবর্তীমশায় ডাইনে ঘুরে গজ পাঁচ-ছয় যেতেই একটা উৎকট গন্ধ তাঁর নাকে এল। গন্ধটাকে নাক থেকে বার করে দেবার জন্যে তিনি বার কয়েক ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে সামনের জঙ্গলটা পার হয়েই দেখেন— একখানা খড়ের চালা, তার কোন দিকে বেড়া নেই, মাঝখানে একটি কালীমূর্তি। মূর্তির দু-পাশে বড় বড় মশাল—প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে জ্বল্‌ছে। সেই আগুনের চারধারে বনের নানারকম পতঙ্গ ঝাঁক বেঁধে উড়তে উড়তে হঠাৎ পুড়ে মর্‌ছে। মূর্তির সামনে আট-দশ জন বলিষ্ঠ লোক দাঁড়িয়ে, বসে গাঁজা টান্‌ছে। তাদের কারও পাশে, কারও হাতে রাম-দা, সড়কী ও লাঠি। মশালের কম্পিত আলোয় তাদের ছায়াগুলো কালীমূর্তির সামনে ভূতের মত নৃত্য কর্‌ছে।

লোকগুলো পিছন ফিরে বসেছিল। তিনজনে ঘরখানার ছেঁচ তলাতে গিয়ে দাঁড়াতেই ফটিক বল্‌লে—'কেঁদো, শিকার—'

চক্রবর্তীমশায় তখন ঠাকুর-প্রণাম করছেন। প্রণাম সেরে মাথা তুলে দেখেন, সামনে স্বয়ং কেঁদো। তার গায়ের রঙ কালো, শরীর বলিষ্ঠ ও লম্বা, মাথায় বাবরি, মুখের দু'পাশে গালপাট্টা, গোঁফ জোড়া বড়; পরনে লাল কাপড়। তার চোখ দুটো সাপের চোখের মত স্থির ও চক্‌চকে এবং গাঁজার নেশায় লাল হ'য়ে উঠেছে। চক্রবর্তীমশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ভাঙা-গলায় বললে— 'এদিকে কোথায় এসেছিস্?'

চক্রবর্তীমশায় কেঁদো কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—'তুই বুঝি শরবনটা আগলাস্?'

—'কেবল আগ্‌লাই না, এ বন দিয়ে যা যায় তাই ধরে খাই। কেঁদোর নাম শুনেছিস্?'

—'এখন ত চোখেই দেখ্‌ছি। কিন্তু আমি বল্‌ছি, আর বেশিদিন তোকে এম্‌নিভাবে খেতে হবে না—'

চারধার থেকে সকলে সঙ্গে সঙ্গে হুম্‌কি দিলে—'খবরদার!' কেঁদোরও চোখ দুটো ধিকি-ধিকি জ্বলতে লাগল।

চক্রবর্তীমশায় বললেন—'তুই মায়ের পূজারীকে খাবি বল্‌ছিস। তুই বাগ্‌দী না?'

—'তুই কি?'

চক্রবর্তীমশায় পৈতাগাছাটি চার আঙ্গুলে তুলে ধ'রে বল্‌লেন—'এই দেখ।

আমি ষট্‌চক্রে সাধনা করি। যোগিনীসিদ্ধ হয়েছি। আমি গণনা জানি—'

কেঁদোর চোখের আগুন ধীরে নিভে এল।

চক্রবর্তীমশায় কালী-মূর্তির দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—'মায়ের পুজো করে কে?'

কেঁদো বল্‌লে—'আমি নিজে—'

—'হুঁ। সেইজন্যে মায়ের কৃপা পাস্‌ না। এ বছরে ক'টা শিকার ধরেছিস্‌?'

—'আমি দশ বছর ধরে মাকে পুজো কর্‌ছি জানিস্‌?'

—'এই ক'বছরে ক'টা হাড়-মাংসওয়ালা শিকার খেয়েছিস্‌?'

—'আজ খাব—পেট ভরে—.

—'কাকে? কোথায়?'

—'সে তোর দরকার কি? তোর কাছে কি আছে?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে, হঠাৎ চক্রবর্তীমশায় গম্ভীর গলায় চীৎকার ক'রে উঠলেন—'মা—মা—মা—'

শব্দটা দম্‌কা বাতাসে শরবনের ওপর দিয়ে, বিলের কূল দিয়ে, জলের ওপরে ওপরে ভেসে গেল। সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকাল, তার একটু পরেই গুরু গুরু মেঘ ডেকে উঠ্‌ল।

চক্রবর্তীমশায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—'মায়ের পুজো হয়েছে?

কেঁদো বল্‌লে—'না—'

—'আজ তোর হ'য়ে আমি পুজো কর্‌ব। পুজোর শেষে ঐ আসনেই আমার গলায় খাঁড়া বসিয়ে সেই রক্ত কপালে মেখে শিকার ধর্‌তে যাস্‌। আর আমার মুণ্ডটা মায়ের পায়ে ফেলে দিস্‌—'

কেঁদো একবার সকলের মুখের দিকে তাকালে তারাও পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌ল।

চক্রবর্তীমশায় বললেন—'এটা শ্মশান না? চারটে মড়ার মাথা সংগ্রহ কর্‌তে পারিস্‌? তা দিয়ে আসন কর্‌ব। জয় মা বরাভয়দায়িনী, বিপদবারিণী, দস্যুনাশিনী—'

কেঁদো বল্‌লে—'এ শ্মশানে কেউ আসে না—'

—'হুঁ। তবে ভূম্যাসনে ব'সেই পুজো কর্‌ব। হাত-পা ধোবার জল দে। নৈবেদ্য কোথায়? ফুল চন্দন কৈ? বলির যোগাড় আছে ত?'

—'বলি?'

—'হাঁ। মায়ের পুজোর জন্য রক্ত চাই—কাঁচা, গরম রক্ত না হলে মায়ের তৃপ্তি হবে না—'

কেঁদো বল্‌লে—'মেঘা, একটা পাঁঠা নিয়ে আয়—'

চক্রবর্তীমশায় বল্‌লেন—'ঘোর কালো রঙের পাঠা; ঐ যে এক ঝুড়ি রক্তজবা রয়েছে দেখ্‌ছি। চন্দনাদি কৈ? হুঁ কোন উপচার নেই অথচ বেটারা

পুজো করে। জল দে। না, ও জল হবে না—'

সেখান থেকে ক্রোশ দেড়েক উত্তরে মোহরকোটা গাঁ। মেঘা তৎক্ষণাৎ 'রণপা' চ'ড়ে বলির পাঁঠা আনতে সেদিকে ছুটল।

কেঁদোর চোখে-মুখে সন্দেহ ফুটে উঠল; বল্‌লে—'ঠাকুরমশায়, তুমি বিলের ধারে যেয়ো না, ঐ চাটায়ে বস।...ওরে বনমালী, দু' কলসী জল নিয়ে আয়—'

চক্রবর্তীমশায় ছাতা ও ব্যাগটা মাটিতে রেখে জুতো জোড়া খুলে চাটায়ের ওপর বসে গলা থেকে সিল্কের চাদর নিয়ে কোলের ওপর রেখে একটু হেসে বল্‌লেন—'ঐ বিল সাঁতরে পার হওয়া সহজ নয় রে কেঁদো—'

বনমালী অর্থাৎ চক্রবর্তীমশায়ের ফটিক তৎক্ষণাৎ কলসী দুটোর জল ফেলে দিয়ে বিল থেকে জল নিয়ে এল।

চক্রবর্তীমশায় হাত, পা ও মুখ ধুয়ে ব্যাগ থেকে গামছা, তসরের ধুতি ও গঙ্গাজলের শিশিটা বার ক'রে হাত-পা মুছে, ধুতিখানা পরে, ব্যাগ থেকে পনেরটি ট্যাকা ও ভরিটাক সোনা বার ক'রে কেঁদোর দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন—'রাখ—'

কেঁদো তাঁর সাম্‌নে হাত পাত্‌লে।

চক্রবর্তীমশায় তার হাতের ওপর আল্‌গোচে সেগুলো ফেলে দিয়ে শিশি থেকে গঙ্গাজল নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে পুজোয় বস্‌লেন।

লোকগুলো চক্রবর্তীমশায়ের পিছনে বস্‌ল কেবল খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে রইল কেঁদো। অন্ধকার রাত, ঝুপ-ঝুপ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে; লোকগুলোর চেহারা রুক্ষ ও কালো, চক্রবর্তীমশায়েরও গায়ের রঙ ঘোর কালো, সামনে আভরণহীন কালীমূর্তি। মশাল দুটিও ছায়া নিয়ে প্রতিমার সাম্‌নে নাচাচ্ছে। চক্রবর্তীমশায় উঁচু ও ভারী গলায় মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌ছেন। মন্ত্রের শব্দ ও ধ্বনি, শরবনের কান্না, বিলের ছল-ছলাৎ শব্দ একসঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, ডাকাতের দল মুগ্ধ হ'য়ে গেল। গত দশবছরের মধ্যে তাদের পুজো এমন জমেনি। মূর্তির পা দু'খানা রক্তজবায় ক্রমে ঢেকে গেল।

হঠাৎ চক্রবর্তীমশায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—'কেঁদো, মা বল্‌ছে, আজ রাতে কোথায় কাকে খাবার ইচ্ছা করেছিস্?'

কেঁদো এক পা এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় ক'রে ভক্তি-গদ-গদ কণ্ঠে বললে—'বকুলডাঙার গোবর্দ্ধন দাসকে—'

—'কাকে?'

—'বকুলডাঙার গোবর্দ্ধন দাসকে—'

চক্রবর্তীমশায় ধ্যানস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন—'শিগ্‌গির বলি আন, লগ্ন ব'য়ে যায়—'

কেঁদো ক্ষেপে গেল—'হারামজাদা মেঘাটা এখনও ফির্‌ল না। আজ ওর

কল্‌জে ছিঁড়ে খাব। এই ভোঁতা, হাঁক দে—'

ভোঁতা তৎক্ষণাৎ মুখের দু'পাশে হাত দিয়ে দু'বার বাঘের মত হাঁক দিলে। বহুদূর থেকে তার উত্তর ফিরে এল। তার খানিকক্ষণ পরেই এল 'রণপা' চড়ে মেঘা। তার ঘাড়ে একটা কালো রঙের ছোট পাঁঠা ক্ষীণ গলায় ডাকছে— 'ম্যা—অ্যা—অ্যা, ম্যা—অ্যা—।' পাঁঠাটার পা চারখানা একসঙ্গে মেঘার গলার নীচে নার্‌কেল দড়ি দিয়ে বাঁধা।

কেঁদো বললে—'ঠাকুর, বলি এসেছে—'

চক্রবর্তীমশায় বললেন—'চান করা।'

কেঁদো পাঁঠাটাকে চান করালে। মাটির খুরিতে তেলসিঁদুর ছিল। চক্রবর্তীমশায় পাঁঠাটার কপালে তেলসিঁদুর পরিয়ে মন্ত্র পড়্‌লেন। মালা নেই; তার মাথায় একটা জবা ফুল দিয়ে বল্‌লেন—'হাড়কাঠে ফেল্—'

জগা পাঁঠাটার সামনের পা দু'খানা পিঠমোড়া ক'রে পিছনের পা দু'খানা ধ'রে তার গলাটা হাড়কাঠে ফেললে।

চক্রবর্তীমশায় জিজ্ঞাসা করলেন—'কে কাটবে কেঁদো? তুই? তোরা সকলে আমার সঙ্গে সঙ্গে তালি বাজা, নৃত্য কর্। এই নে কানে দুটো ক'রে ফুল

গোঁজ—'

সেই সময় দূর থেকে শিয়ালের দল উচ্চকণ্ঠে চীৎকার ক'রে ঘোষণা করলে—রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর কাটল।

সকলে দুটো ক'রে জবা কানে গুঁজলে।

চক্রবর্তীমশায় বললেন—'এখন বাজা—'

তিনি বসে বসে তালি দিতে লাগ্‌লেন। আর সকলে সেই তালে তালে প্রতিমার সামনে নাচতে শুরু করলে—'ধপ্ ধপ্' আর তালি বাজাতে লাগ্‌লে —'চটাক্, চটাক্, চটাক্, চটাক্।'

সেই তাণ্ডব শব্দের মাঝে বলি হ'য়ে গেল।

চক্রবর্তীমশায় পাঁঠার ছিন্ন মাথাটি প্রতিমার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম ক'রে সকলকে বললেন—'প্রণাম কর—'

সকলে প্রণাম করলে। চক্রবর্তীমশায় তাদের কপালে সিঁদুর ও রক্তের ফোঁটা দিয়ে নিজের কপাল জুড়ে রক্ত মাখ্‌লেন। তারপর কেঁদোর হাত থেকে রক্তমাখা খাঁড়াখানা নিয়ে বল্‌লেন—' তোর আজকের যাত্রা সফল হবে। আমার দক্ষিণে দে—'

কেঁদো ট্যাঁক থেকে চক্রবর্তীমশায়ের টাকা পনেরটি ও সোনাটুকু বার ক'রে তাঁর হাতে দিতে দিতে বল্‌লে—'এই ধর, এ আমারই সম্পত্তিতে—'

—বটে! আচ্ছা চল্ আমি তোদের আগে আগে যাব।'

চক্রবর্তীমশায়ের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কাছেই একটা তীক্ষ্ণ বাঁশীর শব্দ শোনা গেল।

মেঘা সচকিত হয়ে ব'লে উঠল—'পুলিশ!'

চক্রবর্তীমশায় দেখলেন, চারধারে 'লাল-পাগড়ির' বেড়া; তাদের হাতে বন্দুক ও মশাল। চক্রবর্তীমশায় হাতের খাঁড়া ফেলে দিয়ে হাত জোর করে দাঁড়ালেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে। একজন কনস্টেবল তাঁকে হাতকড়ি পরিয়ে খাঁড়াখানা তুলে নিয়ে হাঁক দিলে—'আরে সর্দার পাকড় গিয়া—'

চারধারে তখন চীৎকার ও ছুটাছুটি চলছে; বিলের জলে শব্দ হ'ল 'ঝপাস্', সেই সঙ্গে বন্দুকেরও আওয়াজ হ'ল—'দুম দুম'। তারপরই সব চুপ।

চক্রবর্তীমশায় এতক্ষণ একরকম জ্ঞান হারিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ একটা কনস্টেবলের গুঁতোয় তাঁর চমক ভাঙ্গল। তিনি তাকিয়ে দেখ্‌লেন, সামনে দারোগাসাহেব।

তাঁর পাশে কেঁদো, ভোঁতা, মেঘা আরও জন তিনেক। বাকী ক'জন বনে গা ঢাকা দিয়েছে। সকলেরই হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি।

দারোগাসাহেব ব'লে উঠলেন—'কেঁদো বেটা কৈ?'

'ই-বা—' ব'লে একজন কনস্টেবল চক্রবর্তীমশায়ের পিঠে আবার একটা গুঁতো দিলে।

দারোগাসাহেব তাঁর মুখের দিকে একটু ভাল ক'রে তাকিয়েই বলে উঠলেন—'এ কি! গুরুদেব! এ কি ব্যাপার?'

চক্রবর্তীমশায়ও এবার দারোগাসাহেবকে চিন্‌তে পার্‌লেন, দারোগাসাহেব যে তাঁর শিষ্য গোবর্ধনের জামাতা। তিনি ভারী গলায় বললেন—'বাবা' সমূহ বিপদে পড়েছি। এতক্ষণ ডাকাতের হাতে ছিলাম, মায়ের প্রসাদে বেটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তোমার শ্বশুর-বাড়ী পালাবার ফিকির করেছিলাম। ও বেটা আজ তারই সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল। এবার পড়্‌লাম তোমাদের হাতে। আর আমার নিস্তার নেই—'

দারোগাসাহেব একটু হেসে নিজের হাতে চক্রবর্তীমশায় হাতকড়া ও কোমরের দড়ি খুলে দিয়ে পায়ের ধুলো নিলেন; তারপর বললেন—'এখানে কি ক'রে এসে পড়লেন, বলুন ত?'

চক্রবর্তীমশায় আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত ক'রে বল্‌লেন—বাবা, মা মঙ্গলময়ী তোমার মঙ্গল করুন।'

দারোগা সাহেব বল্‌লেন—'আপনার কৃপাতেই বেটাকে ধরা গেল্‌। আমাদের আসতে কিছু দেরী হয়ে গেছে। চলুন, গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে; আমি ঘোড়ায় যাব—'

সেখানে মালপত্র যা পাওয়া গেল, সব তুলে নিয়ে সকলে বকুলডাঙার দিকে রওনা হ'ল।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে আরও দু'জন ডাকাত ধরা পড়্‌ল, কিন্তু বাকী তিনজনকে আর পাওয়া গেল না।

তারপর তাদের যথারীতি বিচার হ'ল। বিচারে ডাকাতদের হ'ল কঠোর শাস্তি। আর কেঁদোকে ধরবার জন্যে যে পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল, চক্রবর্তীমশায় পেলেন তার অর্ধেক।

এটা অনেক দিন আগেকার ঘটনা। তারপর দু'পুরুষ কেটে গেছে। হাড়ভাঙা বিলের উত্তরে সে শরবন আর নেই; এখন সেখান দিয়ে একটা পাকা সড়ক চলে গেছে। চক্রবর্তীমশায়ও বহুকাল গত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর বংশধরদের লোকে আজও বলে—'ডাকাতে বামুন'।
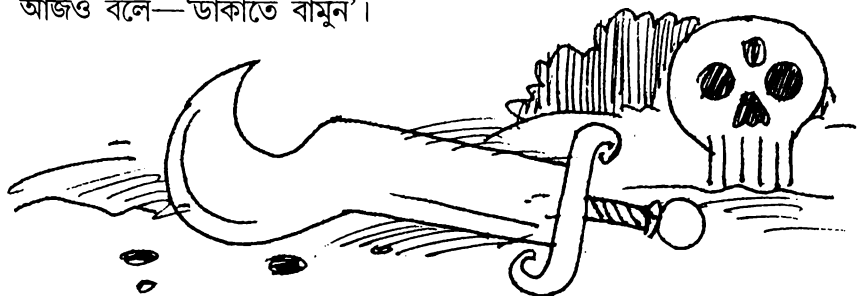
মোনা ডাকাত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মোনা ডাকাতের নাম শোনেনি এ রকম লোক আমাদের ও অঞ্চলে নেই বললেই হয়। ইয়া লম্বা চওড়া জোয়ান। টাঙ্গির মতন গোঁফ। মাথায় একমাথা বাবরি-কাটা কোঁকড়ানো চুল। শোনা যায় নাকি গায়ের জোর তার অসাধারণ।

তার এই গায়ের জোর নিয়ে কত গল্প, কত কাহিনী যে লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় তার আর অন্ত নেই। মোনা নাকি, একবার একটি হাতি মেরেছিল, বন্দুকের গুলি তার কিছুই করতে পারে না, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া, তিনতলা চারতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফান—এসব ত তার কাছে ছেলেখেলা!

থাকবার মধ্যে গ্রামের একটেরে মোনার একখানা কুঁড়েঘর ছাড়া আর কিছু নেই। মোনা নিজেই কতবার বলেছে, চুরি-ডাকাতি করা টাকা-পয়সা থাকে না বাবু। কেমন করে সে কোনদিক দিয়ে যে উড়ে যায় নিজেই বুঝতে পারি না।

লোকে বলে, বুঝতেই যদি পারিস তাহলে চুরি করিস কেন?

মোনা একটুখানি হেসে জবাব দেয়, থাকতে পারি না বাবু। স্বভাব যায় না মলে।

সংসারে তার নিজের বলতে একদিন সবই ছিল। এখন মাত্র পাঁচ ছ বছরের ফুটফুটে সুন্দর একটি নাতনি ছাড়া আর কেউ নেই।

স্ত্রী-পুত্র তার কেমন করে গেল তারও একটা গল্প আছে। সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে যা বলে তাই বলছি।

আমাদের গ্রামের উত্তর দিকে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড সোজা চলে গেছে। এই গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডই ছিল মোনার শিকারের জায়গা। রাত্রির অন্ধকারে শহর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যারা যাওয়া-আসা করত মোনার হাতে তারা নিস্তার পেত না। কত রকম কত নিরীহ যাত্রী যে মোনার হাতে প্রাণ দিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। না চাইতেই মোনার হাতে টাকাকড়ি জিনিসপত্র যারা তুলে দিত তাদের সে কিছু বলত না, কিন্তু জোর জবরদস্তি করলেই মুস্কিল! মাথার উপর প্রচণ্ড এক লাঠির আঘাতেই তাকে সে শেষ করে দিত। মৃতদেহ কোনদিন বা রাস্তার উপরেই পড়ে থাকত, কোনদিন বা রানি-সায়রের পাঁকে দিত পুঁতে।

এর জন্যে পুলিস যে মোনাকে ধরেনি তা নয়। কতবার সে জেল খেটেছে কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়েই যে-কে সেই!

প্রায় হপ্তাখানেক ধরে মোনার একবার কোন শিকারই মেলেনি। মনের অবস্থা ভারি খারাপ। সন্ধ্যায় সেদিন প্রচুর মদ খেয়ে প্রকাণ্ড একটা লাঠি হাতে নিয়ে শিকারের সন্ধানে রানি-সায়রের একটা গাছের তলায় মোনা দাঁড়িয়েছিল।

অন্ধকারে হন হন করে একটা লোক এগিয়ে আসছে দেখে মোনা ছুটে গিয়ে মারলে তার মাথায় এক লাঠি!

লাঠি খেয়ে লোকটা ঘুরে পড়ল। বললে, বাবা, আমি।

আমি কেরে ব্যাটা! আমি-টামি শুনছি না বাবা, আজ সাতদিন চুপ করে বসে আছি, দে তোর সঙ্গে কী আছে দে!

বলেই মোনা হাত পাতলো। কিন্তু এ কী! লোকটা আর কথাও কয় না, নড়েও না! বোধহয় এক লাঠিতেই শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারে সে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলে, গায়ে জামা নেই, হাতেও কিছু নেই। টাকাকড়ি হয়তো ট্যাঁকে গোঁজা আছে ভেবে কোমরের কাপড়টা ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখলে, ছ'টি মাত্র পয়সা। তাই তা-ই। পয়সা ছ'টা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। বললে, এবারে বাঁচতে পারিস ত বেঁচে ওঠ বাবা, আমার কোন আপত্তি নেই।

শিকারের সন্ধানে সে আরও কিছুক্ষণ রইল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেদিন আর ওই ছ'টা পয়সার বেশি সে পেলে না, মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে এল।

পরের দিন সকালে গ্রামের মধ্যে এক হুলুস্থূল কাণ্ড। মোনা ডাকাতের ছেলে মাধবের মৃতদেহ রানি-সায়রের পাড়ে আছে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সেখানে ভিড়

করে গিয়ে দাঁড়াল, থানা থেকে পুলিশ এল, কনস্টেবল এল, চৌকিদার এল।

কথাটা মোনার কানে যেতেই সে একবার চমকে উঠল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভেবে সে ছুটল রানি-সায়রের দিকে। চোখ দিয়ে তখন তার দরদর করে জল গড়াচ্ছে। গিয়ে দেখলে, মৃতদেহটাকে জড়িয়ে ধরে তার স্ত্রী তখন চিৎকার করে কাঁদছে আর বুক চাপড়াচ্ছে। বৌ কাঁদছে মাটিতে শুয়ে আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাধবের দশ বছরের মেয়ে রানি আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে।

সর্বনাশ! সবাই জানে রাস্তার ধারে রাত-বিরেতে ঠেঙ্গিয়ে মানুষ মারে মোনা ডাকাত। আজ সেই তার ছেলেকে কে মারলে কে জানে! মোনাই যে তাকে মেরেছে সে কেউ ভাবতেও পারলে না। হোক না ডাকাত, তাই বলে নিজের ছেলেকে কেউ মারতে পারে নাকি?

অনেকে বলতে লাগল, এমনিই হয়। কত লোকের কত ছেলেকে সে মেরেছে, তার ছেলে মরবে না ত কে মরবে! ভগবান আছেন ঠিক।

পুলিশ লাস নিয়ে চলে গেল। কে যে তাকে মেরেছে তার আর কোন কিনারা হল না।

এই নিয়ে গ্রামের মধ্যে দিন পনেরো খুব আন্দোলন চলল। যেখানে সেখানে যার তার মুখে শুধু এই কথা ছাড়া যেন আর কথা নেই।

তারপরেই সব চুপচাপ।

এমন দিনে মোনার বাড়িতে আর এক বিপদ।

ছেলেকে নিজের হাতে খুন করে পর্যন্ত মোনা যেন কেমন গুম হয়ে গিয়েছিল। কারও সঙ্গে ভালো করে কথা বলত না, কাজ-কর্ম তার একদম বন্ধ, বাড়িতে নিত্য অভাব যেন তার লেগেই রইল।

স্ত্রী তার ঝগড়া করতে লাগল, যেমন কর্ম তেমনি ফল। এত অধর্ম সইবে কেন?

মোনা চুপ করে রইল, একটি কথারও জবাব দিলে না।

তারপর মোনা একদিন কিছুতেই আর থাকতে পারলে না। সত্যি কথাটা এখনও সে কাউকে বলেনি। হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় তার মনে হল কথাটা না বললে এবার সে হয়ত ভেতরে গুমরে গুমরে মরেই যাবে। তাই সে তার স্ত্রীকে বলে ফেললে, দ্যাখো, মাধবকে সেদিন আমি মেরে ফেলেছি।

স্ত্রী তার মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে রইল, তুমি? কেন?

অন্ধকারে চিনতে পারিনি। নেশার ঝোঁকে—

কথাটা সে আর শেষ করতে পারলে না। শুয়ে শুয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

মোনা ডাকাতকে এমন করে কাঁদতে তার স্ত্রী কোনদিন দেখেনি।

পরের দিন সকালে দেখা গেল, রান্নাঘরে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে মোনার

স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে।

স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, রইল বিধবা বৌ আর নাতনি।

বিধবা বৌ তার অনেকদিন থেকে জ্বরে ভুগছিল। এমনি মজা, শাশুড়ি মরার মাসখানেক পেরোতে না পেরোতেই বিধবা বৌটাও তার মরে গেল।

বাকি রইল শুধু তার নাতনি রানি!

লুকিয়ে লুকিয়ে লোক বলতে লাগল, এবার ওটাও যাবে।

মোনারও কেমন যেন মনে হল বিধাতার অভিশাপ! পাপীকে ভগবান বুঝি এমনি করেই শাস্তি দেন।

রানি বড় সুন্দরী মেয়ে। মোনার বাড়িতে মেয়েটাকে মোটেই মানায় না—এত সুন্দরী!

সারা গ্রামের মধ্যে তার মত রূপসী আর আছে কিনা সন্দেহ। সাদা ধপধপ করছে তার গায়ের রং। যেন দুধে-আলতায় গোলা। কালো কালো চুলের গোছ তার সারা পিঠটাকে ঢেকে দেয়। মুখের পানে তাকালে আর সহজে চোখ ফেরানো যায় না। দশ বছরের মেয়ে এমনি বাড়ন্ত গড়ন, মনে হয় যেন এরই মধ্যে সে কৈশোর অতিক্রম করেছে।

এখন এই মেয়েটাই হল একমাত্র অবলম্বন। চব্বিশ ঘণ্টা ডাকে, দিদি!

রানি কাছে এসে দাঁড়ায়, বলে, কি বলছ দাদু?

মোনা বলে, কিছু বলিনি দিদি। কি করছ তাই জিগ্যেস করছি।

রান্না করছি দাদু। অম্বলটা হয়ে গেলেই তোমাকে খেতে দেব।

মানুষ মারার ব্যবসা মোনা এখন একদম ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে শুধু এই মেয়েটার জন্যে।

নিতান্ত যখন অভাব পড়ে, এতদিনের অভ্যেস, এক একবার তার মনে হয়—যাই মাকালী বলে কিছু রোজগার করে আনি! কিন্তু লাঠিটা হাতে নিয়েই আবার নামিয়ে রাখে। মনে হয় ভগবান যদি তাকে আবার শাস্তি দেন! যদি এই মেয়েটাও মরে যায়।

আগে সে জেল-কয়েদকে মোটেই ভয় করত না। কতদিন কত ব্যাপারে তার জেল হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে জেলে গিয়ে ঢুকেছে, আবার মেয়াদ ফুরোতেই বুকের ছাতি ফুলিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছে।

এখন মনে হয় জেলে যাওয়া তার কোনমতেই চলতে পারে না। সে যদি জেলে যায়, এই মেয়েটা পথে দাঁড়াবে। একে দেখবার আর কেউ নেই। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার অভাবে হয়ত মরেই যাবে।

রানিকে মোনা সুখে রাখতে চায়। সংসারের কাউকেই ত সে সুখে রাখতে পারেনি। একরত্তি এই মেয়েটাকেও যদি সে সুখে রাখতে না পারে ত বৃথাই তার জীবন! বৃথাই সে পুরুষ হয়ে জন্মেছে।

মোনা দিন কতক দূরের একটা শহরে গিয়ে ভিক্ষে করতে আরম্ভ করলে।

কিন্তু দিন কয়েক পরে দেখলে, ভিক্ষে তাকে আর কেউ দিতে চায় না। কেউ বা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, কেউ বা বলে, দিব্যি শরীর রয়েছে, খেটে খাওগে বাবা।

মোনা কি যে করবে বুঝতে পারে না। কায়স্থের ছেলে লেখাপড়াও শেখেনি যে কাজকর্ম করবে।

গ্রামের জমিদার বৃদ্ধ অজয় চৌধুরী মস্ত বড়লোক। এক একবার ভাবে, জমিদারকে গিয়ে ধরিগে! আবার ভাবে, এককালে এই জমিদারকে সে গ্রাহ্যও করেনি। কতবার তাঁর আদেশ অমান্য করেছে, এমন কী যখন সে জোয়ান ছিল, এই পৃথিবীটাকে সে অন্য চোখে দেখত, তখন সে তাঁকে একটু আধটু অপমানও করেছে। সেই লজ্জায় এখন সে তাঁর কাছে যেতেও পারে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে তাকে একদিন হলোই। জমিদারবাবু বাইরের ঘরে বসে ছিলেন, মোনা তার লাঠিটা মাটিতে নামিয়ে তাঁর পায়ের কাছে টিপ করে একটি প্রণাম করলে।

অজয় চৌধুরী মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কিরে? মোনা কী মনে করে?

মোনা বললে, বাবু একটা চাকরি-বাকরি দিন।

কেন? ডাকাতি করগে যা না।

মোনার চোখ দুটো ছল ছল করে এল, বললে, আর লজ্জা কেন দিচ্ছেন কর্তা।

খানিক চুপ করে থেকে জমিদারবাবু বললেন, চাকরি করবি? বেশ, তবে কাল থেকে আমার চাপরাশির কাজ কর!

মোনা হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে এল। বাড়িতে ঢুকেই ডাকলে, দিদি!

রানি ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল।

মোনা বললে, কাল থেকে জমিদার বাড়িতে চাকরি করব দিদি! এবার আর তোর ভাবনা নেই। ভালো ভালো শাড়ি এনে দেবো....তুই যা চাইবি দিদি, তাই এনে দেব।

আমার কিছুই চাই না দাদু, বলে রানি চলে যাচ্ছিল, মোনা বলল, চলে যাচ্ছিস কেন ভাই, শোন! কিছু চাইনে? ভালো একটি বর যদি এনে দিই...

যাঃ-ও!

লজ্জায় এবার সে সত্যিই চলে গেল।

দুই নাতনি-ঠাকুরদার পরমানন্দে দিন কাটছিল। মোনার সংসারে আর তেমন অভাব নেই। মাইনে যা পায় তাই দিয়ে দু'জনের বেশ চলে যায়।

জয়নগরের একটা বাঁধের দখল নিয়ে দুই জমিদারে বাধল একটা মামলা। এক তরফে আমাদের অজয় চৌধুরী, আর এক তরফে জয়নগরের জমিদার। বাঁধে জোর করে মাছ ধরিয়ে দখল নিতে হবে।

অজয় চৌধুরী মোনাকে ডেকে বললেন, মোনা পারবি?

জমিদারবাবুকে প্রণাম করে লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে মোনা উঠে দাঁড়াল।

তারপর জনকতক জেলে সঙ্গে নিয়ে মোনা একাই গেল পুকুরের দখল নিতে।

প্রকাণ্ড বড় বড় পাঁচটা মাছ নিয়ে মোনা ফিরে এল। জমিদার খুশি হয়ে তার দিকে তাকাতেই দেখলেন, তার কাপড়ে কাঁচা রক্তের দাগ, লাঠিটা রক্তে রাঙা হয়ে গেছে, একি! খুন-খারাপি হয়ে গেছে নাকি?

হাসতে হাসতে মোনা বললে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এমন ত হয়েই থাকে বাবু। বেশি কিছু হয়নি, একটা ছোঁড়া মনে হল যেন পড়ে গেছে!

পড়ে গেছে কিরে?

একটা ছোঁড়া এসেছিল আমার মাথায় লাঠি চালাতে। জনপঞ্চাশেক এসেছিল বাবু, তা কেউ এগোল না। শুধু ওই একটা ফাজিল ছোঁড়া বলে কিনা—রেখে দে তোর মোনা ডাকাত, বুড়ো হয়েছিস এখন আর তোর—আর বেশি কিছু বলতে দিইনি বাবু।

অজয় চৌধুরী জিগ্যেস করলেন, খুন করে ফেললি?

মোনা বললে, আজ্ঞে না, খুন আমি আর করব না পিতিজ্ঞে করেছি। মাথায় মারিনি, খুন ঠিক হবে না, তবে হাত দুটো হয়ত গেছে।

চৌধুরী বললেন, তা বেশ করেছিস। যা কাপড়টা বদলে হাত পা ধুয়ে ফেল।

কিন্তু তার পরের দিন বাধল এক মহা গণ্ডগোল! পুলিশ এল মোনাকে ধরে নিয়ে যেতে।

চৌধুরীমশাই অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু মোনা ডাকাত এ অঞ্চলে বিখ্যাত লোক। গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাকে চিনে ফেলেছে। পুলিশ শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু অজয় চৌধুরী জামিন দিয়ে সেইদিনই তাকে ছাড়িয়ে আনলেন।

মামলা চলতে লাগল। অজয় চৌধুরী চেষ্টার ক্রুটি করলেন না, টাকাও বিস্তর খরচ করলেন। কিন্তু মোনাকে তো খালাস কিছুতেই করে আনতে পারলেন না। মোনার একমাস জেল হয়ে গেল।

মোনা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল। একমাস মাত্র জেল, তারই জন্যে মোনা আজ কিনা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। অবাক কাণ্ড। এ রকম জেল তার কত হয়েছে। কোনদিন কেউ তাকে কাঁদতে দেখেনি।

সবাই বলতে লাগল, চিরদিন কি আর কারও সমান যায় রে বাবা। বুড়ো হয়েছে, আর কী সে জেলের কষ্ট সইতে পারে।

কিন্তু হায়, কেউ তার মনের কথা বুঝলে না। জেলের জন্যে সে কাঁদেনি, কেঁদেছে রানির জন্যে। কাঁদতে কাঁদতে সে জেলে গিয়ে ঢুকল।

একমাস মাত্র তিরিশটি দিন। দেখতে দেখতে কেটে গেল। মোনা গ্রামে ফিরে এল। পাগলের মত ছুটতে ছুটতে সে তার বাড়ির দরজায় এসে ডাকলে,

দিদি। দিদিমণি! আমি এসেছি।

কিন্তু এ কী! কারও সাড়া না পেয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে, দরজায় তালা বন্ধ। বাড়িতে কেউ নেই, রানি গেল কোথায়?

মোনা তখনি জমিদারের বাড়ির দিকে ছুটল। অজয় চৌধুরী বাইরের ঘরে একলা বসেছিলেন, উন্মাদের মত মোনা তার পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল, আমার দিদিমণি কোথায় গেল বাবু?

দিদিমণি? চৌধুরীমশাই হাসতে লাগলেন, বললেন, সে পালিয়েছে।

পালিয়েছে কী? মোনা তাঁর মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে বললে, হাসছেন যে?

দাঁড়া আসছি। বোস একটু ঠাণ্ডা হ। চৌধুরীমশাই বাড়ির ভিতর উঠে গেলেন।

মোনা হতভম্বের মত বসে রইল। ভাল করে কিছুই বুঝতে পারলেন না।

খানিক পরেই জমিদারমশাই-এর বদলে সেখানে এসে দাঁড়ালো রানি।

রানিকে দেখে মোনা চিৎকার করে উঠল, দিদি!

রানিও তার কাছে ছুটে এল, বললে, দাদু তুমি এসেছ? আমার জন্যে সেখানে খুব ভাবছিলে বুঝি?

পরস্পর মুখের পানে তাকিয়ে কেঁদে ভাসালো। তারপর কান্না থামলে,

তাদের যে কত কথা।

মোনা দেখলে রানি এখানে বেশ সুখে আছে। কেনই বা থাকবে না। একে জমিদারের বাড়ি, তার উপর ভালো করে দু'বেলা খেতে পায়। ভালো ভালো শাড়ি পরে গয়না পরে—রানি সেজেছে ঠিক রানির মত।

মোনা তার দিকে তাকিয়ে আর যেন চোখ ফেরাতে পারে না।

রানি বললে, চল দাদু, এবার আমরা যাই।

মোনার যেন ধ্যান ভাঙল। বললে, কোথায় যাবি ভাই?

রানি বললে, আমাদের বাড়িতে।

আমাদের বাড়িতে? কেন দিদি, এখানে ত বেশ সুখে আছিস।

রানি কিন্তু জিদ ধরে বসল তা হোক দাদু, আমি তোমার কাছে থাকব।

আমার কাছে? মোনা একটু হেসে বললে, আমার কাছে দু'বেলা পেটভরে যে খেতেও পাস না দিদি?

রানি বললে, না দাদু, তা হোক তুমি চল।

মোনা কী করবে কিছু বুঝতে পারলে না। খানিক চুপ করে কি যেন ভেবে বললে, এক গ্লাস জল আনত ভাই। ভারি পিপাসা পেয়েছে।

রানি ছুটল বাড়ির ভেতর থেকে জল আনবার জন্যে।

বেশিক্ষণ যায় নি। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে রানি ফিরে এল। এসে দেখে দাদু নেই।

দাদু! দাদু! কিন্তু কোথায় দাদু?

বর্ষাকাল। চারিদিক অন্ধকার, বাইরে তখন ঝমঝম করে বাদল নেমেছে।

এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় সে গেল?

গ্লাস হাতে নিয়ে দরজার কাছে অনেকক্ষণ রানি দাঁড়িয়ে রইল। মোনা তবু ফিরল না। গ্লাসটা নামিয়ে রানি একলা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

ছোট্ট মেয়ে। কেন যে দাদু তার চলে গেল কিছু বুঝতে পারলে না।

কেন যে গেল, কি কষ্টে যে গেল, তা একমাত্র তার দাদুই জানলে আর জানলেন অন্তর্যামী।

রানির কাছে ফিরে যাবার জন্যে, আর একটিবার তাকে দেখবার জন্যে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল। কিন্তু তবু কিছুতেই সে ফিরতে পারলে না। ফিরতে পারলে না এই ভেবে, সে সাক্ষাৎ অমঙ্গল, সংসারের কোন মানুষই শুধু তার জন্যে সুখী হয়নি। তার কাছে থাকলে হয়ত তার রানিরও কষ্টের আর অবধি থাকবে না। তার চেয়ে মূর্তিমান অভিশাপ যে, তার দূরে সরে যাওয়াই ভালো।

রানির স্থান রাজার বাড়িতে—ডাকাতের বাড়িতে নয়।

ডাকাতের মা

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আগে সে ছিল ডাকাতের বউ। সৌখীর বাপ মরে যাবার পর থেকে তার পরিচয় ডাকাতের মা বলে। ডাকাতের মায়ের ঘুম কি পাতলা না হলে চলে! রাতবিরেতে কখন দরজায় টোকা পড়বে তার কি ঠিক আছে! টকটক করে দু'টোকার শব্দ থেমে থেমে তিনবার হলে বুঝতে হবে দলের লোক টাকা দিতে এসেছে। তিনবারের পর আরও একবার হলে বুঝতে হবে যে, সৌখী নিজে বাড়ি ফিরল। ছেলের আবার কড়া হুকুম—'তখনই দরজা খুলবি না হুট করে! খবরদার! দশবার নিশ্বাস ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ অপেক্ষা করবি। তারপর দরজা খুলবি।' আরও কতরকমের টোকা মারবার রকমফের আছে। কতবার হয়েছে, কতবার বদলেছে। দুনিয়ায় বিশ্বাস করবে কাকে; পুলিশকে ঠেকানো যায়; কিন্তু দলের কারও মনে যখন পাপ ঢোকে তখন তাকে ঠেকানো হয় মুশকিল! দিনকালই পড়েছে অন্যরকম! সৌখীর বাপের মুখে শোনা যে, সেকালে দলের কে যেন জখম হয়ে ধরা পড়বার পর, নিজের হাতে নিজের জিভ কেটে ফেলেছিল—পাছে পুলিশের কাছে দলের সম্বন্ধে কিছু বলে

ফেলে সেই ভয়ে। আর আজকাল দেখো! সৌখী জেলে গিয়েছে আজ পাঁচ বছর; প্রথম দুবছর দলের লোক মাসে মাসে টাকা দিয়ে যেত; তিন বছর থেকে আর দেয় না। এ কি কখনো হতে পারত আগেকার কালে? ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্যের পাটই কি একেবারে উঠে গেল দুনিয়া থেকে? সৌখীর বাপ কতবার জেলে গিয়েছে; সৌখীরও তো এর আগে দুবার কয়েদ হয়েছে; কখনো তো দলের লোকে এর আগে এমন ব্যবহার করেনি। মাস না যেতেই হাতে টাকা এসে পৌঁছেছে—কখনো বা আগাম—তিন-চার মাসের একসঙ্গে। কিন্তু এবার দেখো তো কাণ্ড! একটা সংসার পয়সার অভাবে ভেসে গেল কি না তা একবার উঁকি মেরে দেখল না দলের লোক! আগের বউমার শরীরটা ছিল ভালো। সৌখীর এবারকার বউটা রোগা রোগা। তার উপর ছেলে হবার পর একেবারে ভেঙে গিয়েছে শরীর। সৌখী যখন এবার ধরা পড়ে, তখন বউমার ছেলে পেটে। হ্যাঁ, নাতিটার বয়স চার-পাঁচ বছর হল বইকি। কী কপাল নিয়ে এসেছিল। যার বাপের নামে চৌকিদার সাহেব কাঁপে, দারোগাসাহেব পর্যন্ত যার বাপকে তুইতোকারি করতে সাহস করেনি কোনোদিন, তারই কিনা দুবেলা ভাত জোটে না! হায় রে কপাল! এ বউমা যে খাটতে পারে না। ওই রোগা শরীর নিয়ে। আমি বুড়ো মানুষ কোনোরকমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুটো খইমুড়ি বেচে আসি। তা দিয়ে নিজের পেট চালানোই শক্ত। সাধে কি আর বউমাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হল! তা ছাড়া গয়লাবাড়ির মেয়ে। ঝি-চাকরের কাজও তো আমরা করতে পারি না। করলেই বা রাখত কে? সৌখীর মা-বউকে কি কেউ বিশ্বাস পায়! নইলে আমার কি ইচ্ছা করে না যে, বউ-নাতিকে নিয়ে ঘর করি! বেয়াইয়ের দুটো মোষ আছে। তবু বউ-নাতিটার পেটে একটু দুধ পড়ছে। ওদের শরীরে দরকার দুধের। আর বছরখানেক বাদেই তো সৌখী ছাড়া পাবে। তখন বউকে নিয়ে এসে রুপোর গয়না দিয়ে মুড়ে দেবে। দেখিয়ে দেব পাড়ার লোকেদের যে, সৌখীর মায়ের নাতি পথের ভিখিরি নয়। আসতে দাও না সৌখীকে! দলের ওই বদলোকগুলোকেও ঠাণ্ডা করতে হবে। আমি বলি, এসব একলষেঁড়ে লোকদের দলে না নিলেই হয়। ওরা কি ডাকাত নামের যুগ্যি! চোর, ছিঁচকে চোর! ওই যেটা টাকা দিতে আসত, সেটার চেহারা দেখেছ। তালপাতার সেপাই! থুতনির নিচে দুগাছা দাড়ি! কালিঝুলিই মাখো, আর মশালই হাতে নাও, ওই রোগাপটকাকে দেখে কেউ ভয় পাবে কস্মিনকালে?

ঘুম আর আসতে চায় না। রোজ রাতেই এই অবস্থা। মাথা পর্যন্ত কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে না নিলে তার কোনোকালেই ঘুম হয় না শীতের দিনে। একবার সৌখী কোথা থেকে রাত দুপুরে ফিরে এসে টোকার সাড়া না পেয়ে, কী মারই মেরেছিল মাকে! বলে দিয়েছিল যে ফের যদি কোনোদিন নাকমুখ ঢেকে শুতে দেখি, তা হলে খুন করে ফেলে দেব! বাপের ব্যাটা, তাই মেজাজ অমন কড়া। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুলেও একটা বকুনি দেবার লোক

পর্যন্ত নেই বাড়িতে, গেল পাঁচ বছরের মধ্যে! এ কি কম দুঃখের কথা!.....

ঘুমের অসুবিধা হলেও, ছেলের কথা মনে করে সে একদিনের জন্যও নাকমুখ ঢেকে শোয়নি পাঁচ বছরের মধ্যে।

বাইরে নোনা আতা গাছতলায় শুকনো পাতার উপর একটু খড়খড় শব্দ হল। গন্ধগোকুল কিংবা শিয়ালটিয়াল হবে বোধ হয়। কী খেতে যে এরা আসে বোঝা দায়.... বুড়ো হয়ে শীত বেড়েছে। আগে একখান কম্বলে কেমন দিব্যি চলে যেত। এ কম্বলখানা হয়েওছে অনেককালের পুরনো। এর আগেরবার সৌখী জেল থেকে এনেছিল। সে কি আজকের কথা!

কম্বলখানার বয়স কবছর হবে তার হিসাব করতে গিয়ে বাধা পড়ে। টকটক করে টোকা পড়ার মতো শব্দ যেন কানে এল। টিকটিকির ডাক বোধ হয়! হাতি পাকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে! টিকটিকিটা সুদ্ধ খুনসুড়ি আরম্ভ করেছে মজা দেখবার জন্য। করে নে।

টকটক করে আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল।

না। তাহলে টিকটিকি নাতো! আওয়াজটা খনখনে— টিনের কপাটের উপর টোকা মারবার শব্দ!

বুড়ি উঠে বসে। ঘর গরম রাখার জন্য সে আগুন করেছিল মেঝেতে, সেটা কখন নিভে গিয়েছে; কিন্তু তার ধোঁয়া ঘরের অন্ধকারকে আরও জমাট করে তুলেছে। এতদিনে কি তা হলে দলের হতভাগাগুলোর মনে পড়েছে সৌখীর মায়ের কথা?

আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল। আর সন্দেহ নেই! অনেকদিনের অনভ্যাসের পর এই সামান্য ব্যাপারটা বুড়ির মনের মধ্যে একটু উত্তেজনা এনেছে।

....তবু বলা যায় না।...... কে না কে....

সৌখীর মা আস্তে আস্তে উঠে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বন্ধ কপাটের ফাঁক দিয়ে বাইরের লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল।.... লোকটাও বোধ হয় কপাটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখবার চেষ্টা করছে। বাইরেও ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। বিড়ির গন্ধ নাকে আসছে। ....আবার টোকা পড়ল দুটো। এবার একেবারে কানের কাছে। এ টোকা পড়বার কথা ছিল না! অবাক কাণ্ড! তা হলে তো লোকটা টাকা দিতে আসেনি! পুলিশের লোকটোক নয়তো? টোকা মারবার নিয়মকানুনগুলো হয়তো ভালো জানে না!...। সৌখীর ছাড়া পাবার যে এখনও বহু দেরি!.... নিশ্চয়ই পুলিশের লোক! তবে তুমি যেই- হও, টাকা দিলে নিশ্চয়ই নিয়ে নেব; তারপর অন্য কথা। ....কথা বলতে হবে সাবধানে; দলের কারও নামধাম আবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে অজানতে।....

হঠাৎ মনে পড়ল, হুড়কো খুলবার আগে দশবার নিশ্বাস ফেলবার কথা।

মানসিক উত্তেজনায় নিশ্বাস পড়ছেই না তা গুণবে কী।.... বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি দশবার নিশ্বাস ফেলে নিয়মরক্ষা করে নিল।

'কে?'

দরজা খুলে সম্মুখে এক লম্বাচওড়া লোককে দেখে ডাকাতের মায়েরও গা ছমছম করে।

'ঘর যে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঢুকি কী করে?'

'কে, সৌখী। ওমা তুই। আমি ভাবি কে না কে।'

বুড়ি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে।....এ ছেলে বুড়ো হয়েও সেই একইরকম থেকে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে; বুক ফুলিয়ে পাড়া জাগিয়ে ঢুকতে পারত বাড়িতে অনায়াসে। কিন্তু দরজায় টোকা মেরে মার সঙ্গে খুনসুড়ি হচ্ছিল এতক্ষণ।.... এ আনন্দ তার রাখবার জায়গা নেই।....

'লাটসাহেব জেল দেখতে গিয়েছিল। আমার কাজ দেখে খুশি হয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম দিল। খুশি আর কী। হেড জমাদারসাহেবকে টাকা খাইয়েছিলুম। সে-ই সুপারিশ করে দিয়েছিল জেলারবাবুর কাছে। তাই বেশি রেমিশন পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, তুই কুপিটা জ্বাল তো আগে। তারপর সব কথা হবে।'

দরকারের চাইতেও জোরে কথাগুলো বলল সৌখী, যাতে ঘরের অন্য সকলেও শুনতে পায়। তারপর মাকে কেরোসিন তেলের টেমিটাকে খুঁজতে সাহায্য করবার জন্য দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তুলে ধরে।

বুড়ি এতক্ষণে আলোতে মুখ দেখতে পেল ছেলের। চুলে বেশ পাক ধরেছে এবার; তাই বাপের মুখের আদল ধরা পড়ছে ছেলের মুখে। রোগারোগা লাগছে যেন। সৌখীটার তো বাপেরই মতো জেলে গেলে শরীর ভালো হয়। তবে এবার এমন কেন? ছেলের চোখের চাউনি ঘরের দূর দেওয়াল পর্যন্ত কী যেন

খুঁজছে। কাদের খুঁজছে সেকথা আর বুড়িকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে না।...

'হ্যাঁ রে, জেলে তোর অসুখবিসুখ করেছিল নাকি?

সৌখী এ প্রশ্ন কানে তুলতে চায় না। জিজ্ঞাসা করে, 'এদের কাউকে দেখছি না?'

প্রতি মুহূর্তে বুড়ি এই প্রশ্নের ভয়ই করছিল। জানা কথা যে, জিজ্ঞাসা করবেই;.......তবু.........

'বউ বাপের বাড়ি গিয়েছে।'

'হঠাৎ বাপের বাড়ি?'

...এতদিন পর বাড়ি ফিরেচে ছেলে; এখনই সব কথা খুলে বলে তার মেজাজ খারাপ করে দিতে চায় না। মরদের রাগ। শুনেই এখনই হয়তো ছুটবে রাগের মাথায় দলের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।...নাতি আর বউয়ের শরীর খারাপের কথাও এখনই বলে কাজ নেই। ছেলে ছেলে করে মরে সৌখী। আগের বউটার ছেলেপুলে হয়ইনি। এ বউয়ের ওই একটিই তো টিমটিম করছে। তার শরীর খারাপের কথা শুনলে হয়তো সৌখী এখানে আর একদিনও থাকবে না। এতদিন পর এল। একদিনও কাছে রাখতে পারব না? খেয়েদেয়ে জিরিয়ে সুস্থির হয়ে থাকুক এক-আধদিন। তারপর সব কথা আস্তে আস্তে বলা যাবে।....

'কেন, মেয়েদের কি মা-বাপকে দেখতে ইচ্ছে করে না একবারও?'

'না না, তাই কি বলছি নাকি,' অপ্রতিভের চেয়ে হতাশ হয়েছে বেশি সৌখী। তার বাড়ি ফিরবার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ছেলেটা কেমন দেখতে হয়েছে, তাই নিয়ে কত কল্পনার ছবি এঁকেছে জেলে বসে বসে। ছেলে কেমন করে গল্প করে মায়ের সঙ্গে তাই শুনবার জন্য টৌকা মারবার আগে দরজায় কান ঠেকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল রাত নটার মধ্যে দুরন্ত ছেলেটা নিশ্চয়ই ঘুমোবে না। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে.....কালই সে যাবে শ্বশুড়বাড়ি বউছেলেকে নিয়ে আসতে। একথা এখনই মাকে বলে ফেলা ভালো দেখায় না; নইলে মা আবার ভাববে যে নতুন বউ এসে ছেলেকে পর করে নিয়েছে।.... মা কত কী বলে চলেছে; এতক্ষণে শেষের কথাটা কানে গেল।

'নে হাতমুখ ধুয়ে নে।'

'না না। আমি খেয়ে এসেছি। এই রাতকরে আর তোকে রাঁধতে বসতে হবে না।'

'না, রাঁধছে কে। খইমুড়ি আছে। খেয়ে নে। তুই যে কত খেয়ে এসেছিস, সে আর আমি জানি না।'

ব্যবসার পুঁজি খইমুড়িগুলো শেষ করে শোয়ার সময় তার হঠাৎ নজর গেল মার গায়ের ছেঁড়া কম্বলখানার দিকে।

'ওখানে আমাকে দে।'

আপত্তি ঠেলে সৌখী নিজের গায়ের নতুন কম্বলখানা মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিল।

নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েও বুড়ির ঘুম আর আসতে চায় না। পা কিছুতেই গরম হয় না, রাজ্যের দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে। সৌকীর নাকডাকানির

একঘেয়ে শব্দ কানে আসছে। এতদিন পর ছেলে বাড়ি এল; কোথায় নিশ্চিন্ত হবে, তা নয়, সৌখীকে কী খেতে দেবে কাল সকালে, সেই হয়েছে বুড়ির মস্ত ভাবনা। আজকের রাতটা না হয় বিক্রির খইমুড়ি দিয়ে কোনোরকম চলে গেল।..... যদি বলত দুটো ভাত খেতে ইচ্ছা করছে, তা হলেই আর উপায় ছিল না, সব কথা না বলে।.... আলুচচ্চড়ি খেতে কী ভালোই বাসে সৌখীটা! কতকাল হয়তো জেলে খেতে পায়নি। আলু, চাল, সরষের তেল সবই কিনতে হবে। অত পয়সা পাব কোথায়? ভোরে উঠেই কি ছেলেকে বলা যায় যে, আগে পয়সা জোগাড় করে আন, তবে রেঁধে দেব!....

......কাছারির ঘড়িতে দুটো বাজল।.... ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

মনে পড়ল যে, পেশকারসাহেবের বাড়ি রাজমিস্ত্রি লেগেছে। আজ যখন মুড়ি বেচতে গিয়েছিল তখন দেখেছে যে, পড়ে-যাওয়া উত্তরের পাঁচিলটা গাঁথা হচ্ছে। বুড়ি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে বেরোল ঘর থেকে।

মাতাদীন পেশকারের বাড়ি বেশি দূরে নয়। পাঁচিল সেদিন হাত দুই-আড়াই উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে। মাটি আর রাঙা ইটের পাহাড় নীচে পড়ে থাকায়, সে পাঁচিল ভাঙতে বুড়ির বিশেষ অসুবিধা হল না।....বাড়ি নিশুতি!...

অন্ধকারে কী কোথায় আছে ঠাহর করা শক্ত। বারান্দায় দোরগড়ায় গুছিয়ে রাখা রয়েছে পেশকারসাহেবের খড়মজোড়া, আর জল-ভরা ঘটি—ভোরে উঠেই দরকার লাগবে বলে। ভয়ে বুড়ি উঠোনের আর কোথায় কী আছে, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজবার চেষ্টা করল না। ঘটিটি তুলে নিয়ে পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। জলটুকু পর্যন্ত ফেলেনি।...এখন রাতদুপুরে লোটা হাতে যেতে দেখলেও কেউ সন্দেহ করবে না।

এদেশে লোটা বিনা সংসার অচল। দিনে বারকয়েক লোটা না মাজলে মাতাদীন পেশকারের হাত নিশপিশ করে। সেইজন্য হুলস্থূল পড়ে গেল তাঁর বাড়িতে সকালবেলায়।

খোকার মা নাকে কেঁদে স্বামীকে মনে করিয়ে দিলেন যে, লোটা হল বাড়ির লক্ষ্মী;...এখনই আর একটি কিনে আনা দরকার বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনতে হলে। কর্তার মেজাজ তখন তিরিক্ষি হয়ে আছে চোরের উপর রাগে।—'বাজে বকবক করো না। তোমাদের তো কেবল এই! আইনের ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, চুরির খবর পুলিশকে না দিলে জেল পর্যন্ত হতে পারে; সে খবর রাখো?'

আইনচঞ্চু মাতাদীন আরও অনেক ঝাঁঝালো কথা খোকার মাকে শোনাতে শোনাতে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেলেন থানায় খবর দেবার জন্য।

ফিরতিমুখো তিনি এলেন বাসনের দোকানে। নানারকম ঘটি দেখাল দোকানদার; কিন্তু পছন্দসই কিছুতেই পাওয়া যায় না। পেশকারসাহেব বড় খুঁতখুঁতে লোটা সম্বন্ধে। তিনি চান খুরো দেওয়া লোটা—বুঝলে কিনা—এই

এত বড় সাইজের—মুখ হওয়া চাই বেশ ফাঁদালো—যাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মেয়েমানুষের এতখানি কাঁকনসুদ্ধ হাত অনায়াসে ঢোকানো যায়, ভিতরটা মাজবার জন্য।...দোকানদার শেষকালে হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে— 'পুরনো হলে চলবে? নামেই পুরনো। সস্তায় পাবেন। আড়াই টাকায়।'

'পুরনো বাসনও বিক্রি হয় নাকি এখানে? দেখি।'

ঘটি দেখেই তাঁর খটকা লাগল। পকেট থেকে চশমা জোড়া বার করে নাকের ডগায় বসালেন।....খুরোর নীচে ঠিক সেই তারা আঁকা! আর সন্দেহ নেই!...

মাতাদীন পেশকার আইনের ধারা ভুলে গিয়ে দোকানদারের টুঁটি চেপে ধরেন।—'বল! এ লোটা কোত্থেকে পেলি? দিনে করিস দোকানদারি—আর রাতে বার হস সিঁধকাঠি নিয়ে!'

একেবারে হইহই রইরই কাণ্ড। দোকানে লোক জড়ো হয়ে গেল। দোকানদার বলে যে, সে কিনেছে এই ঘটি নগদ চোদ্দো আনা পয়সা গুণে, সৌখীর মায়ের কাছ থেকে—এই কিছুক্ষণমাত্র আগে।

'চোদ্দো আনায় এই ঘটি পাওয়া যায়? চোরাই মাল জেনেই কিনেছিস। চোরাই মাল রাখবার ফৌজদারি ধারা জানিস?'

পেশকারসাহেব থানায় পাঠিয়ে দিলেন একজন ছোকরাকে, দারোগাকে ডেকে আনবার জন্য। চোর ধরা পড়বার পর দারোগাসাহেবের কাজে আর ঢিলেমি নেই। তখনই সাইকেলে এসে হাজির। সব ব্যাপার শুনে তিনি সদলবলে সৌখীর বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠলেন। সৌখীর মা আলুর তরকারি চড়িয়েছে উনোনে। ছেলে তখনও ওঠেনি বিছানা ছেড়ে। অনেককাল জেলে ঘড়ি ধরে সকাল সকাল উঠতে হয়েছে; নতুন-পাওয়া স্বাধীনতা উপভোগ করবার জন্য সৌখী মনে মনে ঠিক করেছে যে বেলা বারোটার আগে যে কিছুতেই আজ বিছানা ছেড়ে উঠবে না।

দারোগা পুলিশ দেখে বুড়ির বুক কেঁপে ওঠে। পুলিশ দেখে ভয় পাবার লোক সে নয়; এর আগে কতবার সময়ে অসময়ে পুলিশকে তাদের বাড়িতে হানা দিতে দেখেছে। কিন্তু আজ যে ব্যাপার অন্য! মাতাদীন পেশকার আর বাসনওয়ালা যে পুলিশের সঙ্গে রয়েছে! তার যে ধারণা ছিল, বাসনওয়ালারা পুরনো বাসনগুলোকে রংচং দিয়ে নতুনের মতো না করে নিয়ে বিক্রি করে না...পাঁচ-সাত বছর আগে পুলিশ একবার ভোররাত্রে তাদের বাড়ি ঘেরাও করেছিল, বন্দুকের খোঁজে। তখন তো মাথা হেট হয়নি তার। ডাকাতি করা তাঁর স্বামী-পুত্রের হকের পেশা। সে তো মরদের কাজ; গর্বের জিনিস। জেলে যাওয়া সেক্ষেত্রে দুরদৃষ্ট মাত্র—তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু এ যে চুরি!....ছিচকে চোরের কাজ, শেষকালে....

লজ্জায় সৌখীর মা অভিযোগ অস্বীকার করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে!

দারোগাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন তাকে, 'তু এই লোটা আজ বাজারের

বাসনের দোকানে চোদ্দো আনায় বিক্রি করেছিস?'

কোনো জবাব বেরোল না বুড়ির মুখ দিয়ে। শুধু একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে সে মাথা হেঁট করে নিল।

এতক্ষণে বোঝে সৌখী ব্যাপারটা। চোদ্দো আনা পয়সার জন্য মা শেষকালে একটা ঘটি চুরি করল!....কেন মা তাকে বলল না!...এতদিন তার ডিউটি ছিল জেলখানার গুদামে। জেলের ঠিকাদারদের কাছ থেকে সে নব্বই টাকা রোজগার করে এনেছে। এখনও সে টাকা তার কোমরের বাটুয়ায় রয়েচে। মা তার কাছ থেকে চেয়ে নিল না কেন? মেয়েমানুষের আর কত আক্কেল হবে! হয়তো ঘরদোরের দিকে তাকিয়ে এক নজরেই সংসারের দৈন্যদশার কথা আঁচ করে নেওয়া উচিত ছিল তার।...বুঝে, নিজে থেকেই মায়ের হাতে টাকা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে সময় পেল কই? রাতে এসে শুয়েছে; এতক্ষণ তো বিছানা ছেড়ে ওঠেইনি।....শেষ পর্যন্ত লোটা চুরি! জেলের মধ্যে ওইসব ছিঁচকে 'কদুচোর'দের সঙ্গে সে যে পারতপক্ষে কথা বলেনি কোনোদিন!...ডাকাতরা জেলে আলাপসালাপ করে 'লাইফার'দের সঙ্গে, সেকথা তো মায়ের অজানা নয়। 'কদুচোর'দের যে মাত্র দুমাস তিন মাসের সাজা হয়। .....মা কি জানে না যে...

'এই বুড়ি! আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? বল। জবাব দে।'

বুড়ি নির্বাক। দারোগাবাবুর প্রশ্ন কানে গেল কি না, সে কথা বোঝাও যায় না তার মুখ দেখে।

আর থাকতে পারলনা সৌখী।

'দারোগাসাহেব, মেয়েমানুষকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? আমি ঘটি চুরি করেছি কাল রাত্রে?

বিজ্ঞ দারোগাবাবু তাঁর অনুচরদের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টি হেসে ভাব দেখাতে চাইলেন যে, এত বেলা পর্যন্ত সৌখীকে ঘুমোতে দেখে, এ তিনি আগেই বুঝেছিলেন; শুধু বুড়ির মুখ দিয়ে কথাটা বার করে নিতে চাচ্ছিলেন এতক্ষণ।

এইবার সৌখীর মা ভেঙে পড়ল।...ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে।...

'না না দারোগাসাহেব! সৌখী করেনি, আমি করেছি। ওকে গ্রেপ্তার করবেন না। আমাকে করুন। ও কিছু জানে না। ও যে ঘুমুচ্ছিল। ওকে ছেড়ে দিন দারোগাসাহেব। এখনও যে বউ-ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর!....'

দারোগাবাবুর পায়ের উপর মাথা কুটছে বুড়ি।

কিন্তু তিনি বাসনওয়ালা কিংবা বুড়িটাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না; তাঁর দরকার আসল অপরাধীকে নিয়ে।

সৌখী যাবার সময় কোমর থেকে বাটুয়াটা বার করে রেখে দিয়ে গেল খাটিয়ার উপর।

মা তখন মেঝেতে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উনোনে চড়ানো আলুর তরকারির পোড়া গন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ডাকাত বাবা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছে সারদা। যাচ্ছে পদব্রজে। সঙ্গে ভূষণ মণ্ডলের মা ও আরও বর্ষীয়সী মহিলা। আর যাচ্ছে লক্ষ্মী, আর তার ভাই শিবরাম।

কামারপুকুর থেকে আরামবাগ—আট মাইলের ধাক্কা। আরামবাগ পেরিয়েই তেলোভেলোর মাঠ। সে মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বর। তারপরে আবার আর এক মাঠ—কৈকলার মাঠ। কৈকলার মাঠ পেরিয়ে বৈদ্যবাটি। বৈদ্যবাটি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বর।

তেলোভেলো আর কৈকলা এই দু'মাঠে ডাকাতের আস্তানা। আর ওই মাঠ ছাড়াও পথ নেই। পথচারীদের উপর কখন যে হামলা হবে তা ডাকাত-কালীই বলতে পারেন। তেলো আর ভেলো, পাশাপাশি দুই গ্রাম, মাঝখানের মাঠে এক ভীমদর্শনা করালবদনা কালীমূর্তি। ডাকাতে-কালী। দস্যুদের আরাধনীয় ধান্যদা। ধনদায়িনী ডাকনামে তলোভেলোর ডাকাত কালী। ভূতপ্রমথসেবিকা ঘোরচণ্ডী। রণরামা।

শুধু লুণ্ঠন নয়, চক্ষের পলকে খুন করে ফেলা, লাশ লোপাট করে দেওয়া। যাকে বলে গায়েবি খুন। ডাকাতের সে লাঠি বজ্রের চেয়েও নৃশংস। টাকাকড়ি যা আছে খুলে দিচ্ছি ঝুলি ঝেড়ে—এটুকু প্রস্তুত হবারও সময় দেয় না। আগে লাঠি, শেষে লুঠ। কাড়ো আর মারো নয়, মারো আর কাড়ো। এর থেকে একমাত্র উপায় হচ্ছে দল পাকিয়ে পথ হাঁটা। দল দেখে ডাকাতেরা যদি ভয় পায়। দল থাকলে পথচারীদের অন্তত সাহস বাড়ে।

সন্ধ্যের বেশ আগেই পৌঁচেছে আরামবাগ। চলতে চলতে সারদার পা দু'খানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাতটা আরামবাগে কোথাও বিশ্রাম করলে হয়! কিন্তু সঙ্গীরা নারাজ। তারা বলে—আঁধার লাগবার আগেই বেলাবেলি তেলোভেলোর মাঠ পেরিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখনও দিব্যি দিন আছে, সহজেই পেরিয়ে যেতে পারব। মিছিমিছি এক রাত নষ্ট করি কেন?

পথক্লান্তির কথা কাউকেও বললে না সারদা। তোমরা যখন চলেছ, আমিও চলি তোমাদের পিছে পিছে।

কেবলই পিছিয়ে পড়ছে থেকে থেকে। পা টেনে টেনে তবু চলে এসেছে চার মাইল। কিন্তু তার সঙ্গীরা কোথায়? সঙ্গীরা থেমে পড়ছে বারে বারে। থেমে পড়ছে যাতে পা চালিয়ে এসে সারদা তাদের সঙ্গ ধরতে পারে। কিছুতেই তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না মেয়েটা।

'কাঁহাতক তোমার জন্যে এমনি করে দাঁড়াই বলো তো!' বিরক্তি জানায় সঙ্গীরা, 'বেলা ঢলে পড়ল, এখন একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

সাধ্যমতো পদক্ষেপ দ্রুত করে সারদা। কিন্তু তার সাধ্য কী, সঙ্গীদের সঙ্গে তাল রাখে। আবার সে পিছিয়ে পড়েছে। বিশ-পঁচিশ হাত নয়, প্রায় সিকি মাইল।

'এমনি করে চললে কী করে চলবে?' আবার ধমকে ওঠে সঙ্গীরা, 'তোমার জন্যে কি সবাই শেষকালে ডাকাতের হাতে মারা পড়ব? পশ্চিমের আকাশখানা একবার দেখছ?'

সন্ধ্যার শেষ লালিমাটুকু মিলিয়ে যায় বুঝি।

সত্যিই তো! তার একলার অক্ষমতার জন্যে সবাই কেন বিপন্ন হবে? ওদের দেহে যখন শক্তি আছে তখন ওরা যাবেই তো আগ বাড়িয়ে। নিজের সুবিধের জন্যে ওদের সে অসুবিধে ঘটাবে কেন?

'তোমরা আমার জন্যে দাঁড়িয়ো না—চলে যাও সোজাসুজি।' সঙ্গশূন্যতার ভয়ে এতটুকু কাতর নয় সারদা, নেই এতটুকু অসহায়তার সুর। বললে, 'একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে গিয়ে উঠো। আমি সেখানে গিয়েই ধরব তোমাদের। আমার শরীর আর বইছে না—আমি যাচ্ছি আস্তে আস্তে।

'যত শিগগির পারিস বেরিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। চারদিক আঁধার হয়ে এল। মাঠের বড় দুর্নাম—'

পিছনে.ফিরে তাকিয়েও দেখল না। সারদাকে ফেলেই দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল সঙ্গীরা। মিলিয়ে গেল চোখের বাইরে। জনমনুষ্যহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সারদা একা। শরীরে আর দিচ্ছে না, তবু কষ্টে পা টেনে টেনে চলেছে, অন্ধকারে পথঘাটের ইশারা পাচ্ছে না। কোথায় যেতে কোথায় চলে আসছে কে জানে।

'কে যায়!' কে একজন বাঘের গলায় হুমকে উঠল।

প্রকাণ্ড একটা কালো লোক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দৈত্যের মতন চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে রুপোর বালা, কাঁধে মস্ত লাঠি।

'কে যায়!'

'তোমার মেয়ে গো—সারদা।' নির্জন মাঠের মধ্যে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, আমার মেয়ে! লোকটার কানে কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল। এত বছর ধরে ডাকাতি করছি, কই, এমন কথা তো কখনো শুনিনি! সারদার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ডাকাত। স্থির প্রতিমার মতোই দাঁড়িয়ে রইল সারদা। প্রতিমার মতোই স্থির নেত্রে।

'কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'বাবা, দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলাম। চলতে পারছিলাম না, তাই আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছ কেন?'

'দক্ষিণেশ্বরে যে তোমার জামাই থাকে। রাণি রাসমণির কালীবাড়ি আছে না? সেই কালীবাড়িতে তিনি থাকেন। তাঁর কাছেই আমি যাচ্ছি।'

কেমন যেন মধুময় লাগল কণ্ঠস্বর। বাগদি ডাকাতের বুকের ভিতরটা আনচান করে উঠল। শুধু ডাকাতের নয়, সেই কণ্ঠস্বরের আমেজ এসে গেল যেন আরও একজনের কানে। কাছেই কোথায় ছিল, ছুটে এল সে ব্যাকুল পায়ে। সারদা তো অবাক, এ যে দেখি স্ত্রীলোক। দেখেই বুঝল, বাগদি ডাকাতের স্ত্রী।

তার হাত দু'খানা চেপে ধরল সারদা। যেন অকূলে কূল পেল।

'তুমি কে গা?' ডাকাত-পত্নীর চোখে স্নেহকরুণ জিজ্ঞাসা।

'তোমার মেয়ে সারদা। চিনতে পাচ্ছ না। যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বরে, তোমার জামাইয়ের কাছে। সঙ্গীরা পিছে ফেলে আগে আগে পালিয়ে গিয়েছে। ফাঁকা নির্জন মাঠে অন্ধকারের মধ্যে কী বিপদেই পড়েছিলুম, মা। তোমাদের পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। তোমাদের না পেলে কী সর্বনাশ যে হত কে জানে।'

প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কঠিন পাথর ফেটে বেরুল সুধাধারা। দয়াহীন মরুভূমির আকাশে নম্র মেঘের মাধুর্য।

'মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়েছে যেন গো। কিছু ওকে খেতে দাও আগে।' ডাকাত-বউ বললে ডাকাতকে।

'না, আমি এগোই। তারকেশ্বরে গিয়ে ধরব আমার সঙ্গীদের।'

'অসম্ভব, পথের মাঝেই পড়বে টাল খেয়ে। বাপ হয়ে মেয়েকে কেউ পাঠাতে পারে না এ বিপদের মুখে। এ ঘোর অন্ধকারে, জনশূন্য মাঠের মধ্যে দিয়ে। তার শরীরের এ অবসন্ন অবস্থায়। তার চেয়ে চলো, কাছে পিঠে যে দোকান আছে, সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। রাত ফুরুলে খোঁজা যাবে ফের পথের নিশানা। তোমার সঙ্গীদের উদ্দেশে।'

তেলোভেলোর ছোট একটি মুদিদোকান। সেখানেই নিয়ে গেল সারদাকে। নিজের হাতে শয্যা রচনা করল ডাকাত-বউ। ডাকাত নিজে গিয়ে মুড়িমুড়কি কিনে আনল। বাপের দেওয়া খাবার তৃপ্তি করে খেল সারদা। মায়ের করা বিছানায় শুলে আরাম করে। ছোট মেয়েকে মা যেমন করে ঘুম পাড়ায় তেমনি করে ডাকাত-বউ ঘুম পাড়াল সারদাকে। আর সারারাত লাঠি হাতে দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে রইল ডাকাত-বাবা।

কোথায় সবকিছু লুটপাট করে, চাই কী গুম খুন করে ফেলবে—তা নয়, নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি দুয়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে!

উপায় কী! এ যে তার মেয়ে! যে মেয়ে সে-ই আবার মা!

ভোরে ঘুম ভাঙতেই মেয়েকে নিয়ে এগোল তারকেশ্বরের পথে। খেতে কড়াই-শুঁটি ফলেছে। তাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে ডাকাত বউ দিতে লাগল সারদাকে। বললে, 'তোর খিদে পেয়েছে খা।' মুখ ধোয়া হয়নি, তবু ছোট মেয়ের মতো তাই খেতে লাগল সারদা। স্বাদে অপূর্ব মাতৃস্নেহ। চার দণ্ড বেলা হয়েছে, পৌঁছুল তারকেশ্বর।

'আমার মেয়ে কাল সারারাত কিছু খায়নি। যাও শিগগির, শিগগির বাবাকে পুজো দিয়ে বাজার করে নিয়ে এসো। মাছ-তরকারি দিয়ে মেয়েকে ভালো করে

খাওয়াতে হবে।' ডাকাত-বউ তাগিদ দিল স্বামীকে।

বাগদি ডাকাত বাজার করতে ছুটল। তার মেয়ে শ্বশুরঘরে যাচ্ছে। যাবার আগে বাপের বাড়িতে আজ তার শেষ খাওয়া।

সঙ্গীদের সন্ধান পেল সারদা। 'ওমা, তুই বেঁচে আছিস? আসতে পেরেছিস পথ চিনে? কোথায় ছিলি তুই সারারাত?'

'বাবা-মার কাছে ছিলাম। ছিলাম নির্ভয়ের আশ্রমে, নিশ্চিন্তের ক্রোড়নীড়ে। বাৎসল্যরসের সরসীতে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়ের পালা এল। যাত্রীদল এবার বৈদ্যবাটির পথ ধরবে। বাগদি বাপ-মা কাঁদতে লাগল অঝোরে। মেয়ে সারদাও নিজেকে সামলাতে পারল না। সেও কান্নায় ভেঙে পড়ল। এক রাতের পরিচয়ে এক জন্মের সম্পর্ক। কণ্ঠের একটু মাতৃ সম্বোধনেই অনন্ত জীবনের বন্ধন। এমন মেয়ের বিচ্ছেদ সয়ে কী করে বাঁচবে তারা? কাঁদতে কাঁদতে অনেক দূর পর্যন্ত এগোল বাগদি-বাগদিনি। বাগদিনি কড়াইশুঁটি ছিঁড়ে মেয়ের আঁচলে বেঁধে দিল যত্ন করে। বললে, 'মা সারু, রাতে যখন মুড়ি খাবি, তখন এগুলো দিয়ে খাস।' বললে বলতে নিজের আঁচল চেপে চেপে ধরল।

বাগদি বললে, 'যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী না সঙ্গে থাকত, সোজা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। দেখে আসতাম জামাইকে।'

'কিন্তু বলো দক্ষিণেশ্বরে তুমি যাবে।' সারদা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। রাজি করাল ডাকাত বাবাকে। মাঝে মাঝে গিয়ে মেয়েকে না দেখে এসে কি সে থাকতে পারবে? মা কি মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে না তার নিজের হাতে গড়া মোয়ানাড়ু?

পথ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডানদিকের রাস্তায় বাবা আর মা চলে গেল, সারদা আর সঙ্গীরা চলল বাঁদিকে। যতদূর দেখা যায় বাবা আর মা ফিরে ফিরে তাকায় আর কাঁদে। সারদাও থেকে থেকে তাকায় পিছন ফিরে আর আঁচলে চোখ মোছে। ডাকাতের ছদ্মবেশে কে এরা বাগদি-বাগদিনি?

'জানিস আমরা কী দেখলুম?' গাঁয়ে ফিরে এসে বলতে লাগল বাগদি দম্পতি। 'দেখলুম, স্বয়ং কালী এসে দাঁড়িয়েছেন। যে কালীর পুজো করি সেই কালী।'

'বলো কী গো? দেখলে? ঠিক তাই দেখলে!'

'সত্যিসত্যিই দেখলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখি এমন সাধ্য কী। আমরা যে পাপী। আমরা পাপী বলে সে রূপ গোপন করে ফেললে। সারাক্ষণ দেখতে দিলে না।'

চকিতে যখন একবার দেখেছ তখন পলকেই পাপ চলে গিয়েছে। চকিতের দেখাই অনন্তকালের দেখা। যা চকিত তাই চিরকালিক।

রামলাল ডাকাত

সুমথনাথ ঘোষ
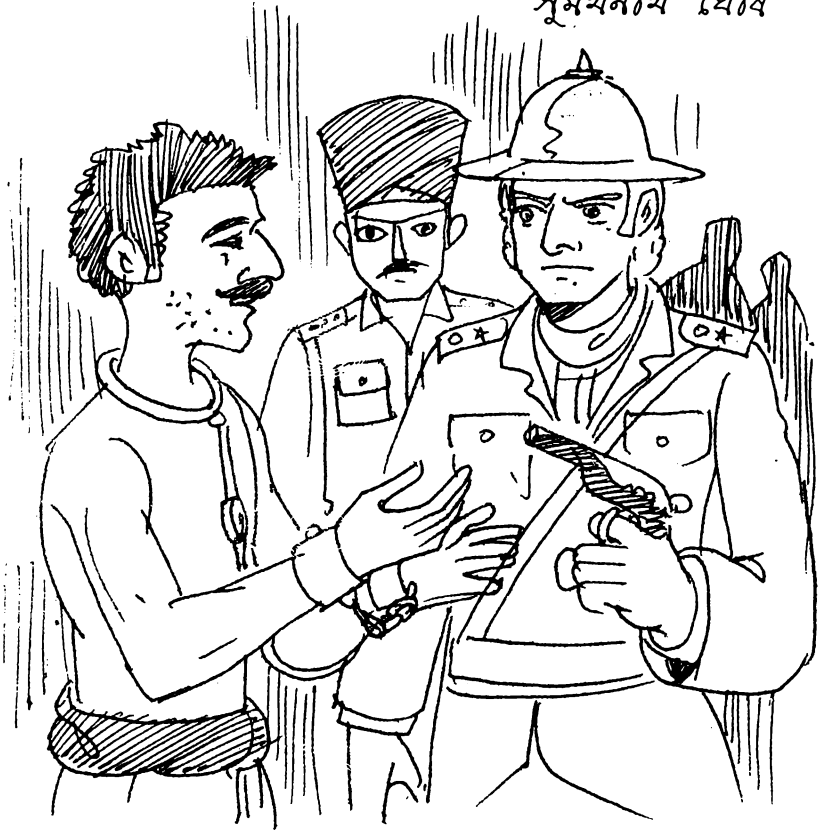
সেদিন চম্বলের কুখ্যাত দস্যুসর্দার, যাকে ধরার জন্যে পাঁচ বছর ধরে সারা ভারত তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে যত গোয়েন্দা ও পুলিশবাহিনী, যার মস্তকের মূল্য সরকার থেকে ঘোষিত হয়ে বাড়তে বাড়তে ক্রমশ পঞ্চাশ হাজারে উঠেছিল, হঠাৎ সে ধরা পড়েছে আমাদের এই কলকাতায় মানিকতলার এক বস্তির কুঁড়ে ঘরে, সকালবেলা খাটিয়ায় বসে স্ত্রী ও শিশু পুত্রকন্যার সঙ্গে যখন আলাপরত—সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে পরদিন এ খবরটা পড়ে সর্বপ্রথম যার কথাটা মনে হলো তার নাম কোথাও খুঁজে না পেয়ে বিস্মিত হলুম।

সারা ভারতের ত্রাস-স্বরূপ। যেই দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর জল্লাদকে ধরলে, সে দুঃসাহসিক বীরপুরুষটি সে কে? কি নাম তার? কেন বড় বড় হরফে ছাপা হয় নি তার কথা? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পঞ্চাশ বছর আগে, আমার শৈশবে ফিরে যাই।

মনে পড়ে গেল, যখন মায়ের কোলে দুধ খেতে চাইতুম না, মা ভাত খাওয়াতে গেলে পেট ভরে গেছে, আর খাব না বললে, সাধারণত মায়েরা

যেমন জুজুর ভয় দেখিয়ে বা ভূত পেতনী বেহ্মদৈত্যের কথা ভয়ার্তকণ্ঠে বলে, 'শিগগির খেয়ে নাও, নইলে এক্ষুনি ডাকবো জুজুকে'—'এই জুজু আয় তো' কিংবা 'আয়তো ভূত, খোকাকে নিয়ে যা তো, খোকা খেতে চাইছে না' বলে ভয় দেখিয়ে খাওয়ায়। আমার মাকে কিন্তু ওসব বলতে শুনিনি 'খাব না' বলে মুখ ঘোরালে তিনি চোখ দুটো বড় বড় করে বলতেন, 'ওই রামলাল ডাকাত আসছে, শিগগির খেয়ে নাও!' ব্যস আর দ্বিতীয়বার বলতে হতো না, ভয়ে সারা দেহ কাঁটা হয়ে উঠত এবং নিমিষে খাদ্যবস্তুও যথাস্থানে প্রস্থান করত। ভূত-প্রেতের চেয়ে ওই রামলাল ডাকাতকে কেবল শিশুরা নয়, তাদের মা বাবা এমনকি গাঁয়ের বৃদ্ধবৃদ্ধারা পর্যন্ত সে নাম শুনলে যেন আতঙ্কে শিউরে উঠতেন। যখন ছোট ছিলুম, কিছু বুঝতাম না। শুধু ওই নামটা শুনলেই বুকের মধ্যেটা দুরদুর করে কাঁপত। ভূত-প্রেত, শাঁকচুন্নীর চেয়েও আরও ভয়ঙ্কর মনে হতো।

বড় হতে দেখি ওই রামলাল ডাকাতের ভয়টা কেবল আমাদের নয়, গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা, সবাইয়ের কাছে সে একটা দারুণ আতঙ্ক। সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ।

দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল এই রামলাল। তার নামে নাকি 'বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়'; এমনি কথা লোকের মুখে মুখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। খুন, রাহাজানি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুটপাট করতে তার জুড়ি ছিল না।

তখন বৃটিশ আমল। ইংরেজের রক্তচক্ষুকে সে থোড়াই কেয়ার করত। পুলিশ অফিসাররা পর্যন্ত তার ভয়ে কাঁপত। কখন কোথা থেকে, কোন ছদ্মপেশে কার কাঁচামাথাটা দেহ থেকে ছিঁড়ে নেবে কেউ জানত না।

সত্যমিথ্যায় মিলিয়ে অসম্ভব-অসম্ভব কত যে কাহিনী কত লোকের মুখে শুনেছি তার ঠিক নেই।

মা, বাবা, ঠাকুমা এবং গাঁয়ের কত লোককে জিজ্ঞেস করেছি কী রকম তাকে দেখতে, কেমন চেহারা?

কিন্তু কেউই সঠিক উত্তর দিতে পারে নি। কেউ বলে, ইয়া লম্বা চওড়া বিরাট দৈত্যের মতো দেখতে। কেউ বা বলে অন্যরকম। মোট কথা একজনের সঙ্গে আর একজনের বর্ণনার মিল কখনই হয় না। কল্পনার রং লাগিয়ে ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্করতর করে তুলত তারা।

গোরা পুলিশ সারা গাঁকে ঘিরে ফেলে প্রত্যেকটি ঘরে অনুসন্ধান করেও নাকি ধরতে পারে না। তাদের চোখের সামনে দিয়ে কখনও বুড়ি ভিখিরীর বেশে, লাঠিতে ভর দিয়ে কোমর ভেঙে ভিক্ষে করতে করতে পালিয়ে যায়। কখনো বা পুলিশেরই ছদ্মবেশে লাল পাগড়ি এঁটে, ঠিক ওদেরই মতো পোশাক পরে অনুসন্ধানকারীদের দলে ভিড়ে গিয়ে রাত্রের অন্ধকারে, বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরে পড়ে। একধিকবার হত্যার অভিযোগে রামলালের মাথার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল, তখন হঠাৎ একদিন সারা

গাঁয়ের লোক আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

রামলাল ডাকাত নাকি ধরা পড়েছে। তার বিচার হবে ডায়মণ্ডহারবার কোর্টে আগামী সোমবার।

পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ের ছেলেবুড়ো ছুটল আদালতে। বিচারে যে তার ফাঁসি হবে এটা সবাই জানত। কিন্তু তবু যে সবাই ছুটছিল তার ওই একটাই কারণ। সাতখানা গাঁয়ের আতঙ্ক যে মানুষটা, বৃটিশ সরকারের সুদক্ষ গোয়েন্দা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন খুন, জখম, হত্যা, লুঠতরাজ ইচ্ছামত চালিয়েছে, তাকে দেখতে কেমন এটাই ছিল সকলের কৌতূহল।

বলাবাহুল্য, আমিও সেই কৌতূহল বুকে নিয়ে বাবার সঙ্গে ভোরে উঠে, দু'ক্রোশ পথ হেঁটে আদালতে ঢুকে দর্শকের আসনে আগে ভাগে স্থান নিয়েছিলাম।

যথা সময়ে আদালতের কাজ শুরু হলো! দু'হাতে হাত কড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে রামলালকে নিয়ে এসে রিভলবারধারী পুলিশের দল যখন কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে, তখন বিস্ময়ে আমি হতভম্ব!

এই রামলাল! বৃটিশ সরকারের ত্রাস! মাখোয়া গাঁয়ের মানুষের ঘুম কেড়ে

নেওয়া আতঙ্ক! এই ছোট্ট, বেঁটে-খাটো, ফুট পাঁচেকের মতো এক রোগা খিড়খিড়ে মানুষটার ভেতরে এত বিক্রম, এত দুর্জয় সাহস! বয়েস কত হবে—বড়জোর চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখলে, মনে হয় আরো কম। লৌহ আকর দিয়ে তৈরি কঠিন চেহারা, ছোট ছোট চোখ দুটোর মধ্যে যেন আগ্নেয়গিরির জ্বালা!

সওয়াল শেষ হলে হাকিম যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি আইনের চোখে যে অপরাধ করেছ, তাতে তোমার শাস্তি প্রাণদণ্ড। এখন যদি তোমার কিছু বলার থাকে বলতে পার?

রামলাল তেজদৃপ্ত কণ্ঠে বললে—হুজুর, আমার এই শাস্তির বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। তবে ওই যে লোকটি আমাকে ধরেছে বলে দাবি জানাচ্ছে সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা!

যেন আদালত ঘরটা হঠাৎ চমকে উঠল। হাকিম তাঁর চশমার ভেতর দিয়ে বড় বড় চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—সেকী! আরও যারা সাক্ষী এখানে রয়েছেন তাঁরাও দেখেছেন, ওই লোকটি ধরেছে। ওর ঘরে তুমি সেদিন গভীর রাত্রে ঢুকেছিলে চুরি করতে, ওর পাশে শুয়ে ঘুমচ্ছিল ওর স্ত্রী আর স্ত্রীর বুকের কাছে ছিল ওই শিশু পুত্রটি। ওইতো তোমার সামনে, এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা সকলে। সেই লোক, তার স্ত্রী, আর তার কোলের বাচ্চাটি।

ঘোরটা ফিরতেই হঠাৎ রামলালের চোখদুটো যেন জড়িয়ে গেল সেই শিশুটির মুখের ওপর। কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। তারপর বললে—হুজুর মৃত্যুর আগে, ভগবানের নামে দিব্যি করে সত্যি বলব, শপথ নিয়েও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আপনার সামনে মিথ্যে বলব না। আমাকে ধরেছে, ওই শিশুটি।

—সেকি? হাকিম প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ হুজুর, সত্যি বলছি। ওই শিশুটি তখন ওর মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছিল আর তখন ছোট্ট জানালাটা দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়েছিল ওদের মুখে। এমন স্বর্গীয় দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখি নি। তাই তাকিয়েছিলাম ওর মুখের দিকে। কোমর থেকে ছুরিটা বার করতে ভুলে গিয়েছিলাম, কেন বলতে পারব না। ঠিক সেই অবসরে কে আমায় পিছন থেকে জাপটে ধরে ফেলেছিল। মনে নেই। নইলে ও কেন, ওর বাবা, তার বাবার সাধ্য ছিল না, আমায় ধরে।

সহসা বিস্মৃতির পর্দা ছিঁড়ে দীর্ঘকাল পরে, রামলালের ওই কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। চম্বলের দস্যুকে কে ধরেছে। স্ত্রী-পুত্র কন্যার সঙ্গে মিলিত গার্হস্থ্যজীবনের সেই ক্ষণিক সুখের ছবি, না কোনো মানুষ?

শিবে ডাকাতের আর এক গল্প

ধীরেন্দ্রলাল ধর
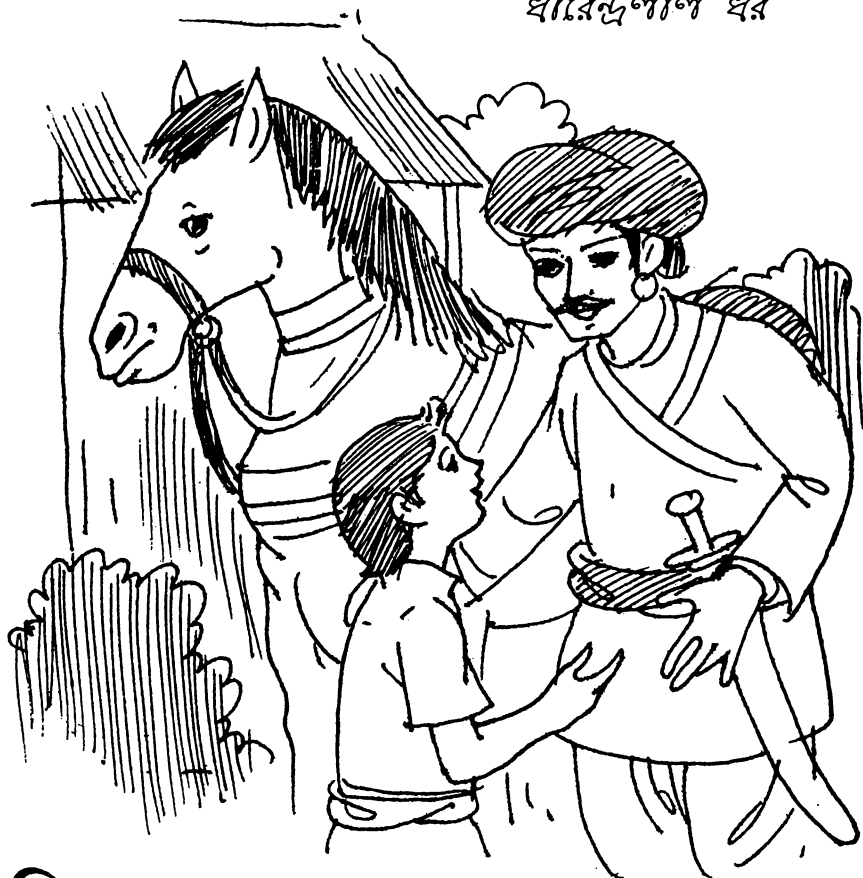
সিপাহী যুদ্ধের আমল।

মুর্শিদাবাদ শহর তখন জমজমাট। নবাবী আমল। বাংলা বিহার ওড়িশার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। দোকান-পসারি, পদাতিক, গাড়ি, ঘোড়া সব মিলিয়ে শহরে বুঝি আর মানুষের জায়গা নেই।

বাইরে থেকে লোকজন আসে অহরহ। সেজন্যে মুসাফিরখানাও আছে বহু, কোনো মুসাফিরখানাই কোনোদিন খালি থাকে না।

গঙ্গার ধারে এক মুসাফিরখানা নিয়েই আমাদের এই গল্প।

মুসাফিরখানার মালিক হিন্দু। হিন্দুরাই এখানে আশ্রয় নেয়। হোটেল কথাটার চলন তখনও হয়নি, তা হলে এর নাম হত হিন্দু হোটেল। এদিকটায় এই একটাই হিন্দু আবাসিক ভোজনালয়। গঙ্গার ধার দিয়ে যারা দূরদূরান্তে যাওয়া-আসা করে তারা এই ভোজনালয়টির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত।

সেদিন সন্ধ্যার পর এক বাঙালি ঘোড়সওয়ার মুসাফিরখানার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল। নেমেই ডাক দিল—বাচ্চু—বাচ্চু—!

একটা বছর বারোর ছেলে বেরিয়ে এল। ঘোড়সওয়ারকে দেখে বলল, সেলাম!

ফটকের মাথায় একটা তেলের লণ্ঠন জ্বলছিল, সেই আলোয় ঘোড়সওয়ার ছেলেটির মুখের পানে তাকিয়ে বলল, কীরে, কেমন আছিস?

—ভালো।

—গলার স্বর অমন কেন রে? কাঁদছিস বুঝি?

—না।

—হ্যাঁ তুই কাঁদছিস, চোখে জল চিকচিক করছে।

বাচ্চু চুপ করে রইল।

—কী হয়েছে রে?

—মেরেছে।

—কেন, মারল কেন?

—দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—সেইজন্য মেরেছে?

—একটু দোষ দেখলেই তো মারে।

—যাক, কাঁদিসনে, আমি তোকে এবার এক রুপেয়া বকশিশ দিয়ে যাব।

—দিলে কী হবে, তুমি চলে যাবার পর তো কেড়ে নেবে।

—তোর বকশিশ কেড়ে নেবে?

—তাই তো নেয়।

সওয়ার কয়েক মুহূর্ত ছেলেটির মুখের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, আমার ঘোড়াটা আস্তাবলে নিয়ে যা—

বাচ্চু বলল, মালিককে কিছু বলবেন না বাবুজি, তাহলে আবার মারবে।

—ঠিক আছে।

ঘোড়সওয়ার মুসাফিরখানায় প্রবেশ করল।

সামনের বারান্দায় বলেছিল মালিক নন্দলাল, ঘোড়াসওয়ারকে দেখেই চিনল, বলল, শিবদাসবাবু নাকি! নমস্কার! নমস্কার!

শিবদাস প্রতিনমস্কার করে বলল, আমার ঘর খালি আছে?

—দোতলা, কোণের ঘর? আছে। সাফ করিয়ে দিই। ওরে বাচ্চু—

—বাচ্চু আমার ঘোড়া রাখতে গেছে আস্তাবলে।

—ঠিক আছে, আসুক। আপনি ততক্ষণ বসে একটু তামাক খান।

শিবদাস সামনের কুরসির উপর বসল। নন্দলাল তামাকের হুকুম দিল। শিবদাসকে সে খুশি রাখতে চায়। শাঁসালো খরিদ্দার। এই সরাইখানায় যখনই আসে যথেষ্ট খরচ করে, ঝি-চাকরদের রীতিমতো বকশিশ দেয়। ব্যবসা করতে

হলে এদের খুশি রাখতে হয়।

তামাক খেতে খেতে কাজ কারবারের কথা শুরু হল। এ কথা পুরনো কথা— এ বছরের ব্যবসা গত বছরের চেয়ে খারাপ, কী যে হবে, কী করে সব চলবে ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে বাচ্চু এসে পড়ল, শিবদাস বাচ্চুর সঙ্গে দোতলায় চলে গেল।

বাচ্চু ঘরখানি সাফসুফ করে দেয়, একটা লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে আসে। একখানি সতরঞ্চি এনে পেতে দেয় তক্তাপোশের উপর, তারপর চাদর বিছিয়ে দেয়। শিবদাস এবার বেশভুষা বদলাতে ব্যস্ত হয়। বলে, হাত মুখ ধুয়েই কিছু খেতে হবে। বাচ্চু, সেরখানেক দুধ আর চারটে মিঠাই নিয়ে আয়, দুটো গেলাস নিয়ে আসবি।

শিবদাস হাত-মুখ ধুয়ে আসতে বাচ্চু দুধ, মিঠাই নিয়ে আসে।

শিবদাস ঘটি থেকে এক গেলাস দুধ ঢেলে নিয়ে বাচ্চুর দিকে এগিয়ে দেয়, বলে, তুই খা, আর এই দুটো মিঠাই।

—আমি?—বাচ্চু তো অবাক।

—তুই মার খেয়েছিস, এবার মিঠাই খা। ঝটপট খেয়ে নে, দেরি করিসনে। এখনই হয়তো মালিক ডাকবে। নে হাত পাত—

মিঠাই দুটো শিবদাস বাচ্চুর হাতে দিয়ে দেয়।

আর বলতে হয় না, বাচ্চু মিঠাই মুখে ভরে, দুধের গ্লাসে চুমুক দেয়।

বাকি মিঠাই দুটো খেয়ে শিবদাস ঘটির দুধ গলায় ঢালে।

বাচ্চু মুখ মুছে, ঘটি নিয়ে চলে যায়। শিবদাস লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে তক্তাপোশের উপর।

ঘণ্টা দুয়েক পরে বাচ্চু আসে ডাকতে—বাবুজি, খানা তৈরি।

শিবদাস নীচে নেমে আসে খেতে।

আহার শেষে শিবদাস মালিককে বলল, বাচ্চুকে খানিকক্ষণের জন্য ছেড়ে দিতে হবে, আমার কোমরে একটু তেল মালিশ করে দেবে। কোমরটা বড় কনকন করছে।

নন্দলাল বলল, বাচ্চু কেন, আমি অন্য লোক দিচ্ছি, শক্ত লোক মিশির ডলে দেবে।

না না, ওই বাচ্চুই ভালো।

—ও যে এখন পরিবেশন করবে, লোকজন খাবে।

—মিশির পরিবেশন করুক। বাচ্চুর মালিশই ভালো হবে। দরদের জায়গায় হালকা হাতের মালিশই ভালো।

নন্দলাল বলল, বেশ, এখনই গরম তেল দিয়ে বাচ্চুকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একটু পরেই বাচ্চু তেলের বাটি নিয়ে ঘরে এল। শিবদাস হেসে বলল, তেল মালিশ করতে তোকে ডাকিনি, তোকে ডেকেছি গল্প করতে।

বাচ্চু তো থ। এর আগেও বাচ্চু অনেক ভালো লোক দেখেছে। মিষ্টি কথা বলে বকশিশ দেয়। শিবদাসও কবার এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে গল্প করতে চায় এমন মানুষ সে দেখেনি।

—কী চুপ করে রইলি যে—শিবদাস বলল, বল, তোর দেশ কোথায়? বাড়িতে কে আছে—বাবা মা ভাই বোন?

এবার যেন বাচ্চু কথা খুঁজে পায়, বলে, বাবা? বাবা মরে গেছে, মা আছে,
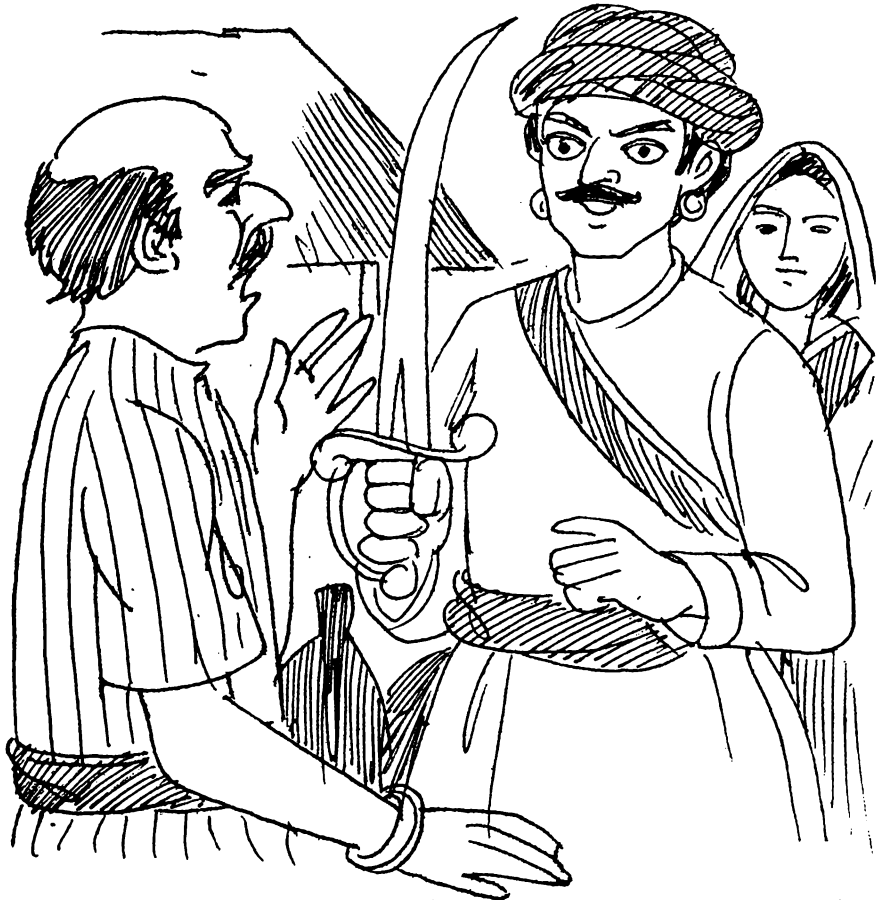
আর মায়ের কাছে আছে ছোট ভাই। এই যে বহরমপুর যাবার সড়ক গেছে, এই পথে দুক্রোশ গেলে আমাদের গ্রাম রামপুর।

—জ্যাঠা খুড়ো কে আছে?

—কেউ না। দশ বিঘে ধান জমি ছিল, সে বছর বিষ্টি হল না। চাষ হল না, খাজনা বাকি পড়ল, জমিদার জমি কেড়ে নিলে। খাব কি, তাই এলাম এখানে কাজ করতে। খাওয়াদাওয়া আর মাসে এক টাকা মাইনে, তা এরা বড্ড মারে। আমার আর এ কাজ ভালো লাগে না, ছেড়ে দেব। এক একদিন আবার রাতের

খাওয়া বন্ধ করে দেয়! কত লোক খুশি হয়ে দু-এক পয়সা বকশিশ দিয়ে যায় তাও কেড়ে নেয়।

ছেলেমানুষ সহানুভূতির আমেজে বলে যায় অনেক কথা। সেই সকাল হবার আগে উঠতে হয়। সারা বাড়ি ঝাঁট দিতে হয়। জল তুলতে হয়। যাত্রীদের ফাইফরমাশ খাটতে হয়। খাটতে হয় রাত দুপুর অবধি। এক-একদিন পা ব্যথা করে, একটু বসার উপায় নেই, সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়বে—এটা কর, ওটা কর! সকালে উঠতে একটু দেরি হলেই মারবে। ডেকে সাড়া না পেলে গাল দেবে। সারাদিন একটু সুস্থির হয়ে বসার উপায় নেই। আজ তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বিকেলবেলা হাত থেকে থালা পড়ে গিয়েছিল বলে আমায় মারলে।

শিবদাস চুপ করে শুনে যায়।

কোনো একসময় শিবদাস প্রশ্ন করল, তোর বাবা কী কাজ করত?

—বাবা ছিলেন ঘরামি। খুব ভালো ঘর ছাইতে পারত। সবাই বাবাকেই ডাকত ঘর ছাইতে। বৃষ্টির দিনে কাজ থাকত না, বাবা তখন দাওয়ায় বলে গল্প বলত। কত গল্প—রাক্ষসের গল্প, ভূতের গল্প, বেহ্মদত্যির গল্প, ডাকাতের গল্প। একজন ডাকাতকে তেষ্টার জল দিয়েছিল, নারকেল-মুড়ি খেতে দিয়েছিল বলে সে এক থলি টাকা দিয়েছিল। তেমন কোনো ডাকাতের ঠিকানা পেলে আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতাম।

—দেখা করলে কী হত?

—ভিক্ষে চাইতাম, বলতাম, আমরা বড্ড গরিব, মা বাবুদের বাড়িতে ধান ভাঙে মুড়ি ভাজে, তুমি আমাদের দশ-বিশটা টাকা দাও।

—দশ-বিশ টাকায় তোদের কদিন চলবে?

—তার মধ্যে আমি অন্য জায়গায় চাকরি জোগাড় করে নেব, এখানে আর কাজ করব না। এখানে আর একটুও ভালো লাগে না, এরা মারে, আবার চুরি করে। বকশিশের পয়সা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখলাম, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম কিচ্ছু নেই। সেই পয়সার কথা জিজ্ঞেস করলে আবার এক চড় বসিয়ে দিলে। এখন আর তাই কেউ বকশিশ দিলে নিই না। বকশিশের পয়সা সব থাকলে আজ আমার চার-পাঁচ টাকা হয়ে যেত।

শিবদাস শুনতে শুনতে হঠাৎ কী ভেবে কোমরে জড়িয়ে রাখা টাকার থলিটা খুলে ফেলে, ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা সিকি বের করে বলে, এই নে, তোকে আমি চার আনা বকশিশ দিলাম, আমার সামনে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে কোমরে জড়িয়ে নে।

—কেন দিচ্ছেন বাবু, ও থাকবে না। কাল ঘুম থেকে উঠেই দেখব গিঁট খোলা।

—খুলুক না, আমাকে বলবি, আমি বেহ্মদত্যি পাঠিয়ে দোব।

—বেহ্মদত্যি?

—গল্পের বেম্মদত্যি। যার কাজ হল দুষ্ট লোকদের শায়েস্তে করা।

—সে কি সত্যি আছে নাকি? বাবার কাছে সে গল্প শুনেছি। জমিদারের গোমস্তা গরিব চাষীর সব কেড়ে নিয়েছিল, সে মনের দুঃখে বনে যাচ্ছিল। কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল, পথে এক গাছ থেকে বেম্মদত্যি নেমে এসে বলল, কাঁদছিস কেন? তারপর সব শুনে বললে, আয় আমার সঙ্গে। বেম্মদত্যি গোমস্তার বাড়ি গিয়ে তাকে এমন মার দিলে যে গোমস্তা চাষীকে দশ গুণ টাকা-পয়সা দিয়ে তবে রেহাই পায়।

—সেই বেম্মদত্যিই আমি ডেকে আনব।

—সত্যি?

—সত্যি।

—বাচ্চু সিকিটা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ভালো করে কোমরে জড়িয়ে নিলে। শিবদাস বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে, যা, এবার তোর ছুটি।

পরদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান সেরে শিবদাস যখন ফিরল মুসাফিরখানার দেউড়িতে দাঁড়িয়ে বাচ্চু তখন কাঁদছে।

—কী হল রে বাচ্চু?

নন্দলাল কাছেই ছিল, ওকে জবাব দিলাম। ঘুম থেকে উঠেই ব্যাটা বলে, 'আমার কাপড়ের খুঁটে চার আনা পয়সা বাঁধা ছিল, তোমরা খুলে নিয়েছ'! ব্যাটা আমাকে বলে চোর! ওর মা হাতে-পায়ে ধরেছিল তাই রেখেছিলাম, যতদিন যাচ্ছে তত ব্যাটা মাথায় উঠছে! পাজি, নচ্ছার, বদমায়েস! খবরদার, আর এ মুখো হসনি।

এবার বাচ্চু মুখ তুলে বলল, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।

—তোকে আমি এক পয়সাও দোব না। তোর মাকে আসতে বলবি।

—মা কেন আসবে? আমার ছমাসের মাইনে আমাকে দিয়ে দাও, আমি চলে যাই।

—তোকে আমি এক পয়সাও দোব না।

বাচ্চু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নন্দলাল বলল, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? যা ব্যাটা আমার সামনে থেকে, না হলে ঘাড় ধরে দূর করে দোব।

—মাইনে না দিলে আমি যাব না।

নন্দলাল মারতে উঠল।

শিবদাস মাঝে পড়ল, বলল, আহা মেরো না, মাইনে দিয়েই দাও না, চলে যাক।

—ওর মা-ই বারণ করে গেছে, ওর হাতে টাকা দিতে। নন্দলাল বলল।

বাচ্চু রুখে উঠল, না মা কখনো একথা বলেনি।

নন্দ ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল।

বাচ্চু চিৎকার করে উঠল, মিথ্যাবাদী!

—ফের কথা—নন্দলাল আবার মারতে উঠল।

বাচ্চু ছিটকে বেরিয়ে গেল।

শিবদাস আর কিছু বলল না, নিজের ঘরে চলে গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে শিবদাস গোটা চারেক মিঠাই আর এক ঘটি ঘোল খেয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল।

রীতিমতো ঘোড়া ছুটিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে শিবদাস এসে ধরল বাচ্চুকে। বাচ্চু ম্লান মুখে পথ দিয়ে চলেছিল। শিবদাস ঘোড়া থামিয়ে বলল, তোর গাঁয়ের দিকেই যাচ্ছি, আয়—

শিবদাস বাচ্চুকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলে।

বাচ্চু জীবনে ঘোড়ায় চড়েনি, বলল, তোমার ঘোড়াটা তো বেশ তেজি!

শিবদাস বলল, ঘোড়াই হোক, আর মানুষই হোক, তেজ না থাকলে কারও দাম থাকে না।

ক-মিনিটের মধ্যেই তারা রামপুরে এসে পৌঁছল।

বাচ্চু বলল, গাঁয়ে এসে গেছি, আমাকে নামিয়ে দিন।

—চল তোর বাড়িতেই যাই।

পরপর গোলপাতায় ছাওয়া কয়েকখানি মেটে বাড়ি, তারই একটার সামনে এসে বাচ্চু ডাকল, মা!

এক রমণী বেরিয়ে এল। বাচ্চুকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

বাচ্চু বলল, রোজ রোজ আমার বকশিশের পয়সা চুরি করে, সেই কথা বলেছিলাম বলে আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলে।

—তাড়িয়ে দিলে?

—হ্যাঁ।

—মাইনের টাকাগুলো দিয়েছে?

—না।

—ছমাস যে কাজ করলি তার মাইনে দেবে না?

—তোমাকে যেতে বলেছে।

রমণী কী বলতে যাচ্ছিল থেমে গেল, শিবদাসের দিকে তার নজর পড়ল। দরজার আড়ালে সরে গিয়ে বলল, সঙ্গে কে?

—উনি সরাইখানায় থাকেন, আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

এবার শিবদাস বলল, তোমরা মায়ে-ব্যাটায় আজ সন্ধেবেলা যাবে, সন্ধ্যার সময় আমি থাকব, টাকা আদায় করে দোব।

রমণী আড়াল থেকে বলল, ও মাসে দুবার গেছিলাম, এক পয়সা দেয়নি।

—আজ যাবে, দেখব।

ইতিমধ্যে 'দাদা' 'দাদা' বলতে বলতে একটা ছেলে লাফাতে লাফাতে ঘর

থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ঘোড়ার পিঠে তলোয়ার-ঝোলানো শিবদাসকে দেখেই থমকে গেল। শিবদাস ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে গন্তব্য পথে রওনা হল।

সন্ধেবেলা বাচ্চু আর তার মা এল নন্দলালের সরাইখানায়।

নন্দলাল দেখেই তো গর্জন করে উঠল, আবার তুমি ছেলেকে নিয়ে এলে কেন? ওকে আমি রাখব না।

—মাইনের টাকাটা দিন, আপনি আসতে বলেছিলেন।

—মাইনে কীসের? কাজ করলে তো মাইনে? গন্ডেপিন্ডে গিলেছে আর ঘুমিয়েছে, তুমি হাতে-পায়ে ধরে বলে গিয়েছিলে বলে রেখেছিলাম, না হলে অনেক আগেই বিদায় দিতাম।

—আমি কোনো কাজ করিনি?—বাচ্চু বলে উঠল।

—ওকে কাজ বলে না।—নন্দলাল খেঁকিয়ে উঠল, মাইনে আমি একটি পয়সাও দোব না, এইভাবে লোক রাখা আমার লোকসান।

—কিছু দেবেন না? ছমাস কাজ করল।

—না।

বাচ্চুর মা কেঁদে ফেলল।

—কাঁদাকাটা করো না বাবু। তবে তুমি যখন নিজে এসেছ, আট আনা পয়সা নিয়ে যাও।

—আট আনা?

—আর কথা বলো না, এই আট আনাই আমার লোকসান। ঘরের ভিতর থেকে একটা আধুলি এনে নন্দলাল ঝনাৎ করে ফেলে দিল।

বাচ্চুর মা মিনতি করল, অর্ধেক দিন, তিনটে টাকা অন্তত।

—আর এক পয়সা নয়। আমি দাতব্য করতে বসিনি।

বাচ্চুর মা আধুলিটাই তুলে নিলে।

শিবদাস কাছেই দাঁড়িয়েছিল, এবার এগিয়ে এল, বলল, কীরে বাচ্চু, মাইনে পেলি?

বাচ্চু বলল, ছমাস কাজ করে আট আনা পয়সা।

—তোর মাইনে কত?

—মাসে এক টাকা করে।

শিবদাস নন্দলালকে বলল—ছেলেমানুষ কাজ করেছে, মাইনেটা চুকিয়ে দিন।

নন্দলাল বলল, কাজ করলে তো মাইনে। এ তো দিচ্ছি দাতব্য!

—কেন, আমি তো দেখেছি ও অনেক কাজ করে।

—হ্যাঁ, কাজ করে! তারপর বাচ্চুর পানে তাকিয়ে বলল—যা দিয়েছি ভাগ্যি বলে মানগে যা, যা—

শিবদাস বাচ্চুর পানে তাকিয়ে বলল, ছমাসের ছটাকা মাইনে, আর

বকশিসের পয়সাগুলো? সেও মাসে এক টাকা তো হবে? তাহলে বারো টাকা। বারোটা টাকা একে দিয়ে দিন নন্দবাবু।

—মানে?

—মানে এদের পাওনাটা চুকিয়ে দিন। গরিব মানুষের সঙ্গে জুয়াচুরি করবেন না।

—আমি জোচ্চোর!

—চ্যাঁচাবেন না—শিবদাস খাপ থেকে তলোয়ার খুলে ফেলল।

—মারবেন নাকি?

—না, ধড় থেকে মুণ্ডুটা খসিয়ে দোব।

নন্দলাল এক লাফে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল, শিবদাসও তার পিছনে গিয়ে ঢুকলে ঘরে, বলল, আমি কে জানেন?—শিবদাস—শিবে ডাকাতের নাম শুনেছেন, সেই আমি। টাকা বের করুন। একটা কথা বললেই মুণ্ডপাত!

নন্দলালের কথা হারিয়ে গেল।

একটু পরেই শখানেক টাকার একটা ছোট থলি হাতে নিয়ে শিবদাস ঘর থেকে বেরিয়ে এল, থলিটা বাচ্চুর হাতে দিয়ে বললে, নিয়ে যা—

বাচ্চু বলল, এ যে অনেক টাকা!

—তোদের সঙ্গে জুয়াচুরি করার জন্য নন্দলাল জরিমানা দিল। যা—

বাচ্চুর মা বলল, এত টাকা নিয়ে যাব কোথা? পথে কেড়ে নেবে।

শিবদাস বলল, কেউ কাড়তে এলে বলবে শিবে ডাকাত দিয়েছে। যে কাড়বে তার মুণ্ডু খসে যাবে।

শিবে ডাকাত! বাচ্চু হাঁ হয়ে গেল।

—হ্যাঁ।—শিবদাস হেসে বলল, টাকাটা নিয়ে যা, একটা দোকান-পসারি করে খাবি।

বাচ্চু ও তার মা বেরিয়ে গেল।

তাদের পিছনে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরোল শিবদাস, প্রাঙ্গণে ঘোড়া ছিল, ঘোড়ায় উঠে বসল। তারপর চিৎকার করে হাঁক দিল—নন্দলাল—নন্দলাল!

নন্দলাল বেরিয়ে এল।

—হুঁশিয়ার! গোলমাল পাকালেই তোমার শেষ।

শিবদাস ঘোড়া ছোটাল।

নন্দলাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দেউড়ির সামনে। অনেকের অনেক পয়সা সে মেরেছে কিন্তু সেজন্য এমনভাবে কোনোদিন খেসারত দিতে হয়নি।

কালু সর্দার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তোমরা বোধহয় জান, তিনশ বছর আগে এই বাংলাদেশ একেবারে অরাজক ছিল। তখন মুসলমান-রাজত্ব যায় যায়, অথচ বৃটিশ-রাজত্বের পত্তন হয়নি। তখন সত্যিই এদেশ হয়েছিল মগের মুল্লুক। 'জোর যার মুল্লুক তার'—কথাটা বোধহয় তখন থেকেই উঠেছে।

সেই অরাজকতার সময় সমস্ত বাংলাদেশের নানাজায়গায় বড় বড় ডাকাতের দল গ'ড়ে উঠেছিল। দেশের তারাই ছিল আসল রাজা। সাধারণ লোকে দিনরাত তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে থাকত। সেই ডাকাতের দলের প্রতিপত্তি যে কি রকম ছিল, তা বোধহয় এই কথা থেকেই বুঝতে পারবে যে, তখনকার ডাকাতেরা দস্তুরমত খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করত। ডাকাতি করতে আসছে, না নিমন্ত্রণ খেতে আসছে, তাদের ভাব-গতিক দেখে তা বোঝা যেত না।

জমিদারমশাই হয়তো কাছারিতে বসে আছেন, এমন সময় বিশাল যমদূতের মত চেহারা নিয়ে একজন সেখানে এসে হাজির! জমিদারের তো তাকে দেখেই

চক্ষুঃস্থির হয়ে গেছে! কাঁপতে কাঁপতে তিনি বল্‌লেন—'কি চাই বাপু, তোমার?

ভীমসেনের যমজ ভাই কায়দা দুরস্তভাবে লম্বা কুর্নিশ ক'রে জলদগম্ভীরস্বরে বললেন—'সর্দার আপনাকে সেলাম দিয়েছেন হুজুর।' তারপর মালকোঁচা-মারা কাপড়ের ট্যাঁক থেকে এক চিঠি বেরুল।

জমিদারমশাই চিঠি নেবেন কি, হাতের তার কাঁপুনি থামে না। অনেক কষ্টে চিঠি যদিই-বা নিলেন, তো পড়তে আর সাহস হয় না।

কিন্তু চিঠিতে তা ব'লে খুব ভয়ঙ্কর রকমের ধমক-ধামক বা হুমকি ছিল ব'লে মনে কোরো না। সে চিঠি একেবারে মাখমের মতো মোলায়েম! চিঠি প'ড়ে মনে হয়, যিনি লিখেছেন, তিনি যেন পায়ে কাঁটা ফুটলে কাঁটার কাছেও হাতজোড় করে ক্ষমা চান। চিঠিতে জমিদারের শ্রীচরণকমলে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে লেখা হয়েছে যে, অমুক দিনে অমুক সময়ে জমিদারমহাশয়ের একান্ত শ্রীচরণাশ্রিত ভৃত্য বাবলাডাঙ্গার কালুসর্দার শ'খানেক বাছা-বাছা লাঠিয়াল নিয়ে হুজুরকে সেলাম দিতে আসবে। হুজুর যেন তাদের বকশিসের বন্দোবস্ত করে রাখেন।

জমিদারমশাই চিঠি প'ড়ে পাখার হাওয়া খেতে খেতেও ঘেমে উঠলেন। বুড়ো নায়েবমশাই তো মূর্ছা যাওয়ার জোগার!

ভীমসেনের যে যমজ-ভাই চিঠি এনেছিল, এবার সে লম্বা আর একটা কুর্নিশ ক'রে হঠাৎ পেছন ফিরে এক 'কুকি' দিলে।

সে 'কুকি' তো নয়, একসঙ্গে সাতটা বাজ পড়লে বুঝি অত শব্দ হয় না।

মানুষের গলা থেকে যে অমন আওয়াজ বেরতে পারে, না শুনলে বিশ্বাস করবার যো নেই।

জমিদারমশাইয়ের যেটুকু বাকি ছিল, এই 'কুকি' শুনেই তা শেষ হ'য়ে গেল।

তিনি কাছারি ঘরের ফরাসের ওপর আলবোলা-সমেত কাত হ'য়ে পড়লেন। আর একা জমিদারমশাইয়ের বা দোষ দিই কেন? কাছারি-বাড়ীর যে যেখানে ছিল, সবার অবস্থাই সমান! নায়েবমশাই ইতিমধ্যে কখন তক্তপোশের তলায় লুকিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁর গোঙানি শোনা গেল। অমন যে জমিদার-মশাইয়ের লম্বা-চওড়া ভোজপুরী দরোয়ান, সে পর্যন্ত পেতল-বাঁধান লাঠিটা ফেলে কোথায় যে গেল, তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না। খানিক বাদে একটু সামলে উঠে জমিদারমশাই প্রথমেই ডাকলেন—'রায়মশাই।'

তক্তপোশের তলা থেকে জবাব এল—'আজ্ঞে।'

নায়েবমশাইকে তক্তপোশের তলায় দেখে সবাই তো অবাক্! মাকড়শার জাল-টাল মেখে তিনি বেরিয়ে আসতেই জমিদারমশাই চ'টে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি ওখানে কি করছিলেন?'

নায়েবমশাইয়ের উপস্থিত-বুদ্ধি কিন্তু খুব বেশি, অম্লান-বদনে তিনি জবাব

দিলেন—'আজ্ঞে, একটা দলিল প'ড়ে গেছল, তাই খুঁজছিলাম।'

এইতো গেল সেকালের ডাকাতির দৌত্য-পর্ব, তারপরের ব্যাপার আরো চমৎকার। জমিদারমশাইয়ের এতখানি পরিচয় হওয়ার পর আর বোধহয় তাঁকে ছাড়া উচিত হবে না, সুতরাং গল্পই বলা যাক।

আমাদের জমিদারমশাই বড় কেও-কেটা নন। একটা আস্ত পরগণা তাঁর দখলে, গড়ের মত তাঁর বাড়ি, পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল তাঁরও বড় কম নয়! কিন্তু তবুও তাঁকে কালুসর্দারের ভয়ে অস্থির দেখে সেকালের ডাকাতদের প্রতাপ বোধহয় কিছু বোঝা যায়।

নায়েবের পর জমিদার পরামর্শ করবার জন্যে ডাকতে পাঠালেন তাঁর বড় ছেলে ধনঞ্জয়কে। অবশ্য ধনঞ্জয়ের মতামতের ওপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল, এমন নয়।

গোয়ার ব'লে তার আশা তিনি একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। তবু হাজার হোক, বড় ছেলে তো—একবার ডাকা উচিত ব'লেই তাঁর মনে হোলো।

কিন্তু পাইক খানিক খুঁজে এসে খবর দিলে—'তিনি নেই হুজুর!'

জমিদারমশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'নেই কিরে? দেখ্‌গে যা—আখড়ায় গিয়ে হয়তো লাঠি চালাচ্ছে। বেটার ওই তো কাজ, চাষা হ'য়ে কেন যে জন্মায়নি তাই ভাবি।'

'আজ্ঞে, তিনি সকালে বাহান্ন গ্রাম গেছেন।'

জমিদারমশাই এবার মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। 'মারলে, এরা সবাই মিলে আমায় মারলে! জানি আমি, গোঁয়ার্তুমি ক'রে প্রাণটা দেবে। এই সময়ে বাবলাডাঙ্গা পেরিয়ে মাথা খারাপ না হ'লে কেউ যায়!'

হঠাৎ কি মনে ক'রে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'হ্যাঁরে সঙ্গে কারা গেছে?'

'আজ্ঞে, সঙ্গে তিনি কাউকেও যেতে দেননি।'

এবার জমিদারমশাইয়ের মুখ দিয়ে আর কথাও বেরুল না। খানিক বাদে নায়েবমশাইকে শুধু তিনি হতাশভাবে বললেন—'মঙ্গলবার সিংদরজা খোলাই থাকবে। তাদের যেন কেউ বাধা না দেয়।'

নায়েবমশাই মনে মনে একরকম খুশী হ'য়েই ঘাড় নাড়লেন। ভীতু মানুষ, ডাকাতের সঙ্গে মারামারির ভাবনায় তাঁর পেটের ভাত এতক্ষণ চাল হ'য়ে যাচ্ছিল।

গভীর জঙ্গলের ভেতর ডাকাতদের আড্ডা! নামে বাবলাডাঙ্গা হ'লেও বাবলা ছাড়া বোধহয় সব গাছই সেখানে আছে এবং সে-সব গাছের ঝোপ এত ঘন যে, দিনের বেলাতেও সেখানে অন্ধকার হ'য়ে থাকে।

তিন-চারজন লোক মিলে নতুন গোটাকতক 'রণপা' তৈরি করছে, কালুসর্দার ব'সে ব'সে তাই তদারক করছিল, এমন সময় কাছেই জঙ্গলের

ভেতরে ভয়ানক হট্টগোল শোনা গেল। হট্টগোল নয়, মনে হোলো, বেশ একটা যেন দাঙ্গা চলেছে!

কালুসর্দারের শাসন একেবারে বজ্রের মত কঠোর। তার দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে, এ-তো সম্ভব নয়। হট্টগোল অত্যন্ত বেড়ে ওঠাতে কালুসর্দারকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার সন্ধান নিতে যেতেই হোলো!

কিন্তু কয়েক-পা এগুতেই যে-দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তাতে কালুসর্দারকে পর্যন্ত স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হোলো।

কুড়ি-একুশ বছরের একটি গৌরবর্ণ যুবক কালুসর্দারের দলের একজন সেরা লাঠিয়ালের সঙ্গে লড়ছে—না, শুধু লড়ছে বল্‌লে তার কিছুই বলা হয় না, কায়দার পর কায়দায় বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ ক'রে ছেলেখেলা করছে!

কালুসর্দার মনে মনে এরকম ওস্তাদ খেলোয়াড়কে তারিফ না ক'রে পারল না। দেখতে দেখতে ছেলেটির লাঠির এক ঘায়ে কালুসর্দারের দলের লাঠিয়ালের হাত থেকে লাঠি খ'সে পড়ল! তখন দলের অনেক লোক তাদের চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এত লোকের সামনে অপমানে ও লজ্জায় লোকটা রাগে অন্ধ হ'য়ে পাশের একজনের হাত থেকে এক বল্লম নিয়ে ছুঁড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ কালুসর্দার সামনে এগিয়ে এসে বল্‌লে—'লজ্জা করে না, ওইটুকু ছেলের কাছে লাঠি ধরতে না পেরে আবার বল্লম-ছোঁড়া?' তারপর ছেলেটির দিকে ফিরে সর্দার জিজ্ঞেস কর্‌লে—'তোমার নাম কি ভাই?'

কালুসর্দারের বিশাল সিংহের মত বলিষ্ঠ চেহারার ওপর ছেলেটি দু'বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—'তাতে তোমার দরকার?'

দলের সবাই তো অবাক্! কালুসর্দারের মুখের ওপর এরকম জবাব! কিন্তু কালুসর্দার একটু হেসে বল্‌লে—'তা ঠিক বলেছ, তোমার নামে কোন দরকার নেই, তোমার পরিচয় হাতের লাঠিই দিয়েছে, তুমি আমাদের দলে আসবে?'

খানিক চুপ ক'রে থেকে একটু হেসে বল্‌লে—'যদি না আসি'।

কালুসর্দার তেমনি ধীরে ধীরে বল্‌লে—'আমাদের গোপন আড্ডা দেখবার পর আমাদের দলের না হ'লে জ্যান্ত যে কেউ ফিরতে পারবে না ভাই! তুমি এপথে এসে ভালো করনি।'

ডাকাতের দলের সংখ্যা দেখে মনে মনে কি ভেবে ছেলেটি বল্‌লে—'বহুৎ আচ্ছা, এত তাড়াতাড়ি মরবার সাধ নেই, আজ থেকে আমি তোমাদের।'

কালুসর্দার এবার একটু হেসে বললে—'তোমার নাম তো তুমি বললে না, কিন্তু তোমায় ডাকা হবে তাহ'লে কি ব'লে?'

ছেলেটি একটু চিন্তা ক'রে বললে—'ধর আমার নাম ফ্যালারাম।'

দু'দিনের মধ্যে ডাকাতের দলে ফ্যালারামের খাতির আর ধরে না। যে কাজে দাও ফ্যালারামের জুড়ি মেলা ভার। লাঠি খেলতে, বল্লম ছুঁড়তে, 'রণপায়ে' দৌড়াতে, লাঠিতে ভর দিয়ে লাফ দিয়ে ফ্যালারামের সমান ডাকাতদের ভেতর

খুব কমই আছে দেখা গেল। কালুসর্দার পর্যন্ত একদিন ব'লে ফেললে—'একদিন তুমিই এ দলের সর্দার হবে দেখছি!'

ফ্যালারাম একটু হেসে বলেছিল—'আহা, বাবা শুনলে কি খুশীই হতেন!' কালুসর্দার কথাটি ঠিক বুঝতে পারেনি।

পরের দিন সকাল থেকে ডাকাতদের সাজগোজ দেখে ফ্যালারাম একটু অবাক্ হ'য়ে গেল। ব্যাপার কি? একজন ডাকাতকে ডেকে জিজ্ঞেস করাতে সে
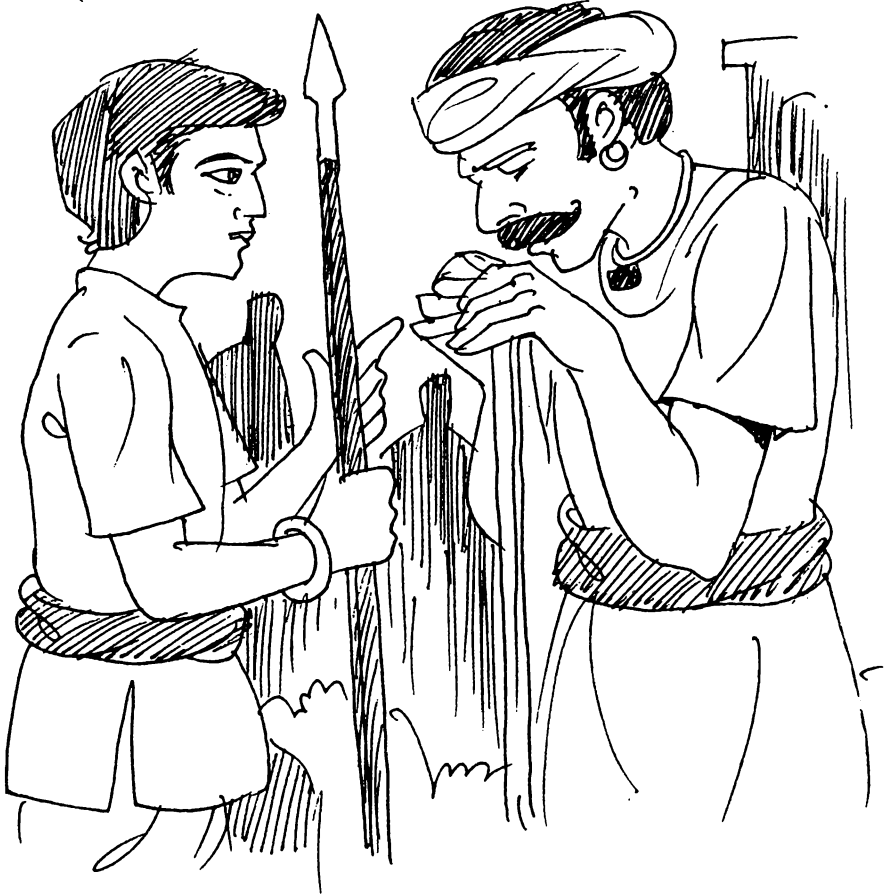
বল্‌লে —'বাঃ, আজ যে চৌধুরী-বাড়ি লুট হবে, জানো না?'

ফ্যালারাম কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে বল্‌লে—'ও, মনে ছিল না বটে।'

সমস্তদিন ধ'রে ডাকাতদের কালীপূজা চল্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতির আয়োজন। দেখা গেল, ফ্যালারামের উৎসাহই সব চেয়ে বেশি। চর্‌কির মত সারাদিন তার ঘোরার বিরাম নেই—সব কাজেই সে আছে।

সন্ধে হতেই ডাকাতেরা সব তৈরি, এবার ঘড়া ঘড়া সিদ্ধি এল—

ফ্যালারামের পরিবেশনের উৎসাহ দেখে কে?

সর্দার বললে,—'সিদ্ধিটা আজ বড় ভালো হয়েছে মনে হচ্ছে, ঘুঁটেছে কে?'

ফ্যালারাম সলজ্জভাবে বলল—'আমি।'

তারপর সেই বনের ভেতর অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠল।'রণপা' প'রে মুখে ভূতের মত রঙ্ মেখে মশাল নিয়ে শ'খানেক ডাকাত যখন সেই বন থেকে একসঙ্গে 'কুকি' দিয়ে বেরুল, তখন মনে হলো, প্রলয়ের বুঝি আর দেরী নেই।

এক প্রহর রাতে ডাকাতদের আসবার কথা! জমিদার চৌধুরীমশাই প্রাণটি হাতে নিয়ে প্রাসাদের সিংদরজা খুলে ব'সে আছেন। ডাকাতেরা এলে বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের হাতে ধন-প্রাণ সঁপে দেবেন—তারপর তারা যা খুশি করুক।

হঠাৎ বাইরে ভীষণ সোরগোল শোনা গেল। আর দেরী নেই বুঝে জমিদারমশাই প্রস্তুত হ'য়ে বসলো, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! সোরগোল বেড়েই চল্‌ল, অথচ ডাকাতদের আসবার নাম নেই। সোরগোলটাও যেন একটু অদ্ভুত রকমের। এ-তো ডাকাতদের আক্রমণের হুঙ্কার নয়, এ যে রীতিমত মারামারির শব্দ! তাঁর লোকজন তো সব গড়ের ভেতর, তবে মারামারি করছে কে?

আরো কিছুক্ষণ ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করে জমিদারমশাই বাইরে লোক পাঠাতে যাচ্ছেন, এমন সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে যে এসে ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে তো বাড়িশুদ্ধ সবাই একেবারে স্তম্ভিত! সে আর কেউ নয়, ধনঞ্জয়—জমিদারের বড় ছেলে।

প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে উঠে জমিদারমশাই কিছু বলবার আগেই ধনঞ্জয় বললে—'দেরী করার সময় নেই বাবা, শীগ্‌গির গোটাকতক মশাল আর কিছু দড়ি দিয়ে জনকয়েক পাঠিয়ে দিন, আমি বাইরেই আছি।'

জমিদারমশাই আরো কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে ধনঞ্জয় বেরিয়ে গেছে। রহস্য এর ভেতর যাই থাক, জমিদারমশাই ছেলের কথা এ-সময়ে অবহেলা করতে পারলেন না। জন-কতক বরকন্দাজ মশাল আর দড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এদিকে ডাকাতদের কি হয়েছে বলি। বন থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই তাদের মনে হোলো, সিদ্ধির নেশাটা যেন বড় বেশি হ'য়ে গেছে। সকলেরই কেমন যেন ঝিমুনির ভাব, পা চালাতে ইচ্ছে করে না। কালুসর্দারের নিজের অবস্থাও অনেকটা সেইরকম, তবুও সকলকে ধমক দিয়ে সে একরকম তাড়িয়েই নিয়ে আসছিল। বিপদের ওপর বিপদ্, খানিকদূর যাওয়ার পর মশালগুলো আপনা থেকেই নিভে যেতে লাগ্‌ল। কোনরকমেই সেগুলোকে আর জ্বালিয়ে রাখা গেল না। মশালগুলোতে মশলাই কম দেওয়া হয়েছে। মশাল-তৈরির ভার যাদের ওপর ছিল, তারা তো ভয়ে অস্থির! এখন কিছু না বল্‌লেও পরের দিন সর্দারের কাছে এর কৈফিয়ৎ দিতে তাদের কি অবস্থা হবে, তারা জানে।

মশালগুলো নিভে যাওয়ার পর অন্ধকারে তাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি যাওয়া অসম্ভব হ'য়ে উঠল। কালুসর্দার হঠাৎ একসময়ে জিজ্ঞেস করলে—'ফ্যালারাম কোথায়?'

কে একজন জানালে যে, ফ্যালারাম তাদের ছাড়িয়ে অনেক আগে চ'লে গেছে!

'চলে গেছে কি হে? পথ চিনতে পারবে না যে!'

'কি জানি সর্দার, তার যা উৎসাহ, ধ'রে রাখে কে?'

কিন্তু চৌধুরী-বাড়ীর কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ অন্ধকারে একটা লোক তাদেরই দিকে ছুটে আসছে মনে হোলো।

সর্দার হাঁকলে—'কে?'

লোকটা তাড়াতাড়ি কাছে এসে বল্লে—'আমি ফ্যালারাম। একটু এগিয়ে ওদের ব্যাপারখানা দেখতে গেছলাম সর্দার।'

কালুসর্দার খুশী হ'য়ে বললে—'বেশ-বেশ, কি দেখলে?'

'লোকজন ওদের সব তৈরী হ'য়ে আছে, কিন্তু এক কাজ করলে ওদের ভারী জব্দ করা যায় সর্দার! আমরা দু'দলে ভাগ হ'য়ে যদি ওদের সামনে পেছনে দু'দিক থেকে চেপে ধরি, তাহ'লে ওদের জারিজুরি সব একদণ্ডে ভেঙে যায়।'

সর্দার খানিক ভেবে বল্লে—'এ তো মন্দ যুক্তি নয়! কিন্তু ঠিক ওরা কোথায় আছে, জান তো?'

'গিয়ে দেখে এলাম, আর জানি না!'

কালুসর্দারের হুকুমে একদল এবার চৌধুরী-বাড়ির সামনে দিয়ে অগ্রসর হোলো, আর একদলকে পেছন দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ফ্যালারাম।

অন্ধকার রাত, সঙ্গে মশাল নেই, তার ওপর নেশায় সবাই বুঁদ হ'য়ে আছে; ফ্যালারাম খানিকদূর গিয়ে—'এ জমিদারের লাঠিয়াল—' ব'লে দেখিয়ে দিতেই ডাকাতেরা বেপরোয়াভাবে সামনে ঝাপিয়ে পড়ল। কে শত্রু, কে মিত্র, বোঝবার তাদের তখন ক্ষমতা নেই।

কালুসর্দারও যে ব্যাপারটা প্রথমে বুঝেছিল, তা নয়। জমিদারের লোকের সঙ্গে যুঝছে ভেবে সে পরমানন্দে লাঠি চালাচ্ছিল। হঠাৎ চারধারে অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠল। ডাকাতেরা অধিকাংশই তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি ক'রে ও নেশার ঘোরে মাটিতে শয্যা নিয়েছে। কালুসর্দার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল—মাটিতে যারা পড়ে আছে, সবাই তারা তার দলের লোক। জমিদারের লোকেরা তখন তাদের মধ্যে যারা কম আহত হয়েছে, তাদের হাত-পা বাঁধতে শুরু করেছে। এরকম ভাবে প্রতারিত হ'য়ে রাগটা তার কিরকম হোলো, বুঝতেই পারো, তার ওপর যখন সে দেখ্‌ল যে, ফ্যালারাম তার কাছেই দাঁড়িয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছে, তখন তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না।

'বুঝেছি, এসব তোরই কাজ। তোর শয়তানির আজ উচিত শাস্তি দেব।'—

ব'লে উন্মাদের মত সে ফ্যালারামের দিকে লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল। জমিদারের একজন বরকন্দাজ সেই মুহূর্তে তাকে লক্ষ্য ক'রে একটা বল্লম ছুঁড়ে মারল, কিন্তু সে বল্লম সর্দারের গায়ে বেঁধবার আগেই ফ্যালারামের লাঠির ঘায়ে মাটিতে প'ড়ে গেল।

কালুসর্দার এবার অবাক্ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাঠিশুদ্ধ হাত তার আপনা থেকেই নেমে এল।

ফ্যালারাম একটু হেসে বললে—'যাক, শোধ-বোধ হ'য়ে গেল সর্দার! আমাকেও তুমি বল্লমের ঘা থেকে বাঁচিয়েছিলে? এখন ইচ্ছে হয়, লড়তে আসতে পার, আমি প্রস্তুত।'

কিন্তু সর্দারের তখন আর লড়বার ইচ্ছে নেই। মাথা নীচু ক'রে লাঠির ওপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। জমিদার লোকজন তখন চারধার দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলেছে। একজন তাকে বাঁধতে যাচ্ছিল, ফ্যালারাম হাত তুলে তাকে নিষেধ করে বললে—'ডাকাতি করলেও তোমার সঙ্গে মিশে দেখেছি, মন তোমার উঁচু আছে সর্দার! তোমায় ছেড়ে দিলাম। যেখানে খুশি তুমি যেতে পার!'

কালুসর্দার তবুও নড়ল না, হাতের লাঠিটা ফেলে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে—'মা কালী আমার ওপর বিরূপ হয়েছেন, নইলে সিদ্ধি খেয়ে আমাদের এত নেশাই বা হবে কেন, আর মাঝপথে মশালই-বা নিভে যাবে কেন? এখন আমার আড্ডা ভেঙে গেছে, দলের লোক সব বন্দী, কোথায় আর আমি যাব! আমাকে বেঁধে নাও।'

ফ্যালারাম মাটি থেকে লাঠিটা কুড়িয়ে সর্দারের হাতে আবার তুলে দিয়ে বল্‌লে—'আচ্ছা, তার বদলে যদি এ বাড়ির লাঠিয়ালদের তোমায় সর্দার করে দেওয়া যায়?'

কালুসর্দার অবাক হ'য়ে বল্‌লে—'আমায়! আমি তো ডাকাত!'

ফ্যালারাম হেলে বললে—'তোমার মত ডাকাতই আমার দরকার। বাজে লোকের সঙ্গে লাঠি খেলতে খেলতে সব প্যাঁচ প্রায় ভুলতে বসেছি।'

কালুসর্দার হতভম্ব হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে—'তোমার দরকার? তুমি কে তাহ'লে?'

ফ্যালারাম একটু হাস্‌ল। জমিদারের লাঠিয়ালেরা হেসে উঠে সর্দারকে ঠেলা দিয়ে বল্‌লে—'বোকারাম, জমিদারমশাইয়ের বড়ছেলেকে চেনো না?'

এবার কালুসর্দারের হাতের লাঠিটা আবার প'ড়ে গেল।

তারপর কালুসর্দার সারাজীবন চৌধুরী-বাড়িতে একান্ত বিশ্বাসী হ'য়ে চাকরী করেছিল শোনা যায়। কিন্তু সিদ্ধি খেয়ে কেন যেন সেদিন তার অত নেশা হয়েছিল, আর মশালগুলোই-বা কেন যে মাঝপথে নিভে গেছল, কোনদিন সে তা বুঝে উঠতে পারেনি।

বীরে ডাকাত ও ছিরে ডাকাত

মহাশ্বেতা দেবী

এক

কথায় বলে—
মাসিপিসি বনগাঁবাসী
বনের মধ্যে ঘর
কখনো মাসি বললে না গো
খই মোয়াটা ধর।

তা বলে খেতার মাসি তেমন না। পউষের হিম হিম ভোরে খেতা কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মাসি ওকে ডেকে দিল। বলল, 'অ খেতা, উঠবিনি আজ? দেখ গা যেয়ে ফাঁদ পেতে এসেছিনু, তাতে কী পড়েছে।'

'কী পড়েছে?'

'সজারু এট্টা। কেমন মোটা রে! বেন্নুন হবে।'

'কখন?'

'আতে।'

'এখন করবি না?'

'ধুর বোকাটা। আতে আজ তোর মেসো আসবে, বলাই কানাই আসবে তা জানু?'

'মোর তরে কী আনবে?'

'সে দেখিস খন। এখন যা বাবা, পলোটা চাপা আছে, চাট্টি মাছ পড়ল কি না দেখ গা। আর শিম কটা পেড়ে দে যা। বামুনবাড়ি যেতে হবে।'

খেতা মুখ ধুল, কড়কড়ে ভাত খেল। মাসির পুকুরের নীচে চার-চারটে কুয়ো আছে। চৈত্র-বৈশাখেও পুকুরের জল দেখোগে কানায় কানায়। পুকুরের ওপাশে জঙ্গল। জঙ্গলের ওপাশে রাস্তা। অনেক আগে খেতার বাবা যখন সবে ধুতি পরতে শুরু করেছে তখন নাকি দেশে বর্গিরা এসেছিল।

তখন দেশে খুব যুদ্ধ হত। যুদ্ধ দেখতে দেখতে খেতার বাবা জোয়ান ছেলে হয়ে গেল। ন-দশ বছর ধরে শুধু যুদ্ধ হয়েছিল।

সেই সময়ে এইসব রাস্তা তৈরি হয়। রাস্তা দিয়ে নবাব হাতি, ঘোড়া, সেপাই, লস্কর নিয়ে যুদ্ধ করতে যেতেন।

খেতার বাবা যুদ্ধে যায়নি। তবে খেতার জ্যাঠা, জ্যাঠার শালা, ছোট ঠাকুরদা, সবাই যুদ্ধে গিয়েছিল।

খেতার যে মাসি, তার শ্বশুরও নাকি যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধে গিয়েছিল, যুদ্ধ করেছিল আর নবাবের দপ্তর থেকে সর্দার খেতাব নিয়ে ফিরে এসেছিল।

তখন এই ইন্দ্রাইল, নাড়াজোল, কান্দী, চাকুলে সব জায়গার লোকেরা লড়াই করত।

সড়কি চালাত, বর্শা চালাত, বল্লম ছুঁড়ত। কেউ বা তির-ধনুকে ওস্তাদ হত। কেউ লাঠি চালাত বন বন বন। লাঠির মাথাটা লোহায় বাঁধানো, তাতে কাঁটা বসানো।

কেউ বাঁশের লাঠি চালিয়েই অবাক করে দিত।

তখন দেশের অবস্থা অন্যরকম ছিল। সেই যে যুদ্ধ হয়েছিল সে সময়ে নবাব ছিলে আলিবর্দি খাঁ।

নবাবের রাজত্ব ছিল বাংলা, বিহার, ওড়িশা জুড়ে। নবাবের রাজত্বে অনেক জমিদার, ভুইঞা রাজা ছিলেন।

খেতার বাপ-ঠাকুরদার মতো মানুষরা সেইসব জমিদারের কাছ থেকে জমি পেত আর চাষ করত।

তার বদলে তারা কী করত?

জমিদারের দরকারে অদরকারে লাঠি, বর্শা, তির হাতে লড়তে যেত।

বর্গিদের সঙ্গে যখন সেই কবে যেন যুদ্ধটা হয় তখনও নবাবের হাজার সৈন্য। তার মধ্যে রাঢ় আর দক্ষিণ দেশের বাঙালি যে কত তার লেখাজোখা নেই।

নবাবের নিজের সৈন্যরা লড়েছিল, তা ছাড়া বর্গিরা যখন বছরের পর বছর আসতেই থাকল, তখন জমিদাররা যে যার জায়গায় যে যার সৈন্য নিয়ে লড়তে লাগলেন।

খেতাদের সবাই হল গিয়ে বুনোবিষ্টুপুরের রায়রাজাদের প্রজা।

যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে খেতার মাসির শ্বশুর এখনও যুদ্ধের গল্পটল্প বলে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে খেতা পলো তুলে দেখল কটা ল্যাটা, গজার আর এক কোঁচড় নয়া মাছ।

খেতার মাসি পুকুরের ঘাটের কাছে ভাত ছড়িয়ে দেয়। ঘাটের কাছে খানিকটা জল বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা। কঞ্চিগুলো খুব ঠাসাঠাসি করে পোঁতা। শুধু একটা জায়গা ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে মাছ ঢুকে পড়ে।

মাসি সন্ধেবেলা যখন হাঁসগুলোকে ঘরে তোলে তখন জলে পলো চাপা দিয়ে চলে আসে। মাসির নিজের হাতে বোনা পলো। খুব চওড়া।

সকালে গিয়ে পলো তোলে, দেখবে দু-তিনটে বেন্ননের মাছ ঠিক পেয়ে গেছ। খেতা রোজ ভাবে, মাছগুলো কী বোকা! রোজ দেখে, যে মাছগুলো ঘেরের মধ্যে ঢোকে সেগুলো ধরা পড়ে, তবুও শিক্ষা হয় না একটু।

মাছ ধরে খেতা ফিরে এল। মাছগুলো দাওয়ায় রাখল। তারপর মাচা থেকে একটা বড়সড় লাউ কাটল। গোটাকয় শিম ছিঁড়ল। মাসি বলল, ‘থাকো কোথা গেল রে?’

থাকোমণি মাসির মেয়ে, খেতার দিদি। গত বছর মন্বন্তরের পর থাকোর শাশুড়ি থাকোকে মাসির কাছে রেখে গেছে। বলে গেছে, ‘চাষবাস ভালো হোক, নে যাব।’

থাকো গাছে উঠে কাঁঠাল পাতা ভাঙছিল। বুনো বাগদির মেয়ে, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, মাছ ধরা ওর খুব অভ্যেস আছে। থাকো বলল, ‘কেন চেঁচাতেছ? পাতা ভাঙতেছি জানো না?’

‘কেন, পাতা কী হবে!’

‘ছাগল খাবে।’

‘গাছ থে নাম তুই, তা বাদে তোর পিঠে একখানা চেলা ভাঙতেছি।’

‘তবে নামব না, যা।’

থাকো গাছের ওপর পা ঝুলিয়ে জুত করে বসল। মাসি বলল, ‘ভাত আঁধবি। মাছের বেন্নুন করবি। তোর কত্তাদাদা জানিস মাছের টক না আঁধলে খাবেনি। গাছে থে বেগুন তুলে নিস কটা। আর শোন। বামুনরা ডাল দিয়েছিল, ভাতে দিস।’

‘কেন? তিন-তিনটে বেন্নন কেন?’

‘হরিচরণ আসতেছে। ঘর নিকোবি, ছাগলটা জানি পালায় না। নিজে পস্কের হয়ে থাকবি, জানলি?’

মাসি তরকারির ধামাটা কাঁধে নিল। গাঁয়ে বামুন বলতে বামুন ওই শিরোমণি-বাড়ি। ওদের বাড়ি মানুষ অনেক। তবে ডাঙা জমিতে বাড়ি, তাই গাছগাছালি ভালো হয় না। ওবাড়িতে শাক বলো, বেগুন বলো, কচু, লঙ্কা, কুমড়ো, লাউ, করলা, ঝিঙে, শসা, বারোমাস এই খেতার মাসি জোগান দেয়।

‘খেতা যেয়ে বাছুরটা খোঁজ গা যা। সাতসকালে যেয়ে কত্তাদাদার কতা শুনতে বসবি না।’

মাসি বেরোতে না বেরোতে হরিচরণ এসে পড়ল।

হরিচরণ থাকোর বর। হরিচরণের বছর চোদ্দো বয়স, থাকোর এই দশ। হরিচরণ কোঁচড় ভরে মুড়ি এনেছিল, আর শসা। থাকো বলল, ‘কেন, নারকেল আনতে পারলে না এট্টা?’

‘মা দিচ্ছে তোকে নারকেল!’

‘কেন, দেবে না কেন?’

‘সাহেব আসতেছে যে। সাহেব এসে ডাকাত ধরবে যত। তা জমিদারবাড়ি যে কী বলব—প্যায়দার সে হ্যাঁকুর কী! নারকেল, চাল, বাতাসা, কুমড়ো, ঘি, তেল ভারে ভারে নে যাচ্ছে।’

‘কেন?’

‘দিতে হবে না? সায়েবের সাথে লোকলস্কর আছে তারা খাবে যি।’

‘হুঁ, ডাকাত ধরবে। বীরে-ছিরের গায়ে হাত দেয় সাহেবের সাধ্যি আছে?’

‘তেমন সায়েব লয় রে থাকো। বলে কী! আমাদের কালীমন্দিরে পুজো দেবে। বলে ডাকাতেরা যদি ওনাকে পুজে ত্যাত শক্তি ধরে তবে আমি বা না পুজব কেন?’

‘সায়েব দেখতে যাব না?’

‘তাই বলতেই ত এনু। মা আসতেছে, পিসি আসতেছে, শাউড়ি বামুনবাড়ি থে আসতেছে, তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে চ, যেয়ে সায়েব কেমন কালীপুজো করে তা দেখব।’

থাকো বলল, ‘তবে তুমি যেয়ে ঝপ করে দু কলসী জল নে দাও দেখি, কাজ সেরেনি।’

খেতা শিকে থেকে বড় তিজেলটা পেড়ে দিল। এই এত বড় তিজেলের এক তিজেল ভাত খেতা, হরিচরণ, থাকো, মাসি, কত্তাদাদা পাঁচজন খাবে। রাতে যখন মেসো আর দুই দাদা আসবে তখন দুই তিজেল ভাত হবে, কচু মুলোর ঝাল আর লঙ্কা গরগরে সজারুর মাংস।

খেতাই খায় সবচেয়ে বেশি। অথচ শরীরটা ওর একরকম থাকে।

থাকো বলে, ‘পেট ফেটে মরবি।’

'থাক। ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট। এত বড় মন্বন্তরটা যে গেল তোদের জানতে দিইনি। ওদের গেরাম কে গেরাম কী হয়েছিল জানিস?'

'কী?'

'শোঁসান!'

মাসি নিশ্বাস টেনে টেনে বলে। মাসির শরীরটা কালো পাহাড়ের মতো। রুক্ষ চুলগুলো শূন্যে ঝুঁটি বাঁধা। হাতে মাটির লাল কড়। এমন কড় কুমোরবাড়িতে শাকটা বেগুনটা দিয়ে মাসি গোছা গোছা আনে। মাসির কাঠের কাঁকইটা তেলের ভাঁড়ে ডোবানো থাকে। ওরা মাথায় সরষের তেল মাখে, সরষের তেলে রাঁধে। পিদিম জ্বালে কড়ুয়া তেলে। মাসি মাসে দু-তিনদিন মাথা আঁচড়ায় আর ক্ষার কাচে।

খেতার মেসো আর কানাই, বলাই একজন খুব বড়মানুষের কাছারিতে কাজ করে। মেসোর গলাটা খুব সরু। যখন মেসো ঘরে আসে তখন বলে, 'পস্কের রইতে পার না? মাথায় তেল দিতে পার না? জানো, আমার সঙ্গীসাথীরা সব তাবড় তাবড় লোক। তারা দেখলে পরে কী ভাববে?'

মেসো যে কত বড়লোকের খবর রাখে তার ঠিকঠিকানা নেই।

মেসোর মান রাখতে মাসিকে মাসে দু-তিনবার ক্ষার কাচতে হয়। নইলে দেখো আটহাতি গড়ে কাপড় পরে, খেতার মাসি হয় খেত কুপোচ্ছে, নয় বন থেকে শিমূল ফল এনে ফাটিয়ে তুলো বের করছে, নয়তো বন ঘুরে ঘুরে কোথায় বনডুমুর, কোথায় মাদার ফল, কোথায় নোনা ফল, কোথায় ধুঁধল তাই দেখছে। নদীর চরে কাছিমের বাসা। বুনোপাড়ার ছেলেগুলো যা পারে না, ও তা পারে। ও ঠিক কাছিমের ডিম, কাছিম নিয়ে আসে।

মাসির শ্বশুর বলে, 'বউটা যদি পুরুষ ছেলা হত তবে অ্যাতদিনে ওটোনের চারদিকে যে চারচালা ঘর উঠত চারখানা। আমার একখানা আটচালা আখড়া হত।'

খুব, খুব ভক্তি কর্তাদাদার। গোয়ালঘরের মাঝে বেড়া দিয়ে ওপাশে ও থাকে। মাচার ওপর ঘুমোয়। মাচার নীচে ছাগল বাঁধা থাকে। রাতে সবাই ঘুমোয়, ও ঠিক প্রহর গুনে গুনে তিন প্রহরে তিনবার 'ক্যা ও! সাবধান' বলে চ্যাচাবে। তারপর ভোরেই তারা দপদপ করতে দেখে তবে চোখটা বুজবে।

ঘরের সামনে ও নিচু করে মাচা বেঁধে রেখেছে। সেখানে ও সন্ধেবেলা নিত্যি বসে। বুনোপাড়ার মানুষরা, জমিদারের পাইক-পেয়াদা, সায়েবকুঠির লস্কর, সারে সারে মানুষ ওর কীর্তন শুনতে আসে।

'এ হরিনাম ভবে রইতে পারের ভাবনা ভাবিস কী রে'—

গানটা কর্তাদাদার সঙ্গে খেতাও গায়। খেতা রাতে ওর কাছেই ঘুমোয়।

কর্তাদাদা মাংস খায় বটে, কিন্তু বলে, 'বউমা! এত বুদ্ধি তোমার, কিন্তু জীবকে বড় হিংসে করো।'

কর্তাদাদার কথা শুনলে খেতার মাসি খুব ভয় পায়। বলে, 'কেন গো?'

'এই ধরগা, সজারুটা, খরাটা (খরগোশ), হরিণটা, কাছিমটা, এ তুমি মারবে, তবে মা! টেঁটা দে মেরো না। আমরা হলাম যেয়ে বোষ্টুম। তুমি বেশ খন্দ করে মাটি খুঁড়ে ফাঁদ পাতো গা! ফাঁদ দাও গা! ফাঁসে বেঁধে অমনি ব্যাটা হরিচরণে চলে যাবে। বোষ্টুমঘরে জীবরক্ত পড়াটা কি ভালো?'

কর্তাদাদা বেজায় গুণী, বেজায় জ্ঞানী। খেতারা রক্ত পড়লে বলে, 'ওঃ কত লোক ছুটছে দেখো?'

কর্তাদাদা বলে, 'রক্ত পড়ছে দেখো?'

তাই মাসি সজারু, খরা, হরিণ ফাঁদেই ধরতে চেষ্টা করে কিন্তু কাছিমের বেলায় তা হয় না।

কর্তাদাদা মশাটা মারলেও একবার 'হরিবোল!' মুখে বলে।

দুই

মন্বন্তরটা বাংলা ছিয়াত্তর সালেই হল। কিন্তু অজন্মা হল পঁচাত্তর সালে। সেই যে অনাবৃষ্টি শুরু হল তাতেই বাংলার হাজার হাজার মাইল-জোড়া ধানখেত জ্বলে গেল।

মানুষ যতদিন পারল গাঁয়ে রইল। তারপর যে যার মতো চলে গেল। গত গ্রাম যে আস্তে আস্তে জঙ্গল হয়ে গেল তার কী বলি।

এগারোশো ছিয়াত্তরের বাংলায় একজন নবাব ছিলেন বটে, তবে তিনি নামেই নবাব। আসলে দেশের কর্তা তখন ইংরেজরা।

ছিয়াত্তর সালের এই ভীষণ মন্বন্তরের সময়ে দেশের একভাগ মানুষ মরে যায়। দুভাগ বেঁচে থাকে।

তবু সায়েবেরা খাজনা নিতে ছাড়েনি। খেতাদের জমিদার রায়রাজার বাড়িতে কোম্পানির লোক এল। সকলের ডাক পড়ল।

খেতার বাবা বলল, 'খাজনা দিতে পারব না।'

'পারবি না বললে হল?'

খেতার বাবা চিরকাল বেপরোয়া, গোঁয়ার আর একরোখা। খেতার বাবা বলল, 'কার হুকুম?'

'কোম্পানির হুকুম?'

'কোম্পানি জানে মোদের ভিটেয় বাঘ ঘুরতেছে, ধান খেত জ্বলে গেছে!'

'কোম্পানি কি দেখতে গেছে?'

'কোম্পানিকে বলো গা চাষবাস করে ধান তুলে খাজনা আদায় করতে।'

রায়রাজার রাজত্ব এখন আর নেই। তবু তিনি গাঁয়ের মানুষের কাছে রাজা তো বটেন! তিনি খেতার বাবার কথায় চটে গিয়ে বললেন, 'চেটাং মেটাং বলিস না বাঁকারাম। যা! তোদের আমি জরিমানা করে দিলাম।'

পরদিন দেখা গেল বাঁকারাম ওর মতো মানুষদের নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে। গোরু, ছাগল ছিল সে তো আগেই মরে গিয়েছিল, সংসার বলতে একটা মাটির হাঁড়ি আর পেতে শোবার মাদুর।

অমন মাদুর ওরা নিজেই বোনে। মাদুর চাটাই বুনে নেয়। বাঁশের চাটাইয়ের উপর বেতের বাঁধনি দিয়ে ধান চাল রাখবার ডোল তৈরি করে। ঘর পড়ে গেলে বাঁশ দিয়ে, তালপাতা দিয়ে ঘর বেঁধে নেয়।

কোম্পানির লোক বলল, 'তোমার প্রজারা পালাল?'

'ব্যাটারা অতি পাজি', এ বলে রায় রাজা চুপ করে রইলেন।

সেইসময়েই খেতাকে মাসির বাড়ি রেখে গেল বাবা। বাবা, মা, তিন দাদা কোথায় যে গেল কে জানে। বলে গেল, লুক্কে লুক্কে থাকি গা। সময় হলে ফিরব।'

সেই থেকে এই সাতাত্তর সাল অবধি ওদের খোঁজ নেই। মাসির গাঁয়ে তেমন অভাব নেই। চারপাশে বন আর বন। বন থাকলে বৃষ্টি হবে, খনার বচন। এদিকে বৃষ্টি হয়েছিল, ধানও মন্দ হয়নি।

তা ছাড়া খেতার মেসো আর দুই দাদা যে কী ভালো লোকের কাছারিতে কাজ করে তা বলা যায় না। এই অমন মন্বন্তরেও ওরা রাতের আঁধারে চাল এনেছে, ধান এনেছে, খেতার মাসি ডোল ভরে ভরে তুলেছে।

খেতা ওর মাসির কাছে চিরকালই ভালো থাকে, তবে মনটা ওর মাঝেমধ্যে পোড়ে বইকি। মনে হয় গ্রামে ফিরে যাই। মাসি বলে গ্রামে নাকি এখনও ঘরকে ঘর শূন্য হয়ে আছে।

খেতা আজ সায়েবের কালীপুজো দেখতে যাবে বলে খুব ব্যস্ত। ও তাড়াতাড়ি বাছুর খুঁজতে গেল। বাছুর যদি ওই অজগর জঙ্গলে ঢোকে তাবে নির্ঘাত বাঘের পেটে যাবে।

ডাকাতের ভয়টাও কম নয়। কে জানে বীরে ডাকাত কে, আর ছিরে ডাকাত কে! তবে কোম্পানি যেদিন থেকে খাজনা তুলছে তার আগে থেকেই ডাকাতে ডাকাতে দেশ যেন ছেয়ে গেছে।

কর্তাদাদা তো সেই জন্যেই বলে দেশটা পাপে ভরে গেছে। কর্তাদাদা যে রোজ নামকীর্তন করে তাতে নাকি পাপ কমে যায়।

বনে ঢুকতে প্রথমটা খেতার ভয় করেনি। পউষের শীতে আর যাই বলো সাপের ভয় থাকে না। সাপগুলো সব পাতালে, গাছের কোটরে, গর্তে, ইটের পাঁজায় সেঁধিয়ে গিয়ে ঘুমোয়।

এসময় ভয় যাঁকে তিনি চিতাবাঘ। বড় বাঘ সদাসর্বদা বনে ঘেঁষে না। বড় বাঘ ঘোরেফেরে বড় জঙ্গলে। সেই যে বড় গাঙ, যার নাম পদ্মা, তার কাছাকাছি কী বড় বড় জঙ্গল! সেখানে হরিণ খেয়ে বড় বাঘ সুখে থাকে।

চিতাবাঘের মতো পাজি আর কে আছে বলো। গাছে উঠবে, ঘরের চালে

উঠবে, সাঁঝপিদিম জ্বলতে না জ্বলতে গেরস্তবাড়ির কানাচে সেঁধোবে। তারপর ছাগলটা হাঁসটা, নিদেনপক্ষে কুকুরটা নেবে। গাঁয়ে কুকুর অমন অনেক থাকে। গেরস্ত যা দু মুঠো দেয় তাই খেয়ে গ্রাম পাহারা দেয়।

চিতাবাঘের ওই কুকুর বেজায় পছন্দ। তাই তো মাসি বলে, সায়েবরা কাশিমবাজারের, বানঝাটিয়ায় কুঠিতে যে কুকুরগুলো রেখেছে তাদের গলায়
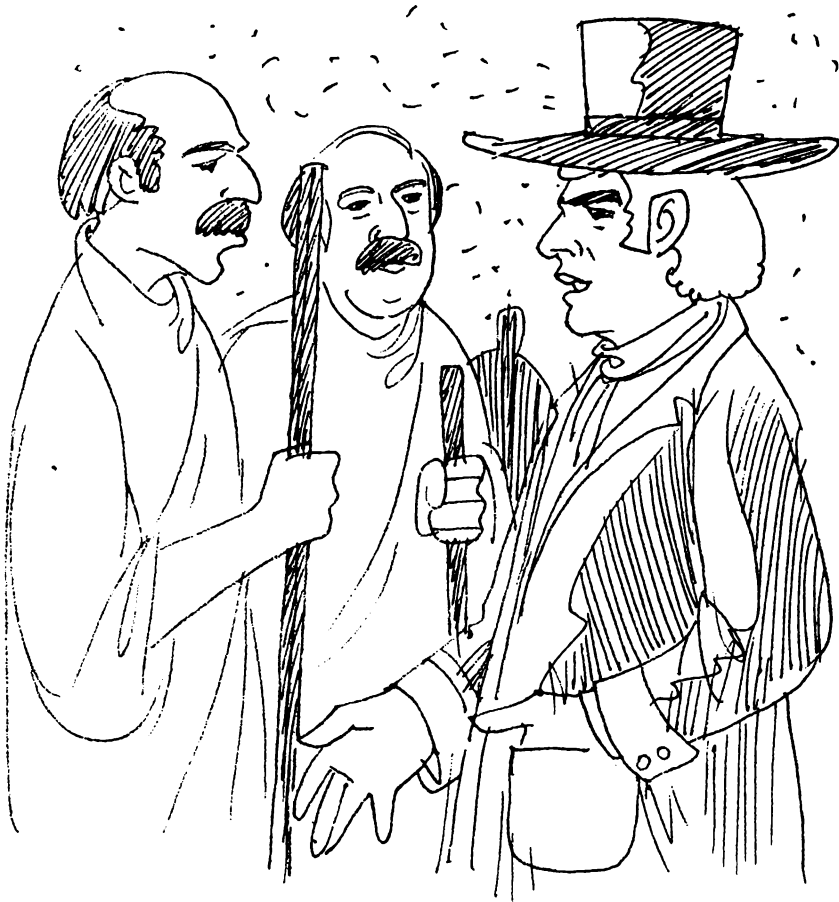
পেতলের পাত পরানো। চিতাবাঘ যে ঝপ করে দাঁত বসাবে আর খপ করে তুলে নেবে সে উপায় নেই।

এ বাছুরটা এখনও ছোট আছে। মাসির গোয়ালে যখন এক-একটা নতুন বাছুর বা ছাগলছানা হয়, মাসি সেগুলো খেতা বা থাকোর হেফাজতে দিয়ে দেয়। খাওয়ানো, নাওয়ানো, চরানো, গোয়ালে তোলা, সব ওদের কাজ।

বনের ভেতর গজাড়, শাল, পাঁকুর, তেঁতুল, শ্যাওড়া কতরকম যে গাছ!

খেতারা কোনোদিন উনোন ধরাবার কাঠের অভাব জানে না। বনে শুকনো ডালপালা পড়েই থাকে। যত পার কুড়িয়ে নাও।

'মদন রে! মদন রে!'

খেতা ডাকতে ডাকতে চলল। মদন, পবন, বদন—খেতা গোরু-বাছুরের নাম দেয় বেশ। অনেক দূরে যেন পাতা ছেঁড়ার শব্দ। বাছুরটা কি পাতা ছিঁড়ছে আর খাচ্ছে?

'মদন রে!

খেতা ডাকল। আর এমন সময় কে যেন বলল, 'কে রে ডাকাডাকি করে?'

খেতা বেজায় অবাক হল। এপাশে চায় ওপাশে চায়, হঠাৎ দেখল চারচৌকো ইটের ঘরের দাওয়ায় একটা লোক বসে আছে। যেমন লম্বা, তেমনি সিড়িঙ্গে রোগা। মাথার চুল কাঁধ অবধি। গায়ে একটা সত্যিকারের পিরান। খেতারা যেমন বুকের ওপর গামছাখানা আড় করে বেঁধে পিরান পরে সায়েব সাজে, তেমন নয়।

বোতাম আঁটা সত্যিকারের পিরান। তা ছাড়া কানে দুটো রুপোর বউলি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে জুতো। একহাতে একটা লাঠি, তার মাথাটা লোহা দিয়ে বাঁধানো। দেখে খেতা যেন ধড়ে প্রাণ পেল। লাঠির মাথায় লোহা আছে। তবে এ মানুষ, অপদেবদা নয়।

কে না জানে অপদেবতারা লোহা দেখলে ভয় পায়! লোকটা কলকেতে টান দিচ্ছিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল, 'আমায় ডাকছিস কেন?'

খেতারা সচরাচর কারুকে 'আপনি' বলে না, কিন্তু কর্তাদাদার শিক্ষাদীক্ষা অন্যরকম। খেতা বলল, 'আমি বাছুরটা খুঁজছি। আপনি হেথা বসে আছ তা কি আমি জানি, না আপনার নাম জানি?'

'বাছুরের নাম মদন?'

'আজ্ঞা।'

'ভালো ভালো। তা তুই কাদের ছেলা?'

'আমাদের নিবাস বুনোবিষ্ণুপুরে আজ্ঞা, হোই ওধারে।'

'কার ছেলে তুই?'

খেতা বাবার নাম বলল। লোকটা এখন হাসল। বলল, 'তাই বল। তা তোর মেসোর বাড়িতে আমি অতিথি হব আজ।'

'অতিথি হবে আপনি?'

'হ্যাঁ। তোর কত্তাদাদা আমার গুরু হয় যি। যা, বলগা যেয়ে মদন ঢালী আজ আপনার চরণ ধরতে আসবে।'

'এখনই?'

'না না, 'সাঁঝ হোক, আঁধার হোক, তা বাদে যাব। মাসি যানি ভাত রেঁধে রাখে।'

'সায়েব আজ কালীপুজো করবে, আপনি যাবে না দেখতে?'

'না না। সায়েব দেখলে আমি বড় ডরাই। আর দেখ, যা বলবি শুধু কত্তাদাদা আর মাসির কানে। কেও যেন জানে না।'

খেতা অবাক হয়ে ঘাড় নাড়ল। লোকটা বলল, 'আমি বলে বসে আছি ডাকাত ধরব বলে, জানলি? আমি হলাম যেয়ে কোম্পানির পেয়াদা।'

'তবে সায়েব দেখে ডরাও কেন?'

'সে তুই কী জানবি? সিদিনের ছোঁড়া? যা যা, ঘর যা!'

খেতা বাছুরটা খুঁজে নিয়ে বাড়ি চলে এল। কর্তাদাদা তো ওর কথা শুনে মহা খুশি। বলল, 'মাসিকে বল গা ভাত বেন্নন রেঁধে থুয়ে যানি বেলা থাকতে চলে যায়।'

'আপনি কি পওরা দেবে?'

'দেখি কে পওরা দেয়!'

কর্তা দাদা হাসল। কর্তাদাদা সামান্য লোক নয়। সবাই তো বলে কর্তাদাদা মন্ত্র জানে। গাছ চালাতে পারে। বান মেরে পুকুরের মাছ মেরে দিতে পারে। পিদিম মন্ত্র পড়ে চেলে দিতে পারে। সে পিদিম ভেসে ভেসে দূর গ্রামে গিয়ে শত্রুর ঘরদোর জ্বালিয়ে দিতে পারে।

হয়তো একটা ভূতপ্রেতকেই কর্তাদাদা মন্তর পড়ে রেখে দেবে। ভূতটা এসে মাসির হেঁসেল পাহারা দেবে।

খেতার হঠাৎ কী মনে হল। বলল, 'ও কত্তাদাদা! আমার বাবা এলে আমি চলে যাব যি, তা আপনি আমায় মন্তরটা দেখাবে না? আমি তোমার পায়ে নিত্য তেল মালিশ করি, তোমার মাজা টিপি!'

'কোন মন্তরটা?'

'সেই ডাকাত ধরার মন্তরটা!'

'মন্তর শিখে কী করবি?'

'বীরে ডাকাত, ছিরে ডাকাত দুব্যাটাকে ধরে গামোছা বেঁধে নে যাব।'

'দেব দেব, তোকেই মন্তর দেব।'

'থাকোটাকে দিয়ো না।'

'ধুর, ওটা মেয়েমানুষ, ভাত রাঁধবে, বাসন মাজবে। ওকে কখনো মন্তর দিই?'

তিন

মাসি যেমন হুসহাস করে গিয়েছিল তেমনি হুসহাস করে বামুনবাড়ি থেকে ফিরে এল। সঙ্গে হরিচরণের মা আর পিসি। শাশুড়ি আসছে বলে থাকো তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিল। হরিচরণ দাওয়ায় সভ্যভব্য হয়ে বসল।

মাসির ধামায় মুগকলাই, একটা বড় লাউ। লাউটা হরিচরণের মা বেয়ানের জন্যে এনেছে। মাসি বাড়ি ঢুকতেই খেতা বলল, 'ইদিকে শোন মাসি।'

'দাঁড়া বাছা, টুকুন জিরিয়ে নিই।'

'জিরোবি পরে, এখন শোন।'

খেতা মদন ঢালীর কথা বলল। মাসি তখন খেতাকে অবাক করে বলল, 'পুকুর ধারে চল বাছা, তোর ব্যাগ্যোতা করি।'

মাসি কারও ব্যাগ্যোতা করে নাকি? খেতার তো মনে পড়ে না।

পুকুরধারে গিয়ে মাসি চুপে চুপে আঁচল খুলে খেতার হাতে একটা জিনিস দিল।

লোহা আর তামা মেশানো ঢ্যাক পয়সা। একটা জলজ্যান্ত গোটা পয়সা।

'মোকে দিচ্ছ?'

'নয়তো কি থাকোটাকে দেব?'

একটা পয়সা আবার খেতারা কবে হাতে পায়! এখনও ওরা শাকটা, মুলোটা, লঙ্কা, লাউটা বাড়িতে, 'আরজায়;' বনজঙ্গল থেকে জ্বালানি আনে। পুকুর-নদী-বিল থেকে মাছ কাঁকড়া গুগলি কচ্ছপ ধরে। পাখি সজারু খরা শিকার করে।

বাকি রইল তেলটুকু, নুনটুকু, পরনের কাপড়টা গামছাটা।

খেতার অবশ্য মেসো আছে। যাদের মেসো নেই তারা গ্রামের মুনিববাড়ি, বামুন পাড়া, কায়েতপাড়া, সব জায়গায় যায়। জমি চষে, ধান পায়। ধান ভানে, চাল করে। জমি তাদের নয়, তাই আকালে বানে খরায় উপোস করে।

ওরা জঙ্গল কাটে, মাটি কোপায়, নালা কেটে জল বইয়ে দেয়, পুকুর খোঁড়ে, বর্ষা গেলেই বাড়ি বাড়ি দাওয়া বাঁধে, ঘর ছায়।

পয়সা পায় না, কড়ি পায়। এই রাঙা রাঙা তেলতেলে কড়ি।

কাপড় পায়, গামছা পায়। যখন পায় না তখন কড়ি দিয়ে কলুবাড়ি থেকে তেল কেনে। জোলাপাড়া থেকে কাপড় গামছা আনে।

পয়সা আবার কে কবে হাতে পায়? কর্তাদাদা তো বলে পয়সা ছিল সেই কবে, সেই সত্য যুগে, যখন দেশে অন্যরকম নবাব ছিল।

একটা পয়সা। আহা, এমন একটা পয়সা দিলে বুঝি গিরিকাকা ছোট একটা রথ বানিয়ে দেয় খেতাকে। রথের দিনে রথ টানতে মজা কত!

'পয়সাটা তোরে দিছি খেতা, শোন, মদন ঢালী মানুষ সামান্য লয়। উনি যখন রইবে, তোর কর্তাদাদার সঙ্গে কথা কইবে ততক্ষণ তুই যেয়ে চালে উঠবি গা!'

'চালে?'

'হ্যাঁ। লুক্কে থাকবি। শুনবি কী বলে ওরা। তা বাদে যতক্ষণ দেখবি মেসো আসতেছে, ততক্ষণ লুক্কে রইবি। মেসো কী বলে, উনি কী বলে, কত্তাদাদা কী বলে সব শুনবি। শুধু মোকে বলবি, আর কারেও লয়। যদি পারিস তবে তোকে ।ট্টা সামিগ্রি দেব।'

'কী দেবে!'

মাসি বিরসবদনে বলল, 'যাকে পরান দিয়ে এখেছ সেই সামিগ্রি—তোমার বাপের সেই সড়কি গাছা! না দিলে কামারশালে যেয়ে ধন্না দেবে তো?'

খেতার বুকটা ধুকপুক করতে লাগল। মাসি কেমন করে জানল কামারশালায় ধন্না দেয় খেতা? নিশ্চয় কামারজ্যাঠার ছেলে ফেলারাম বলে দিয়েছে।

'তোর কত্তাদাদার বুদ্ধি আর ভালো হবে না,' বলে মাসি চলে গেল।

দেখো কাণ্ড! কর্তাদাদাই যে খেতাকে বুদ্ধিটা দিয়েছিল, বলেছিল নিজের হাতে সড়কি একটা থাকলে খুব ভালো হয়।

কর্তাদাদা জানে। কর্তাদাদা তো সেই কবে যেন বর্গিদের সঙ্গে লড়েছিল। সে যুদ্ধ হয়েছিল ন-দশ বছর ধরে। যে ছেলেগুলো ছোট ছিল, যুদ্ধ করতে করতে তাদের গোঁফ গজিয়ে গিয়েছিল।

সেই সময়কার মানুষ কর্তাদাদা। এখনও যদি যুদ্ধের গল্প করে তা হলে খেতার বুকের ঠিক ভেতরটা চমকে ওঠে।

কর্তাদাদা বলে, 'কী যুদ্ধ, কী যুদ্ধ! বালুচরের হোথা সে ধানখেতে পাকা ধানের গন্ধ ম ম করতেছে। বর্গিরা শুধু বলে, 'হর হর মহাদেও' আর ধানখেতে ঘোড়া ঢুকিয়ে দেয়; তখন তোর বাপের কাকা, 'উই ছিচরণ দাদা বললে, হা রে! তোরা ধানের চালে ভাত খাসনি? মোরা বললাম, নিচ্চয়। তিনি বললে, হাতে সড়কি নি? মোরা বললাম—নিচ্চয়! তখন উনি মাথায় ফেটা বেঁধে নিলে আর বললে, সড়কি হাতে চেপে ধরে চল যেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

'তারপর?'

'আমি যানি ডর খেলাম। শুধালাম, ছিচরণ দাদা, ওরা যে অগণন! দাদা বললে, মোরা যে বীরবংশী? চল, মোরা যেয়ে বানের জলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি। একথা বলে, গায়ে মাথায় ধুলো মেখে উনি যখন হাঁকুর পাড়লে, কুড়ুল—বুনোবিষ্টুপুর—মাথলা—সাভাস গেরামের নামে তোরা চল রে! তখন আমার বুকের ভেতর যানি কেঁপে গেল।'

'তা বাদে? ও কত্তাদাদা, তা বাদে?'

'তা বাদে মোরা যেয়ে বানের জলের মতো ঝাঁপ দিলাম।'

'তা বাদে?'

'মোরা গেলাম ভাগীরথীর বানের মতো, ওরা এল সমুদ্দুরের বানের মতো। মোদের রক্তে ওদের রক্তে বাতচরের মাটি আঙিয়ে দিয়ে এলাম সিদিন। ওইদিনের যুদ্ধে মোদের গেরাম তোদের গেরামের কতজন মরেছিল তার লেখাজোখা নি খেতা! নবাব য্যাখন মোকে খেতাব দেলে ত্যাখন আমি তাঁর দেওয়া পাগড়ি নিই, মোর আঙুল বেঁকে যেতে থাকল। ছিচরণদাদা, করালী ঢালী, মোহনকালী সাঁতরা যদি থাকত, তবে নবাব তাদেরকে সোনার তাজ

দেত। আমি তাদের পায়ের নখটা বটি! তাই যেমুছেমু শিরপা নে চলে এলাম।'

কর্তাদাদা এখন শুধু কীর্তন গায় আর হরিনাম করে। তবু কর্তাদাদা ওকে প্রায়ই বলে, 'মাসির থে তোর বাপের সড়কিটা যদি চে নিতে পারিস খেতা, বেশ হয়।'

মাসি বলল সড়কিটা দেবে।

কিন্তু মদন ঢালী কর্তাদাদাকে কী বলে তাও শুনতে হবে।

খেতা সাত-পাঁচ ভেবে বাড়ির ভেতরে গেল। ভেতরে গিয়ে ওর হাসি পেল। থাকোর শাশুড়ি থাকোর চুলে তেলজল দিয়ে থাবড়ে থাবড়ে একটা বড় খোঁপা বেঁধেছে। তেলজলে গামছা ভিজিয়ে থাকোর মুখ মুছে একটা এত বড় টিপ পরিয়ে দিয়েছে। থাকো বলল, 'পায়ে মল পরব না?'

শাশুড়ি বলল, 'তা আর পরবে না? দেশজোড়া আকাল, তুমি পেতলের মল বাজাতে বাজাতে যাবে না? তা বাদে ডাকাত এসে পড়ুক।'

থাকোর শাশুড়ির ডাকাতের ভয় খুব।

খেতা স্নান করল। মাসি অনেকদিন বাদে তেল মেখে, সরষের খোল দিয়ে গা মেজে স্নান করল। কর্তাদাদার ভাত বেড়ে থাকো দাওয়ায় দিল।

ওরা সবাই পউষের রোদে পিঠ দিয়ে উঠোনে বসে ভাত খেল। থাকোটা শুধু ঘোমটা কেড়ে পিছন ফি'রে খেতে বসল। হরিচরণ আছে, শাশুড়ি আছে, লজ্জা করতে হয়।

ল্যাটা মাছ, গজার মাছ, বেগুন লঙ্কা দিয়ে ঝাল হয়েছে, ময়া মাছের টক। মটর ডাল ন্যাকড়া বেঁধে ভাতে দেওয়া হয়েছিল, মাসি সেটা শুকনো লঙ্কা-পোড়া আর তেল দিয়ে মেখেছে। হরিচরণের পিসি কলাপাতা মুড়ে একটা নতুন জিনিস এনেছে।

খরার মাংস তেঁতুল-লঙ্কায় মজিয়ে শুকনো করে রেঁধেছে। মাসি বলল, 'কেমন করে মজালি?'

পিসি কথাই বলল না। থাকো বলে পিসি কখনো কেমন করে বেন্নন রাঁধল, কোথা থেকে ফলপাকুড়টা পেল তা বলতে চায় না।

খেয়েদেয়ে সবাই হাতে হাতে বাসন মাজল। মাসি জল তুলে জালা ভরে রাখল। আজ মেসো আসবে, কানাই বলাই আসবে। কালীপুজো দেখতে এখন এক ক্রোশ যাবে, এক ক্রোশ আসবে মাসি।

তারপর রাঁধতে বসবে। মেসো এলে বড় ভালো লাগে খেতার। মেসো যখন আসে তখনই রাতে রান্নাবান্না হয়। নইলে মাসি দুবেলা রাঁধতে চায় না।

হাঁস, ছাগল, গোরু-বাছুর সব ঘরে তুলল মাসি, খেতা আর থাকো। মাসির ঘরখানা খুব বড়। চারচালা ঘর, মেসো আর খেতার বাবা বেঁধেছিল। ঘরের মাঝামাঝি থেকে দেওয়াল পর্যন্ত বাঁশের বেড়া দেওয়া। ঘরখানা দুভাগ করা, দুদিকেই বাঁশের মাচা।

ওই মাচা ওদের খাট-পালঙ্ক। মাচার ওপর চেটাই পাতা। আর তার ওপর মোটা গড়ান বেছানো। গড়ানের নীচে খড় পুরু করে পাতা।

পউষ মাসের শীতে খড়ের গরমে খুব আরাম। পিঠের নীচে খড়। পায়ে পুরু কাঁথা। মাসি যে মাচায় শোয় তার নীচে মাটিতে একটা সিন্দুক বসানো আছে। সিন্দুকে কী থাকে খেতা তা জানে না। মাসি বলে, 'এই চালটা ডালটা, আর কী রইবে বল?'

মাসির ঘরে মাসি কুলুপ আঁটল। মাসি কুলুপ বলে না, বলে কুলুশ।

তারপর বলল, 'খেতা ঘর মুনে রইবি, জানিস?'

'বলেছি ত রইব।'

খেতার এখন কান্না এল। কেন ওরা সবাই যাচ্ছে? কেন খেতা একা থাকবে? কিন্তু মাসি ওর দিকে কটমট করে তাকাল। মাসির পরনে ক্ষার দিয়ে কাচা কাপড়, হাতে মাটির কটকটে শক্ত রাঙা কড়। মাথায় মোটা সিঁদুর।

থাকোর শাশুড়ি বলল, 'নক্কি ছেলে খেতা। তু কাঁদিস না খেতা। তোরে আমি এট্টা নারকেল আর ছাতুর লাডু দে যাব। এবার আনতাম বাপ, তা সায়েবের সাথে দেখ গা অগণন পাক-প্যায়দা-লস্কর। তারা কানাত ফেলেছে কত বড় দেখে এলাম যি। তারা থাকে বলে সামিগ্রি জোগাতে যেয়ে বড় হায়রান হয়েছি বাপ।'

ওরা চলে গেল।

তারপর একসময় চারদিক ছায়া ছায়া করে সন্ধে নামল। শীতের সন্ধে তাড়াতাড়িই নামে। সন্ধে হতে না হতে মেসো আর কানাই বলাই এসে পড়ল। বলল, 'মাসি কোথা খেতা?'

'সায়েব কালীপুজো করছে তাই দেখতে গেছে।'

'তুই গেলি না?'

'ঘর মুনতে বলে গেছে।'

'তা ভালো, তা ভালো। তা মাসি ভাত রাঁধবে না?'

'এসে রাঁধবে।'

'তা আমি তো এসে গেছি। তুই যাবি নাকি? যাবি তো যা!'

'না। মাসি মারবে।'

'তা ভালো, তা ভালো। এই নে।'

মেসো গামছার বাঁধন খুলে খেতাকে দুখানা বড় বড় ক্ষীরের ছাঁচ দিল। বলল, 'খেয়ে ঘুমো গে যা।'

খেতা বলল, 'আমি মাসির কাছে শোব আজ। তা দেখো, রান্না হলে মোকে জাগিয়ে দিয়ো।'

'দেব রে দেব।'

ওরা চিঁড়ে আর ক্ষীরের ছাঁচ খেল, জল খেল। তারপর কর্তাদাদার ঘরে

গেল। যাবার আগে কানাই উঠোনে একটা বড় মশাল পুঁতে জ্বেলে দিয়ে গেল।

কাঁঠালের আঠা, গন্ধক, এইসব দিয়ে মাসি বছরভোর মশাল দিয়ে করে রেখে দেয়। আগুন হেঁসেলে সর্বদা থাকে। শুধু ঝড় এলে আগুনে জল ঢালে মাসি। ঝড় এলে জ্বলন্ত কাঠকয়লার ফুলকি উড়ে পড়লে ঘর জ্বলে যায়।

নয়তো মাসির উনোনের গর্তে সবসময় কাঠকয়লার গনগনে আগুন ছাইচাপা থাকে। চকমকি পাথর তো সবসময় হাতের কাছে থাকে না যে ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালবে মাসি?

মশালটা জ্বেলে দিয়ে গেল কানাই। খুব আলো হয় মাসির তৈরি মশালে। চারদিক রোশনাই হয়। এমন আলো দেখলে শেয়াল বলো, হুড়ার বলো, এমনকী চিতাবাঘও কাছে ঘেঁষে না।

ওরা চলে গেল আর খেতা উঠে পড়ল। হাতে হাতে পাওয়া একটা পয়সা এখনও ওর ট্যাঁকে। গায়ে বেশ করে দোলাইটা জড়িয়ে নিল; তারপর ঘরের দোর ভেজাল।

গোয়ালঘরের পেছনে বাঁশের খুঁটি। খেতা খুঁটি ধরে ওপরে উঠল। তারপর খড়ের চালে মুখ ডুবিয়ে আস্তে আস্তে খড় ফাঁক করতে লাগল।

চার

কর্তাদাদা মাচার ওপর বসে আছে। কর্তাদাদার পাশে সেই লোকটা, মদন ঢালী। মেসো, কানাইদাদা, বলাইদাদা আর ফেলার বাবা গিরি কামার। কর্তাদাদা বলছে, 'আরে সায়েব তো সবাই। তা ব্যাটাদের গায়ে পিরেন আর পায়ে জুতো দেখলেই বলবি সায়েব!'

'পান্তাসায়েবের চেলা লয় কো!'

ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি একবার প্রাণের ভয়ে না নবাবের ভয়ে মুদির দোকানে লুকিয়েছিল। মুদি হেস্টিংসকে পান্তাভাত আর কাঁচালঙ্কা খাইয়ে প্রাণ বাঁচায়। সেই থেকে খেতারা হেস্টিংসকে পান্তাসায়েব বলে।

'কেমন করে জানলি পান্তাসায়েবের চেলা লয়?'

'আরে, খবর না লিয়ে কি আসা করেছি?' মেসো একটু বিরক্ত হয়ে কর্তাদাদাকে বলল।

মদন ঢালী একটু হাসল। বলল, 'আমার খবর আরেকরকম।'

'কীরকম হে মদন?'

মদন ঢালী আঙুল গুনে গুনে বলল, 'এট্টা খবর সায়েব এয়েছে খবর নিতে। শিরোমণি কত্তার বড়ছেলা খবর রাখতেছে কারে কারে ডাকাত বলে সন্দ করে।'

কর্তাদাদা চোখ বুজে বলল, 'বড় ছেলেটা? তা তাঁরে একবার গোলোক দেখ্যে দিলে হয়? হরি বলো মন।'

খেতার চোখ গোল গোল হয়ে গেল। হাত-পা বেঁধে চার প্রহর উপোসী

রাখার নাম গোলোক দেখানো।

'আর খবর, এই সায়েব এ মৌজা হতে তিন হাজার টাকা খাজনা তুলেছে। আর খবর হল কালীপুজো ছলা মাত্র। সায়েব কাল খাজনা নে কলকাতা ফিরবে। সঙ্গে পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ রইবে তিরিশজন।'

'তিরিশজন!'

'আজ্ঞা তিরিশজনের মধ্যে বিশজন আপোনারই আপনজন।'

মদন ঢালী হাতজোড় করে বলল, 'এ অধীনের চাকরি এই কম্ম যি! সায়েবেরা এখন দেশের দেওয়ান। কোম্পানি দেওয়ানি নিলে যতক্ষণ, ততক্ষণ পাইক প্যায়াদা চাই। যেমন তেমন হলি চলে না। লড়ুয়ে পাইক প্যায়দা চাই। তা মদন ঢালী কোম্পানির কাছারিতে প্যায়দা পাইক নে আসে।'

'হরি বলো মন!'

'এই দেখেন গা খেতা নামে যি ছেলাটা, ওর বাপ, ভাই, কাকা, জ্যেঠা, সব প্যায়দা হয়ে এয়েছে। আরও প্যায়দা সব গে কেঁতুলে, নিব্‌লে, আঁবুই, সরাসে, এই চারখানা গেরামে আপোনার যত জ্ঞাত গুষ্টি আছে তারা সবাই।'

'সবার হাতে সড়কি আছে?'

'আজ্ঞা লাঠি সড়কি বিনে কি প্যায়দা চলতে আছে? এক ব্যাটার কাঁধে আবার বন্দুক একখানা।'

'হরি বলো মন! তা কাল তালে যাত্রা কখন?'

'ভোরে।'

'তবে এট্টা সংকীর্তনের দল চাই যে?'

'সংকীর্তনের দল?'

ইদিক হতে ওনারা যাচ্ছে, সাথে সাথে দলটা যাবে। মানকড়ার কাছে এক গেরামে কীর্তনের বায়না হয়েছে। তা দিনকাল বড় মন্দ তো? পথে ডাকাতের ভয়। সায়েবের প্যায়দা সঙ্গে রইলে ভয়ডরটা কম থাকে মনে। এট্টা পালকি।'

'পালকি কী হবে?'

কর্তাদাদা মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'নন্দ কামার আমার চে কয় পত্তুরের ছোট— মোরা কি হেঁটে যাব?'

'আপনি যাবে?'

'কুটুমবাড়ি যাব না?'

খেতাব মেসো এইসময় গলা খেঁখারি দিয়ে বলল, 'এট্টু গান ভাঁজলে হত না? খেতার মাসি এসে পড়লে পরে.....'

ওরা সবাই গাইতে লাগল, 'আরে হরি বলো মন রসনা আহা হরিনাম কেমন জানো না।'

খেতা চুপিসাড়ে নেমে এল। খেতার মাসি বাড়ি এসে সকলকে খেতে দিল। তারপর রাতে বিছানায় শুয়ে খেতা যখন সব কথা বলল কী হল জানো?

পিদিমটা নিভিয়ে দিয়ে খেতার মাসি খিকখিক করে হাসতে লাগল। বলল, 'কাল ওরা তোকে সাথে নেবেনিকো। তুই জিদ করে চলে যাসনি খেতা। কাল ঘরে থাকিস।'

খেতা কোনো কথাই বলল না। খেতার বাপ, ভাই, জ্যাঠা সকলে দেখতে পাবে তবু খেতা যাবে না? তা কখনো হয়?

পাঁচ

তারপর সে কী কাণ্ড, সে কী কাণ্ড!

সায়েব তো থলি বোঝাই রুপোর টাকা ঘোড়ার জিনপোশের নীচে বেঁধে রওনা হয়েছে। রাস্তাটা বেশ চওড়া। তাই পাশে পাশে কীর্তনের দল চলেছে বলে কোনো অসুবিধেই হয়নি।

দুই বুড়ো পালকি চড়ে চলেছে। তাদের ঝগড়া শুনতে শুনতেই সময় কেটে যাচ্ছে। যত চ্যাচায় খেতার কর্তাদাদা চ্যাচায় নন্দ-কামার।

'নন্দকুমার রাজার বাড়ি দুর্গোচ্ছব করিছিল, যতজনা মানুষ তত গণ্ড চিনির সাঁচ, মুড়কি আর দই দিয়েছিল।'

'ইঃ! তাই যদি দেবে তবে তুই পরের বছর দুর্গোচ্ছবে গেলি না কেন?'

'গেলাম না কেন? পায়ে ফোঁড়া হয়েছিল কার?'

'তোর ফোঁড়া হল যদি তবে তিন কোশ পথ হেঁটে মাছ চুরি করতে গিয়েছিল কে?'

সায়েবের পাশে পাশে চলেছে মদন ঢালী। পথটা মন্দ নয়। কখনো ধানখেতের পাশ দিয়ে, কখনো বা বাবলাবনের ভেতর দিয়ে চলেছে। ক্রমে ওরা জঙ্গলের কাছে এল। জঙ্গলের ওপারে মানকড়া আর মানকড়ার কাছের একটা গ্রামে কীর্তনের বায়না হয়েছে।

সায়েব বলল, 'বেলা বাড়ছে। বড় গরম। ছায়ায় গেলে হত।'

মদন ঢালী বলল, 'জঙ্গলে নাকি ডাকাতের ভয়?'

'এত লোক থাকতে ডাকাত আসে কখনো?'

'আসে না?'

'কেমন করে আসবে?'

মদন চেঁচিয়ে বলল, 'অ কর্তাদাদা, সায়েব বলতেছে ত্যাত লোক রইলে ডাকাত আসে কেমন করে?'

বুড়োকর্তা পালকি থেকে মুখ বের করে বলল, 'কী বলতেছে?'

'ডাকাত আসে কেমন করে?'

'কেন, এমনি করে?'

এই না বলে কর্তাদাদা পালকি থেকে নেমে পড়ল। নন্দ কামারও বলল, 'সায়েবটা তো মহা জ্বালালে দেখছি।'

নন্দ কামারও নেমে পড়ল। খেতার বুক পিপি করছিল, ও ছুটে গাছের আড়ালে গেল। তখন কর্তাদাদা আর নন্দ কামার দুই খুনখুনে বুড়ো কী করল জানো? মেয়েরা যেমন করে উলু দেয় ঠিক তেমনি করে মুখের ভেতর আঙুল নেড়ে জিভ ঘুরিয়ে হা রে রে রে বলে চেঁচিয়ে উঠল।

কর্তাদাদা বলল, 'বীরে ডাকাত ছিরে ডাকাতের নাম জানো না? মোরা মন্বন্তরে পোকমাকড়ের মতো মরে আছি আর তোমরা দেওয়ান হয়ে সব্বস্ব নিয়ে যাবা? মোরা কি কীটের মতো মরে থাকব?'

সায়েবের কাজ হল খাজনার টাকা নিয়ে যাওয়া। সে কি সহজে খাজনার টাকা ছেড়ে দেয়? সায়েব বলল, 'আমার হাতে বন্দুক আছে, তা ছাড়া তিরিশজন পেয়াদা। খাজনা আমি ছেড়ে দেব না।'

তিরিশজনের মধ্যে কুড়িজনই যখন কর্তাদাদার পাশে গিয়ে দাঁড়াল তখন সায়েব আর কী করে?

খেতার মেসোমশাই ঘোড়াগুলোর লাগাম কেড়ে নিয়ে বনে ছেড়ে দিল। মিহি গলায় বলল, 'সায়েব, এবার তুমি হেঁটে হেঁটে যাও! আমরা এবার গান গাইতে গাইতে চলে যাই!'

পালকিতে আবার দুই বুড়ো চড়ে বসল। মাঝে টাকার থলিগুলো রইল। আট-দশজন পেয়াদা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল পালকি নিয়ে ওরা ধানখেতের আল ধরে চলে যাচ্ছে। যারা এতক্ষণ গলার দুদিকে গামছা ঝুলিয়ে কোঁচা দুলিয়ে বাবড়ি চুল নাচিয়ে 'হরি বল হরি বল' গাইছিল তাদের চেহারা এখন অন্যরকম।

কোমরে গামছা বেঁধে, সড়কি আর লাঠি আকাশে নাচিয়ে ওরা কেমন নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে। ওরা গাইছে—

'বেপদে পড়িলে সবে ছিরের চরণ ধোর রে! বীরের চরণ ধোর রে!'

সবচেয়ে পেছনে একটা রোগা হ্যাংলা পেট-মোটা ছেলে চলেছে। সে-ই নাচছে সবচেয়ে জোরে জোরে লাফ মেরে।

সায়েব বলল, 'বুড়ো দুটো বীরে ডাকাত, ছিরে ডাকাত?'

পাইকরা বলল, 'আজ্ঞা, কলকাতা যেয়ে ভালো পাইক নে এসে ওদেরকে ধরা করাব।'

সায়েব বলল, 'চোপরাও! কী বলবে? দুটো বুড়ো আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল? তাই বলবে?'

বলতে বলতে কী হল জানো? পাইকরা হতভম্ব হয়ে দেখল সায়েব হো হো করে হাসছে আর হাসছে।

যাচ্ছেতাই ডাকাত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একটা কালো রঙের গাড়ি খুব জোরে এসে যেই বেঁকলো বাঁদিকে অমনি ধাক্কা লাগলো একটা সাইকেল ভ্যানের সঙ্গে। ভ্যানটা তো উল্টে গেল বটেই, গাড়িটাও ঘুরে গিয়ে উঠে গেল ফুটপাথে। একটা ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে লেগে গাড়িটার রেডিয়েটার ফেটে জল পড়তে লাগলো ঝরঝর করে।

এরকম দুর্ঘটনা হলেই রাস্তায় ভিড় জমে যায়। কিন্তু তার আগেই ঝড়ের বেগে গাড়ি থেকে নেমে এলো চারজন লোক। তারা চারজনেই পরে আছে খাকি প্যান্ট ও কুচকুচে কালো রঙের শার্ট। মুখে রুমাল বাঁধা। তারা পরপর তিনটে বোমা ফাটালো।

ঠিক মোড়ের মাথায় পাঁচতলা বাড়ির ছাদে টেনিস বল নিয়ে ফুটবল খেলছিল টোটো আর তার বন্ধুরা। মাঝে মাঝেই বলটা রাস্তায় পড়ে যায়।

তখন যে বলটা ফেলেছে, সে ছুটে নেমে যায় বলটা আনতে, আর অন্যরা পাঁচিলের কাছে এসে উঁকি দিয়ে রাস্তাটা দেখে।

সাইকেল ভ্যান আর কালো গাড়িটার ধাক্কা লাগার ঠিক আগের মুহূর্তেই টোটোদের বলটা পড়েছে রাস্তায়। টানটু দৌড়েছে বলটা আনতে, আর টোটোরা সাতজন রয়েছে পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে। সেইজন্য ওপর থেকে ওরা সব ব্যাপারটা দেখলো।

গাড়ি থেকে নেমেই যারা বোমা ছোঁড়ে, তারা নিশ্চয়ই ডাকাত। তার ওপরে ওদের মুখে আবার মুখোশের মতন রুমাল বাঁধা একজনের হাতে ভোজালি, একজনের হাতে কালো মতন কী যেন, নিশ্চয়ই রিভলভার।

প্রথম বোমার আওয়াজটা হতেই ওরা সবাই ভয় পেয়ে পেছিয়ে এসেছিল পাঁচিল থেকে। আবার ছুটে ফিরে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পরের দুটো বোমা ফাটার সময় ওরা ভয় পেল না। বরং টোটো তার বন্ধুদের সঙ্গে চোখাচোখি করলো। প্রত্যেকেরই চোখ বড় হয়ে গেছে আর ভুরু উঠে গেছে উঁচুতে। অর্থাৎ সত্যি সত্যি ওরা জ্যান্ত ডাকাতদের দেখেছে। ডাকাতরা সত্যি সত্যি ওদের চোখের সামনে বোমা ফাটাচ্ছে, ঠিক যেমন বইতে পড়া যায়।

বোমাগুলোর আওয়াজ যেমন সাংঘাতিক, সেই রকমই ধোঁয়া। ওপর থেকে ছোটোদের মনে হলো একটা মেঘ যেন রাস্তা ঢেকে দিয়েছে। তবে ডাকাতরা যে ট্রাম লাইনের মোড়ের দিকে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে ঠিকই। মেঘের তলা থেকে চারজনকে বেরিয়ে আসতে স্পষ্ট দেখতে পেল টোটোরা, তারপর সেখানে আর একটা বোমা ছুঁড়ে তারা আবার একটা মেঘ তৈরি করলো।

বাবুল বললো, টান্টুটা যদি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে?

টোটো বললো, ইস্, ডাকাতরা তো আমাদের বাড়ি অ্যাটাক করলো না? তবে কোন্ বাড়ি অ্যাটাক করবে বল্তো?

রণ বললো, নিশ্চয়ই মোড়ের মাথায় যে গয়নার দোকানটা আছে......

টোটো বললো, ঐ দ্যাখ, ছোটকাকা।

ট্রাম লাইনের মোড়ের দিক থেকে হেঁটে আসছেন টোটোর ছোটকাকা। বোমার আওয়াজে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

বাবুল বললো, আরিবাস! এইবার কী হবে দ্যাখ! পুলিশ এসে গেছে।

টোটো বললো, দারুণ ফাইট হবে ডাকাত আর পুলিশে।

রণ বললো, যদি আমাদের গায়ে গুলি লাগে? আয়, আমরা পাঁচিলের আড়ালে বসে পড়ি।

অন্য কেউ অবশ্য তার কথা গ্রাহ্য করলো না। বরং দারুণ কৌতূহল নিয়ে দেখতে লাগল আরও ঝুঁকে।

পাঁচতলার ছাদ থেকে ট্রাম লাইনের মোড় পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। এখান থেকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশখানা বাড়ি দূরে। সেখানে পুলিশের গাড়িটা এসেই থেমে গেল। তার থেকে টপাটপ সাত-আটজন পুলিশ নেমে সার বেঁধে দাঁড়ালো। একজন অফিসার রিভলভার সমেত ডান হাত তুলে কী যেন চেঁচিয়ে

বললেন, তা শোনা গেল না।

ডাকাতরা আরও চারটে বোমা ফাটাল পরপর। সেগুলো পুলিশের গায়ে লাগলো, না কার গায়ে লাগলো তা বোঝা গেল না। গোটা রাস্তা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। তারপর সব চুপচাপ। তার মানে বোমা কিংবা গুলিটুলির শব্দ শোনা গেল না, কিন্তু অনেকের চেঁচামেচি শোনা যেতে লাগলো ঠিকই।

বাবুল বললো, ডাকাতগুলো নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে।

টোটো বললো, অত সোজা নয়। ডাকাতরা শেষ পর্যন্ত ফাইট না করে ধরা দেয় না।

ধোঁয়া একটু কেটে যেতেই দেখা গেল, রাস্তার একদিকে ভিড় করে আছে অনেক লোক। আর একদিক থেকে অশ্বক্ষুরের মতন লাইন করে এগিয়ে আসছে পুলিশরা, মাঝখানে কেউ নেই।

টোটো বললো, একি! ডাকাতরা কোথায় গেল?

বাবুল বললো, ডাকাতগুলো হাওয়া।

কারুকে কিছু না বলে টোটো ছুটলো সিঁড়ির দিকে। অন্যেরাও দুর্দাড় করে অনুসরণ করলো তাকে। প্রায় হুড়মুড় করে ওরা নেমে এল নিচে, কিন্তু বাইরে বেরুতে পারলো না।

ওদের ফ্ল্যাট বাড়ির দরজার কাছে বেশ ভিড়। দারোয়ান ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কারুকে রাস্তায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না। টান্টু গো-বেচারা মুখ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুদের দেখেই কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে বললো, দেখ্ না, আমায় বাইরে যেতে দিল না, তাই বলটা আনতে পারি নি।

বাবুল্ দারোয়ানকে বললো, এখন দরজা খুলে দাও না, ডাকাতরা চলে গেছে।

সব ফ্ল্যাট বাড়িতেই যেমন একজন লোক থাকে যে নিজে নিজেই সকলের গার্জেন হয়ে যায়, এ বাড়িতেও সেরকম আছে রাজেনবাবু। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, না, দরজা খুলবো না। বাইরে পুলিশ ফায়ারিং করছে।

টোটো তার দলের দিকে ইশারা করলো চোখ দিয়ে, অর্থাৎ ছাদে। একটা দম্‌কা হাওয়ার মতন ওরা ফের উঠে এলো ছাদে। পাঁচিলের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখলো, তিনদিকের রাস্তা দিয়ে পিলপিল করে লোক ছুটে আসছে এ পাড়ার দিকে। সেই ভিড়ে পুলিশরা এলোমেলো ভাবে ঘুরছে, কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে অ্যাকসিডেন্ট করা কালো গাড়িটার পাশে।

ডাকাতদের কিন্তু সত্যি আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তারা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রণ বললো, ধুস্, কোনো ফাইট-ই দেখতে পেলুম না। শুধু কয়েকটা বোমার আওয়াজ।

বাবুল্ বললো, পুলিশগুলো কী রে, গুলি করতে পারলো না?

সুদীপ কম কথা বলে। সে বললো, গুলি করেছিল, ফাটেনি।

অজয় বললো, ডাকাতগুলো কোথায় গেল বল্ তো? নিশ্চয়ই এ পাড়ারই কোন বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

টোটো বললো, আমাদের দারোয়ানটা ক্যাবলা। আগেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। নইলে ডাকাতরা বেশ আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পারতো!

বাবুল্ বললো, ঐ তিনতলার রাজেনবাবুটার জন্যই তো! নইলে আমরা বেশ কাছ থেকে ডাকাতদের দেখতুম।

রণ বললো, এ বাড়িতে ঢুকলে যদি আমাদের মারতো?

টোটো বললো, অত সোজা নয়। আমরা বুঝি মারতে জানি না।

দড়াম করে শব্দ হলো ছাদের দরজায়। দু'জন পুলিশ ওপরে উঠে এসেছে। তার মধ্যে একজনের হাতে রিভলভার।

ওদের কিছু জিজ্ঞেস না করেই পুলিশ ঘুরে দেখলো সারা ছাদ। জলের ট্যাঙ্কের তলায় উঁকি মারলো। তারপর আবার ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে একজন বললো, খোকা তোমরা কিছু দেখেছো? কোন্ বাড়িতে লোক ঢুকেছে, কিংবা কোন্ দিক দিয়ে পালালো...

ওদের মধ্যে কে প্রথমে উত্তর দেবে, তাই সবাই সবার মুখের দিকে তাকালো। টোটো ওদের লিডার। কিন্তু পুলিশ এসে প্রথমেই ওদের কিছু জিজ্ঞেস

না করে ছাদ খুঁজে দেখছে বলে টোটো চটে গেছে। সে বললো, রাস্তায় দুটো হাইড্রান্টের ঢাকনা নেই। দেখুন, ওর মধ্যেই ঢুকে পড়েছে নিশ্চয়ই।

একঝাঁক পাখির ডাকের মতন ওরা হেসে উঠলো।

রিভলভার-হাতে পুলিশ অফিসারটি এবারে এগিয়ে এসে ওদের পাশ দিয়ে উঁকি মারলো রাস্তায়। অন্য পুলিশটি টোটোর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে ভালো করে দেখলো। তারপর বললো, পাকা ছেলে, অ্যাঁ! কোন্ ক্লাসে পড়ো?

টোটো বললো, ক্লাস এইট!

—কোন্ স্কুল?

—বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট।

—নাম কি তোমার?

—তিমিরবরণ সেন?

—তোমরা অনেকক্ষণ থেকে ছাদে আছো?

—হ্যাঁ।

—তোমায় থানায় যেতে হবে। তোমাকে স্টেটমেন্ট দিতে হবে!

টোটো সগর্বে বন্ধুদের দিকে তাকালো। আজ সকালে সে কার মুখ দেখে উঠেছে। এতবড় সম্মান দেওয়া হচ্ছে তাকে। এখন তাকে পুলিশের সঙ্গে থানায় গিয়ে ডাকাত ধরার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।

রিভলভার হাতে পুলিশটি বললো, না-না, এইটুকু ছেলেকে থানায় নিয়ে যাবার কী দরকার? যা জিজ্ঞেস করার এখানেই....

টোটো খুব বিরক্তভাবে সেই পুলিশটির দিকে তাকালো। এ লোকটা তো বড্ড বোকা। টোটো থানায় যেতে রাজি আছে, তাও বলে কিনা নিয়ে যাবার দরকার নেই। টোটোও জানে, কী করে এদের শায়েস্তা করতে হয়।

সেই পুলিশটি বললো, তোমরা এখান থেকে ঠিক কী দেখেছো বলো তো?

টোটো উদাসীন ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি ঘুড়ির প্যাঁচ লড়া দেখছিলুম।

—বোমার শব্দ শুনে রাস্তার দিকে দেখো নি?

—ওগুলো বোমা বুঝি? আমি তো ভেবেছিলাম কালীপটকা!

অন্য পুলিশটি বললো, দেখলেন তো কী রকম বিচ্ছু ছেলে? থানায় না নিয়ে গেলে মুখ খুলবে না।

বাবুল্ বললো, শুধু ধোঁয়া দেখেছি।

সেই পুলিশটি এবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, তাহলে একজনকে থানায় নিয়ে যাওয়া যাক্। এখান থেকে খুব ক্লিয়ার ভিউ পাবার কথা।

টোটোকে কিন্তু তখুনি থানায় নিয়ে যাওয়া হলো না। একজন পুলিশ তার ছোটকাকাকে বলে গেল টোটোকে নিয়ে তৈরি থাকতে।

দু'ঘণ্টা ধরে পাড়ার সমস্ত বাড়ি সার্চ করা হলো। কাগজের লোক এসে ছবি

নিল কালো গাড়িটার। সাইকেল ভ্যানটার মালিকের গায়ে একটু আধটু চোট লেগেছে, বেশি ক্ষতি হয়নি। তবে তার ভ্যানের ভেতরের একুশটা মুরগির ডিম ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। ডাকাতদের বোমার আঘাতেও কেউ আহত হয় নি। ওরা আসলে ধোঁয়ার আড়ালে পালাবার জন্যই বোমা ছুঁড়েছিল।

কিন্তু ডাকাতগুলো পালালো কী করে? অন্যদিকে ছিল পুলিশ, আর একদিকে অনেক লোকের ভিড়, সেদিক দিয়ে যে ডাকাতরা পালায় নি, তা সবাই বলেছে এক বাক্যে। কোনো বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু এ পাড়ায় সব ভালো ভালো লোক থাকে, কেউ তো ডাকাতদের আশ্রয় দেবে না। আর, কোনো বাড়ির মধ্যে জোর করে ঢুকে পড়লেও একেবারে উবে যাবে কী করে?

ডাকাতদের সম্পর্কে শোনা গেল কত রকম যে গল্প! কেউ বললো, ওরা চম্বলের ডাকাত। কেউ বললো দিল্লীর। কেউ বললো, ওরা ব্যাঙ্ক-ডাকাত, কেউ বললো, একটু আগে পাঁচটা খুন করেছে।

একমাত্র টোটোর ছোটকাকাই পুলিশের কাছ থেকে শুনে এসেছে পাকা খবর। ওরা একেবারে নভিস্ ডাকাত। আর ওদের ভাগ্যটাও খারাপ। ওরা নিউ আলিপুরে একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে ঢুকেছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। ব্যাঙ্কের কর্মচারী ও পাড়ার লোকেরা ওদের দু'জন সঙ্গীকে ধরে ফেলে। বেগতিক দেখে বাকিরা গাড়িতে উঠে পালাচ্ছিল। কিন্তু কাছেই ছিল একটা পুলিশের গাড়ি। সেই গাড়ি ওদের তাড়া করলো। কলকাতার অনেক রাস্তা ঘুরে শেষ পর্যন্ত এ পাড়াতেই অ্যাকসিডেন্ট করলো ওদের গাড়ি। তারপর যে কী করে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

টোটোদের আর খেলা হলো না। টান্টুর সঙ্গে ওরা সবাই মিলে অনেক খুঁজেও আর টেনিস বলটা পায় নি। এত লোকের ভিড়ে কে বলটা নিয়েছে কে জানে? টান্টুর খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। যার জন্য বল হারায়, তাকেই পরের বলটা কিনে দিতে হয়। বেচারা টান্টু, গত সপ্তাহেই ওর আর একটা বল হারিয়েছিল।

টোটো ভেবেছিল, সে একলা একলা পুলিশের গাড়ি চেপে বীরের মতন থানায় যাবে। পাড়ার সব লোক তাকে দেখবে। সেরকম কিছুই হলো না। পুলিশের গাড়ি চলে গেল আগেই। সন্ধেবেলা ছোটকাকা মিনিবাসে করে টোটোকে নিয়ে গেলেন লালবাজারে।

বাস থেকে নেমে ছোটকাকা বললেন, কী ঝামেলা পাকালি বল তো? এখন কতক্ষণে ছাড়বে কে জানে? কেন ছাদে খেলতে গিয়েছিলি? তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিশ আমাকে ধরলো না, আর তোকে ধরলো?

টোটো গম্ভীর ভাবে বললো, তুমি রাস্তায় থাকলেও তুমি তো কিছু দেখতে পাওনি। আমি সব দেখেছি।

—তুই দেখেছিস? কী দেখেছিস?

—এখন বলবো না, পুলিশ কমিশনারের কাছে বলবো।

টোটো আশা করেছিল, লালবাজারে তাকে দেখা মাত্র হৈ-হৈ পড়ে যাবে। বড় বড় সব পুলিশ অফিসাররা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে এলেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে একটা গোপন ঘরে। সেখানে বড় বড় ফ্লাড লাইট জ্বলছে।

কিন্তু লালবাজারে অনেক ভিড়। কেউ কাউকে গ্রাহ্য করছে না, ছোটকাকা অনেক খুঁজে খুঁজে অ্যান্টি-ডেকইটি বিভাগে গেলেন। সেখানেও অনেক লোক, তার মধ্যে টোটোদের পাড়ারও কয়েকজন আছে।
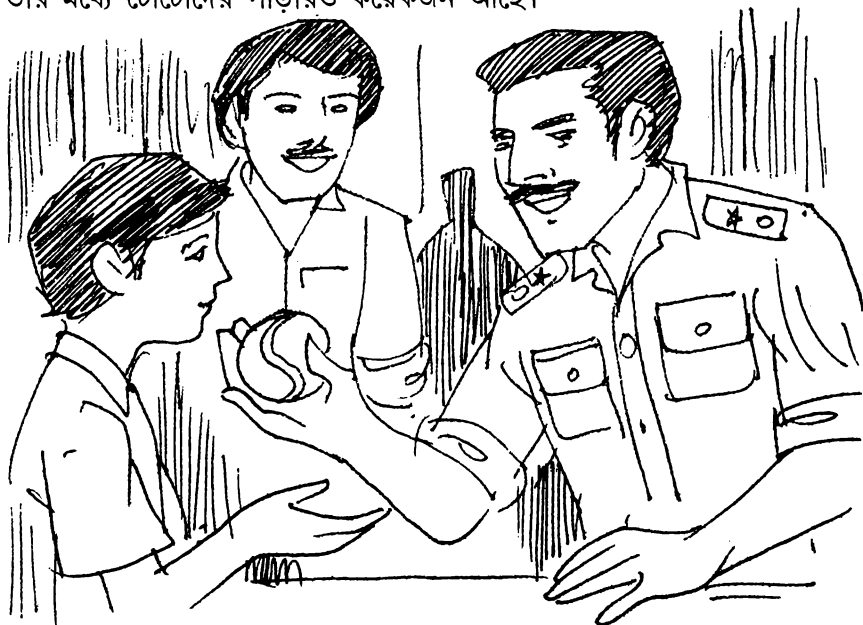
একটা ঘরের মধ্যে কাকে যেন জেরা করা হচ্ছে, আর সবাই অপেক্ষা করছে বাইরে। সকলের বসবারও জায়গা নেই। একটা মাত্র বেঞ্চ, অনেকের সঙ্গে টোটোকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। কতক্ষণ পরে যে তার ডাক আসবে তার ঠিক নেই।

এক ঘণ্টার বেশি সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেটে গেল, আর ছোটকাকা ক্রমেই বিরক্ত হতে লাগলেন। একবার তিনি বললেন, আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস, টোটো? তোকে এখানে জেলে পুরে দিয়ে আমি বাড়ি চলে যাই।

টোটোর মনের তেজও অনেক কমে গেছে এতক্ষণে। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, বাঃ, আমার কী দোষ?

একটু পরেই দারুণ একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। ছোটাছুটি করতে লাগলো অনেকে। কে যেন বললো, ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে!

সত্যিই কয়েকজন পুলিশ গোল করে ঘিরে নিয়ে এলো সেই চারজন ডাকাতকে। এখন অবশ্য তাদের পোশাক অন্য। তারা পরে আছে হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি। এই পোশাকের জন্যই বোধ হয় তাদের বেশ ছোট দেখাচ্ছে। মনে হয় যেন কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে। একজনের বয়স তো আঠারোর বেশি হতেই পারে না।

ছোটকাকা বললেন, যাক্, বাঁচা গেল। আর তো দাঁড়িয়ে কোন লাভ নেই। এবারে বাড়ি যাওয়া যাবে।

টোটো নিরাশ ভাবে বলল, আমায় কিছু জিজ্ঞেস করবে না?

ছোটকাকা ভেংচি কেটে বললেন, ডাকাত ধরা পড়ে গেছে, এখনো কি তুই পুলিশকে সাহায্য করতে চাস্ নাকি? তুই এখানে দাঁড়া, আমি গল্পটা শুনে আসি কী করে ওরা ধরা পড়লো।

সেই ঘরটার দরজার কাছে এখন অনেকে ভিড় করেছে। একজন সেপাই চেঁচিয়ে বলছে, হঠ যাও! তবু কেউ সরছে না অবশ্য। ছোটকাকা ঢুকে গেলেন সেই ভিড়ের মধ্যে।

একটু বাদে ফিরে এসে বললেন জলের মতন সোজা। আমি তাই ভেবেছিলুম, বুঝলি। ওরা ঢুকেছিল চ্যাটার্জিদের বাড়িতে। ওদের উঠোনের পেছনে একটা পাঁচিল আছে না? সেটা ডিঙিয়ে ওরা চলে যায় পেছনের বস্তিতে। ও বাড়ির একটা বুড়ি ঝি ওদের দেখেছিল, ভয়ে কিছু বলে নি আগে। বস্তিতেও কিন্তু ওরা থাকে নি। জানে তো পুলিশ বস্তিতেও খুঁজবে। তবে বেশিদূর যেতে সাহস পায় নি। বস্তির সামনেই যে বাজার, তার একটা ঘরে ঢুকে বসেছিল। ডাকাত না ক্যাবলাকান্ত। যাচ্ছেতাই! চল, বাড়ি চল।

ছোটকাকা টোটোর হাত ধরে সবে মাত্র টেনেছেন এমন সময় টোটো দেখতে পেল সেই রিভলভার হাতে পুলিশটিকে। কাকে যেন ভিড়ের মধ্যে খুঁজছে। এখন অবশ্য তার হাতে রিভলভার নেই, মুখখানিও বেশ খুশি খুশি।

টোটোকে দেখতে পেয়েই সে এগিয়ে এসে বললো, তোমরা ছাদে টেনিস বল খেলছিলে না? বলটা রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। তারপর খুঁজে পেয়েছিলে?

টোটো দু'দিকে মাথা নাড়লো।

পেছনে লুকানো একটা হাত সামনে এনে পুলিশটি বললেন, এই নাও তোমাদের বল। ডাকাত ছেলেগুলোকে সার্চ করে এই বলটা আমরা পেয়েছি। আজ তো সারাদিনে ওদের কোনো রোজগার হয়নি। তাই ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট সে রাস্তা থেকে এই বলটা কুড়িয়ে নিয়েছিল। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ! ছোকরা নিজে আমার কাছে স্বীকার করেছে, হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!

টোটো ছোটকাকার দিকে ফিরে ভারিক্কী চালে বললো, আমার জন্যই ওর ধরা পড়লো কিনা, সেটা দেখলে তো!

করালী ডাকাত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কেউ যদি বলে, এটা আপনার ছদ্মনাম, তা হলে রহস্যময়বাবু খুবই অসন্তুষ্ট হন। এমনকী, রেগেও যান। রহস্যময় তাঁর নিজস্ব পিতৃদত্ত নাম। রহস্যময় যেন অত্যন্ত সফল উকিল। তাঁর বাড়ির চেম্বারে রাত দশটা-এগারোটা অবধি মক্কেল গিসগিস করে। টাকা-পয়সার লেখা-জোখা নেই।

এখন রাত সাড়ে দশটা। মফস্বল শহরে শীতটা এবার খুব জম্পেশ হয়ে পড়েছে। কদিন হল মেঘলা এবং টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে নাগাড়ে। আজ আবার একটা ঝোড়ো হাওয়াও দিচ্ছে সন্ধে থেকে। ফলে আজ তেমন মক্কেলের ভিড় নেই। তবু মোট চারজন এখনও আছে। একজন মক্কেলের সঙ্গে রহস্যময়বাবু চেম্বারে বসে কথা বলছেন। বাইরের ঘরে আরও তিনজন বসে আছে। তাদের মধ্যে আরসাদ মিঞা বুড়ো এবং কালো মানুষ। তিনি বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্য দু'জনের একজন আট গাঁয়ের গণেশ সাহা, তেলের কারবারি। তিন নম্বর লোকটি হল মনসাতলার নন্দ হাজরা। নন্দ আর গণেশের

এই উকিলবাবু চেম্বারেই চেনা হয়েছে। বসে থেকে থেকে সেথা গল্পও হল। গল্প হতে হতে দু'জনেরই হাঁফ ধরায় এখন দু'জনেই একটু ঝিমোচ্ছে।

ঠিক এই সময় হঠাৎ নিস্তব্ধতা খান খান করে বিকট একটা ঝনঝন শব্দ হল। সেই শব্দ এমনই সাঙঘাতিক যে, রহস্যময়বাবুর মতো ঠাণ্ডা মাথার লোকও লাফিয়ে উঠে "ভূমিকম্প, ভূমিকম্প" বলে চেঁচাতে লাগলেন। তাঁর মক্কেল সনাতন হালদার ধা করে টেবিলের নিচে ঢুকে পড়ল। নন্দ চমকে উঠে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। আর গণেশ একটিও কথা না বলে টপ করে উঠে ঘরের বাইরে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে পাঁই-পাঁই করে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। শুধু আরসাদ-বুড়োরই কোন ভাবান্তর হল না। শান্ত মুখে ঘুমিয়ে রইলেন, ঘাড়টা একটু লটকে দিয়ে। কানে না-শোনার কিছু ভালো দিকও তো আছে।

রহস্যময়বাবুর বাড়ির লোকজনও শব্দে আতঙ্কিত হয়ে দোতলা থেকে নেমে এল। বউ, দুই ছেলে, এক মেয়ে, রহস্যময়বাবুর বুড়ি মা, রান্নার ঠাকুর হরিহর এবং কাজের মেয়ে অন্নদা।

রহস্যময়বাবুর দু'মিনিট ধরে "ভূমিকম্প, ভূমিকম্প" বলে চেঁচালেও ঘর ছেড়ে বেরোতে পারেন নি। তাঁর ধুতির খুঁট টেবিলের ড্রয়ারের টানায় আটকে গিয়েছিল। স্ত্রী মানময়ী মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, "ভূমিকম্প আবার কখন হল? ভূমিকম্প তো নয়, একটা কাচ ভাঙার শব্দ হয়েছে।"

এক কথায় রহস্যময়বাবু একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন। বললেন, "থাক! কাচ ভাঙবে কেন? ভূমিকম্প হলেই তো কাচটাচ ভাঙে।"

"মোটেই নয়, ঢিল মারলেও ভাঙে।"

"ঢিল! আমার জানালায় ঢিল মারে কার এমন বুকের পাটা? পাঁচশো ছয় ধারায় ঠুকে দেব না! আমার নাম রহস্য উকিল।"

এই বলে বুক চিতিয়ে অহঙ্কারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন। তবে তিনি রোগা মানুষ, বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেও তেমন কিছু ভয়ঙ্কর দেখাল না।

তাঁর ছোট ছেলে পুঁটু হামাগুড়ি দিয়ে মাঝে থেকে একটা জিনিস কুড়িয়ে আনল। একটা কাগজে মোড়া জিনিস। সেটা দেখেই রহস্যময়বাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "বোমা! বোমা! ফেলে দে, ফেলে দে।"

বোমা শুনে সনাতন হালদারের বুদ্ধি কাজ করল। সে একটা বোমার মামলারই আসামি। বলতে নেই বোমা বানানোয় তার একটু হাতযশও আছে। ভূমিকম্প হচ্ছে না জেনে সে টেবিলের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে টক করে পুটুর হাত থেকে বোমাটা কেড়ে নিয়ে বলল, "উকিলবাবুর বুদ্ধিরও বলিহারি, বোমা ফেলে দিতে বলছেন। বাচ্চা ছেলে যদি ছুড়ে ফেলে দেয় তাহলে বোমা ফেটে ঘরশুদ্ধু লোক মরব না?"

"তা বটে।" রহস্যময়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বোমার পণ্ডিত সনাতন বোমাটা একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, হাতে একটু নাচিয়ে ওজনটা পরীক্ষা করল, একটু শুঁকেও দেখল। তারপর ভ্রূকুটি করে বলল, "উকিলবাবু, জিনিসটা বোমা বলে মনে হচ্ছে না।"

বলেই ওপর থেকে কাগজটা সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে সনাতন যে জিনিসটা তুলে সবাইকে দেখাল তা একটা পাথরের টুকরো। বলল, "এটা কেউ ছুড়ে মেরেছে বাইরে থেকে।"

একটা জানালার ওপর লম্বা ভারী পরদা ঝুলছিল। সেটা সরিয়ে দেখা গেল, শার্সি হাঁ হয়ে আছে। মেঝেময় কাচের টুকরো ছড়ানো।

রহস্যময়বাবু আস্তিন গোটানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু গায়ে গেঞ্জি এবং তার ওপর আলোয়ান জড়ানো বলে পেরে উঠলেন না। তবে মুখে বললেন, "পাঁচশো ছয় ধারা। কালপ্রিটকে অ্যায়সা শিক্ষা দেব...."

সনাতন ঢিলের ওপরকার কাগজের খোসাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে মন দিয়ে কী যেন দেখছিল। সে বলল, "উকিলবাবু, বেশি চেঁচামেচিতে কাজ নেই।"

"কেন বলো তো!"

"এই কালপ্রিট খুব সুবিধের নয়। করালী-ডাকাতের চিঠি বলে মনে হচ্ছে। সে কাল রাতে আপনার বাড়িতে ডাকাতি করতে আসবে বলে লিখেছে। আগের দিনে এসব প্রথা ছিল, ডাকাতরা চিঠি দিয়ে আসত। আজকাল সব ভালো-ভালো প্রথাই তো লোপাট হয়েছে। তা এই করালীই যা কিছু ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। আহা, নমস্য লোক।"

রহস্যময় ধাঁ করে চিঠিটা প্রায় কেড়ে নিলেন। চিঠিটা পড়েই তিনি আলমারি খুলে পেনাল কোড বের করে উপুড় হয়ে দেখতে-দেখতে আপনমনে বলতে লাগলেন, "ডাকাতির ভয় দেখানো? দাঁড়াও, ধারাটা আগে দেখে নিই।"

সনাতন একটু গলাখাঁকারি দিয়ে সসম্ভ্রমে বলল, "আজ্ঞে, ধারা দেখার মেলা সময় পাবেন, যদি বেঁচেবর্তে থাকেন। ধারা দিয়ে হবেটাই কী? করালী-ডাকাত যা বলে তা-ই করে। ধারা-ফারা সব আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের জন্য। করালীর জন্য ধারায় হবে না। আপনি বরং কাল সকালেই শ্বশুড়বাড়ি চলে যান। টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি সব পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে যাবেন।"

রহস্যময়বাবু ফের বুক চিতিয়ে বললেন, "পালাব! কেন, পালাব কেন? দেশে পুলিশ নেই? আদালত নেই? সরকার নেই?"

সনাতন মাথা চুলকে বলল, "তা বটে। তেনারাও তো আছেন! তা হলে তো আর ভাবনার কিছু নেই।"

কথাটা এমনভাবে বলল, যেন মশকরা করছে। রহস্যময়বাবু কটমট করে তার দিকে চেয়ে বললেন, "ভাবনার কী থাকবে? অ্যাঁ! কাল সকালেই পুলিশের কাছে যাচ্ছি।"

এই বলে রহস্যময়বাবু দফতর গুটিয়ে ফেলতে লাগলেন। রাগে ফুঁসছেন।

সনাতন মৃদু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "বাইরে যে এখনও তিনজন মক্কেল বসে আছে উকিলবাবু।"

"তাদের যেতে বলে দাও। আজ আর হবে না।"

"সেই ভালো।"

পরদিন সকালেই পুলিশের কাছে গিয়ে সব বললেন রহস্যময়বাবু। দারোগা মদনলাল খাঁড়া বন্ধু লোক। চিঠিটা দেখে এবং ঘটনার কথা শুনে মদনলাল কিছু গম্ভীর হয়ে বললেন, "রহস্য, করালী ডাকাতের কথা কি তুমি শোনোনি।"

"শুনব না কেন? ঢের শুনেছি। তোমরা অপদার্থ বলে এতকাল ধরে জেলে পুরতে পারনি।"

মদনলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বড় ঠিক কথা বলেছ। আর অপদার্থ বলেই সরকার আমাকে দূরের একটা জায়গায় বদলি করে দিয়েছেন। সামনের মাসে চলে যাচ্ছি। তবে আমি একাই নই, আমার আগে আরও সাতজন দারোগা ওই একই কারণে বদলি হয়েছে।"

"তাহলে মানেটা কী হল? তুমি আমার একটা বিহিত করবে না?"

"তুমি উকিল মানুষ, তার ওপর বন্ধু লোক। তোমাকে বাঁচাতে যা করার সবই করব। দুপুর থেকেই তোমার বাড়িতে বন্দুকধারী কয়েকজন সেপাই বহাল থাকবে। তারপর তোমার ভাগ্য।"

রহস্যময়বাবু খুব রেগে গিয়ে বললেন, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে করালীর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে তোমার তেমন গা নেই।"

"রক্ষাকর্তা ভগবান, আমি কে? ভগবানকে ডাকো।"

"তার মানে, করালীকে তুমিও ভয় পাও?'

মদনলাল করুণ হেসে মাথা নেড়ে বললেন, "না রে ভাই। ভয়টয় পাওয়ার মতো অবস্থা আর আমার নেই। গত দু'বছরে অন্তত ত্রিশটা বাড়িতে করালী আগে থেকে খবর দিয়ে ডাকাতি করেছে। ত্রিশটা বাড়িতেই আমি ফোর্স নিয়ে গেছি।"

রহস্যময়বাবু সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

"এঁটে উঠিনি ভায়া। ত্রিশটি বাড়ির একটা বাড়িতেও সে হানা দেয়নি। তবে ওই রাতেই সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় ডাকাতি করে আমাদের বোকা বানিয়েছে।"

রহস্যময়বাবু সোৎসাহে বললেন, "তাহলে আমার বাড়িতে আজ ডাকাতি হবে না?"

"আজ না হলেও, হবে। যেদিন রামবাবুর বাড়িতে হওয়ার কথা, সেদিন শ্যামবাবুর বাড়িতে হয় বটে, কিন্তু রামবাবুও শেষ অবধি রেহাই পায় না। যেদিন যদুবাবুর বাড়িতে হওয়ার কথা, সেদিন রামবাবুর বাড়িতে সে হানা দেয়। সুতরাং তুমি আজকের দিনটা কাটিয়ে দিলেও অন্য কোন সময়ে করালীর

থাবা খাবেই খাবে।”

রহস্যময়বাবু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “লোকটা দেখছি এককথার মানুষ নয়। অথচ কাল আমার এক মক্কেল বলছিল, করালী নাকি যা বলে তা-ই করে।”

ভ্রু কুঁচকে মদনলাল বললেন, “কে মক্কেল? কী নাম?”

রহস্যময়বাবু নিপাট মুখে বললেন, “নামটা বলছি না। সে ক্রিমিনাল।”

“সাবধান থেক।”

রহস্যময়বাবু কোর্টে গেলেন। আদালতে কাজে মন নিতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। দেখলেন জনা আষ্টেক সেপাই তাঁর বাড়ির সামনে পাহারায় বসে আছে।

সন্ধ্যেবেলা আজ আর মক্কেলরা কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারল না। রহস্যময়বাবু এবং তাঁর পরিবার সবাই আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুম অবশ্য কারও চোখে এল না। বারবার উঠে সবাই জানালা দিয়ে

উঁকি মেরে বাইরের দিকে দেখতে লাগলেন। এই করতে রাত শেষ হয়ে এল। সেপাইরাও জানে, ডাকাত আসবে না। তারা সারারাত বসে-বসে দিব্যি ঘুমোল। ভোরবেলায় রহস্যময়বাবুকে সেলাম জানিয়ে বকশিস নিয়ে বিদেয় হল।

রহস্যময়বাবু খুবই দুশ্চিন্তার সঙ্গে বাইরের ঘরে পায়চারি করতে করতে আপনমনে বলছিলেন, “কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না তারা বিশ্বাসঘাতক। লোকটা দেখছি একেবারে যাচ্ছেতাই। ছ্যাঃ!”

“পেন্নাম হই উকিলবাবু।”

বিরক্ত রহস্যময়বাবু ফিরে দেখলেন, খোলা দরজায় তেল চুকচুকে চেহারার গোলগাল একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অমায়িক হাসি।

“কী চাই?”

“আজ্ঞে, আপনাকে একটু পেন্নাম করতেই আসা। সঙ্গে স্যাঙাৎরাও আছে।”

বলে পিছু ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে কাকে যেন ডাকল, "ওরে আয়! আয়! পেন্নাম কর এসে।"

পাঁচ-সাতজন মোটাসোটা লোক ঘরে ঢুকে পড়ল।

রহস্যময়বাবু বললেন, "কে তোমরা? কী চাও?"

তেলচুকচুকে লোকটি বলল, "আমিই করালী। একটু দেরি করে ফেলেছি। আপনি রাগ করেন নি তো?"

রহস্যময়বাবু লোকটির দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "তুমিই করালী?"

"যে আজ্ঞে।"

রহস্যময়বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, "এটা কেমন কথা হে? অ্যাঁঃ! তুমি আমার শার্সি ভেঙে, ঢিল মেরে, বীরত্ব দেখিয়ে চিঠি দিলে! আর আসল কাজের বেলায় লবডঙ্কা! কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না, তারা কী রকম মানুষ বলতো?"

করালী জিভ কেটে বলে, "কথাটা সত্যি। তবে কী না আপনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন, সেপাইরা মোতায়েন ছিল, তাই....."

দ্বিগুণ রেগে রহস্যময়বাবু বললেন, "বিপদ আছে বলে কথার খেলাপ করবে? তোমার মতো কুলাঙ্গার ডাকাত আমি কমই দেখেছি। জানো, যার কথার দাম নেই তার মুখদর্শন করাও পাপ? আজকে ভোরবেলা তোমার মুখ দেখলাম, দিনটাই মাটি হল দেখছি। ছিঃ-ছিঃ, তার ওপর সকালবেলায় ডাকাতি করতে এসেছ, সেটাও মস্ত বড় বেইমানি। এরকম তো নিয়ম নয়।"

করালী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, রহস্যময়বাবু তাকে পেল্লায় একটা ধমক দিলেন, "চোপ! চোপরাও বেয়াদব কোথাকার! লুটপাট করতে চাও সব বাক্স-প্যাটরা, আলমারি খুলে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। কিন্তু বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের বউ, ছেলেমেয়ে আর দলবলের কাছে বড়াই কোর না। কাপুরুষ আর কাকে বলে.....ইত্যাদি।"

করালী ডাকাত খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রহস্যময়বাবু তাঁর অগ্নিবর্ষী গলায় দেশের বীরপুরুষ ক্ষুদিরাম থেকে বাঘা যতীন, এমনকী গান্ধীজির প্রসঙ্গও এনে ফেললেন। এবং শেষে প্রশ্ন করলেন, "দেশটা কোথায় যাচ্ছে বল তো?"

করালীর চোখ ছলছল করছিল। হঠাৎ হাতজোড় করে ধরা গলায় বলল, "আর এরকম হবে না। কথা দিচ্ছি।"

হাঃ হাঃ করে হাসলেন রহস্যময়বাবু, "তোমার কথার কীই-বা দাম।"

করালীচরণ ডাকাতি না করেই পালাতে পালাতে অনেক দূর থেকেও সেই হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

ভুবন সর্দার

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
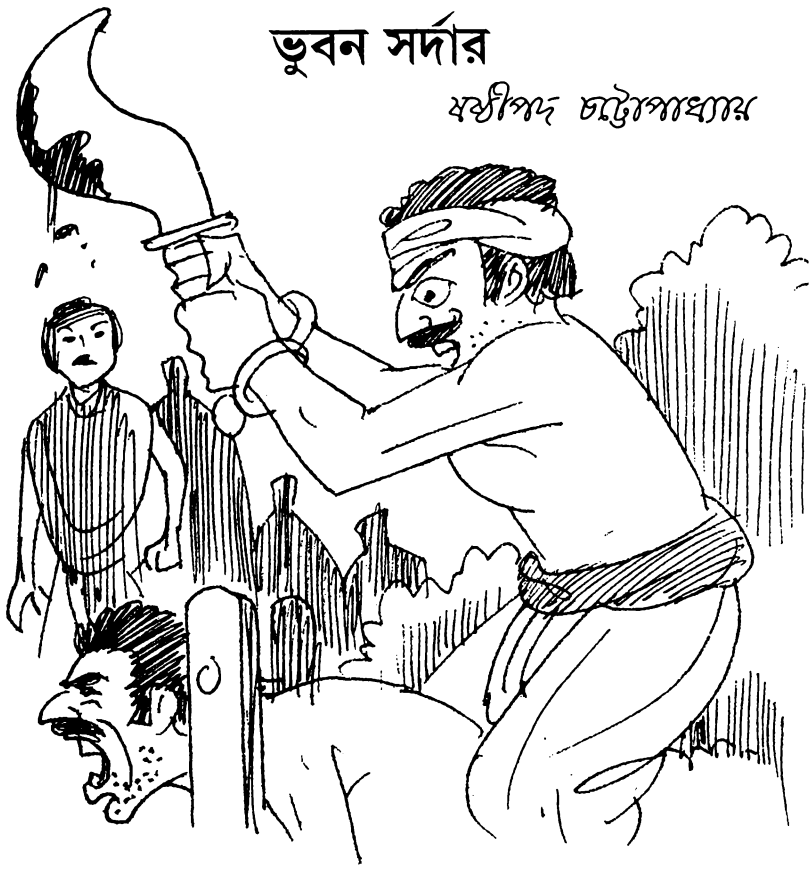
যখনকার কথা বলছি তখন বর্ধমান জেলায় ধাড়ান, পলাসন পিপুলদা, সুবলদা, সাহসেনপুর· প্রভৃতি গ্রামগুলো ডাকাত প্রধান গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এখানকার বাগদি ডাকাতরা ছিল প্রবল পরাক্রান্ত। যেমন ভয়ঙ্কর ছিল এদের চেহারা, তেমনি অমানুষিক শক্তি ছিল এদের দেহে। দামোদর নদের অববাহিকায় এইসব ডাকাতদের ভয়ে তখন আশ-পাশের গ্রামের লোকেরা তটস্থ হয়ে থাকত সব সময়। দলবদ্ধ না হয়ে রাতভিত কেউ গ্রাম গ্রামান্তরে যেত না। দিন দুপুরে পথে ঘাটে ছিল ঠ্যাঙাড়ের উপদ্রব আর রাতে ডাকাতের ভয়। এরই মধ্য দিয়ে জেলার মানুষরা দিনাতিপাত করত।

তা এই অঞ্চলের ডাকাতরা ছিল বড়ই দুর্ধর্ষ। আর ডাকাতিও করত এরা বড় বড় জায়গায়। বড় বড় জমিদাররাই ছিল এদের আসল শিকার। তারপর পথে ঘাটে অচেনা লোকদের মারধোর, জিনিসপত্তর লুটপাট করাও ছিল আর এক পেশা। তাই এই সমস্ত ডাকাতদের ভয়ে জমিদাররা সদা সতর্ক থাকত। এবং এদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য বলিষ্ঠ চেহারার কিছু লেঠেলকেও

প্রতিপালন করত।

তারাপ্রসন্নবাবুও এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। তাঁর জমিদারিতে ভুবন সর্দার নামে এক লেঠেল ছিল। ভুবন এমনই লেঠেল ছিল যে ভুবনের হাতে লাঠি মানেই ত্রিভুবন অন্ধকার। ভুবন নিজেও এক সময় ছিল এক দুর্ধর্ষ ডাকাত। তবে তার দলের লোকেরা সবাই ধরা পড়ে যাওয়ায় সে নিজের দেশ ছেড়ে এসে জমিদার তারাপ্রসন্নবাবুর বাড়িতে আত্মগোপন করে। তারাপ্রসন্নবাবু ভুবনের পূর্ব পরিচয় জানতেন না। তবে ভুবনের সাহসিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে তার ওপর খুবই প্রসন্ন ছিলেন।

ভুবন সর্দার দিনের বেলায় ঘুমতো আর রাত জেগে পাহারা দিত। ভুবনের লাঠির সঙ্গে যাদের পরিচয় ছিল তারা ভুবনকে ঘাঁটাত না। এই অঞ্চলের ডাকাতরাও ভয় করত ভুবনকে।

একদিন সন্ধেবেলা লাঠি হাতে ভুবন সর্দার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে এমন সময় বহু দূরে কয়েকটি উজ্জ্বল আলোর রেখা সে দেখতে পেল।

জমিদার তারাপ্রসন্নবাবুও দোতলার বারান্দা থেকে দেখতে পেলেন সেই দৃশ্য। দেখেই ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ডাক দিলেন—ভুবন, একবার এদিকে এসো তো?

ভুবন উঠোনে দাঁড়িয়েই লাঠিতে ভর দিয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে বারান্দায় উঠল। এরকম লাঠিয়াল সত্যিই বিরল। শুধু লাঠিতে ভর দিয়েই বড় বড় গাছের মগডালে সে অনায়াসে উঠে পড়তে পারত। লাঠিতে ভর দিয়ে ছিটকে বাড়ির ছাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। আর লাঠিতে ভর দিয়েই দশ বিশ মাইল দূরের গ্রাম থেকে সামান্য কিছু সময়ের মধ্যে ঘুরে আসতে পারত।

যাই হোক। ভুবন সর্দার বারান্দায় এলে তারাপ্রসন্নবাবু দূরের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বললেন—ঐ দেখো।

ভুবন সর্দার সেই দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ, আমিও লক্ষ করেছি। কতকগুলো আলোর শিখা। মনে হচ্ছে কতকগুলো মশাল জ্বালিয়ে কারা যেন এদিকে আসছে।

তারাপ্রসন্নবাবু বললেন—এই সন্ধে রাতে মশাল জ্বালিয়ে যখন দলে দলে এগিয়ে আসছে তখন ওরা যে কারা তা বুঝতে পারছো তো? অতএব তৈরি হও। এরা যেভাবে আসছে তাতে মনে হচ্ছে গ্রামকে গ্রাম এরা জ্বালিয়ে দেয়।

ভুবন বলল—ঠিক আছে। আপনি বাড়ির মেয়েদের নিয়ে গুপ্তকক্ষে চলে যান। আমি দেখে আসি দলে ওরা কতজন।

এই বলে যেই না ভুবন যেতে চায় অমনি তারাপ্রসন্নবাবু ওর একটা হাত খপ করে ধরে বললেন—না ভুবন, এ সময় তুমি আমাদের ফেলে রেখে কোথাও যেও না। ওদের খোঁজ নেবার জন্য আমি অন্য লোক পাঠাচ্ছি। তুমি বাড়িতে না থাকলে আমি লোহার সিন্দুকে ঢুকেও শান্তি পাব না। এই বলে তারাপ্রসন্নবাবু ভুবনকে আটকালেন। এবং আর একজন লোককে বললেন—

যাও তো দূর থেকে একটু ভালো করে দেখে এসো তো ওরা কারা। তারপর সেই বুঝে ব্যবস্থা নেবো। কেন না দিনকাল খুব খারাপ। অতএব সতর্ক হয়ে থাকতে দোষ কি?

তারপর আদেশ পেয়েই লোকটি তখন লাঠিতে ভর করে অন্ধকারে এগোতে লাগল মশালধারীদের দেখতে।

তখনকার দিনে ডাকাতরা রণপার সাহায্যে বহুদূর দূরান্তরে ডাকাতি করতে যেত। কিন্তু শুধুমাত্র একটি লাঠিতে ভর করেও অনেকে অপূর্ব কৌশলে খুব তাড়াতাড়ি দূরে যাতায়াত করতে পারত। এই যাতায়াতে ভুবন সর্দারের জুড়ি ছিল না কেউ। তবু এই কৌশলেই লোকটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই মশালধারীদের খোঁজ নিয়ে এসে বলল—না বাবুমশাই। ভয়ের কোন কারণ নেই। হুগলীর দিক থেকে একদল লোক বরকনে দিয়ে এই দিকে আসছে। বাজনা বাদ্যি বাজিয়ে মশাল জ্বেলে অন্তত জনা পঞ্চাশেক লোক এগিয়ে আসছে এদিকে।

তারাপ্রসন্নবাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন—যাক বাবা। বাঁচা গেল। কিন্তু এই সব অঞ্চলে যেরকম ডাকাতের উপদ্রব তাতে তো এদের এইভাবে যেতে দেওয়া যায় না।

লোকটি বলল—তা অবশ্য ঠিক। তবে দলে তারা এত বেশি যে ওদের ঠেকায় কার সাধ্য। তাছাড়া লাঠি সড়কি বল্লম তলোয়ার সবই আছে ওদের সঙ্গে।

এই কথা শোনামাত্রই ভুবন সর্দার উত্তেজিত হয়ে উঠল।

এমন সময় দূর থেকে নানা রকম বাদ্যিবাজনার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

তখন সন্ধেরাত্রি। আলো আর বাদ্যি বাজনার শব্দ শুনে তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই ছুটল কি আসছে দেখতে।

এদিকে সুসজ্জিত পাল্‌কি কাঁধে বর কনের শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে গ্রামে এসে ঢুকল। গ্রামের বারোয়ারীতলায় বিশাল বটগাছের নিচে বিশ্রামের জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসল সকলে। অনেক দূর থেকে আসছে তো সব। কাজেই বিশ্রামের জন্য এবার একটু বসার প্রয়োজন।

জমিদার তারাপ্রসন্নবাবু বর কনের দলকে ডাকাত ভ্রমে প্রথমে খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যখন বুঝলেন তাঁর আশঙ্কা ভুল তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তিনি এমনিতে সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তাই বললেন—তাহলে ভুবন, ঐ লোকগুলো তো আজ রাত্রে এই গ্রামের অতিথি। ওদের কাছে গিয়ে একটু জিজ্ঞেস করে দেখো আমাদের কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা ওদের। যদি ওরা আজ রাত্রে থাকতে চায় বা খেতে চায় তাহলে সেই মতো ব্যবস্থা করো।

ভুবন এতক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। এবার একটু হেসে বলল—বাবু! এতটা উদারতা না দেখিয়ে বরং আপনার লেঠেলদের তৈরি হয়ে বাড়ির চারপাশে লুকিয়ে থাকতে বলুন।

—সে কি! এ তুমি কি বলছ ভুবন?

—ঠিকই বলছি। আপনি আর দেরি করবেন না। একবার নায়েব মশাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

তারাপ্রসন্নবাবু ভীত হয়ে বললেন—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—একটু পরেই বুঝতে পারবেন। ভুবন সর্দার এত ভুল করে না। বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে বাবু। আপনি বাড়ির মেয়েদের ও ছোট ছেলেপুলেদের গুপ্তকক্ষে পাঠিয়ে দিন। তাড়াতাড়ি করুন, দেরি করবেন না।

তারাপ্রসন্নবাবু ভুবন সর্দারকে ভালো রকমই চিনতেন। তাই ওপর থেকে হাঁক দিয়ে লেঠেলদের বললেন, —এই, ভুবন কি বলছে শোন। বলে নায়েবমশাইকে ডাকতে ডাকতে নিচে নেমে এলেন।

একটু পরেই নায়েবমশাই এলেন।

ভুবন নায়েবমশাইয়ের কানে কানে কি যেন বলতেই নায়েবমশাই দ্রুত চলে গেলেন সেখান থেকে।

ভুবন এবার বারান্দা থেকে নিচে নেমে এলো। তারপর লেঠেলদের বলল—তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে এই বাড়ির আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকো। আর একটু বাদেই হয়তো এ বাড়িতে ডাকাত পড়বে।

লেঠেলরা বলল—কি করে বুঝলে?

বাঘের গায়ের গন্ধ যেমন তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয় তেমনি ওদের এই সশস্ত্র আবির্ভাবও ওদের পরিচয় পাইয়ে দিচ্ছে। ওরা সত্যিই বর কনে নিয়ে এলে ওদের ভেতর থেকে কেউ না কেউ আমাদের কাছে এসে রাতের আহার এবং আশ্রয় প্রার্থনা করত। কিন্তু সে সব না করে চুপচাপ বসে রইল বারোয়ারীতলায়। এতে কি মনে হয়। আমার মনে হচ্ছে এদের বরকনে সবই ভুয়া। আসলে এটা ওদের ছদ্মবেশ। আর ওই বাজি বাজনার উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের লোককে ভুলিয়ে অন্যমনস্ক করা। ওদের অসতর্কতার সুযোগে ওরা এসে এখানে ডাকাতি করবে। অতএব তোমরা সতর্ক থাকো!

ভুবনের কথামতো লেঠেলরা তাই করল।

এদিকে নায়েব মশাই ভুবন সর্দারের শেখানো পড়ানো মতো লোকজন সঙ্গে নিয়ে বারোয়ারীতলায় এসে অতিথিদের জিজ্ঞেস করলেন—আপনাদের বরকর্তা কে?

একজন ষণ্ডামার্কা বাবরি চুলওয়ালা লোক গোঁফ পাক দিয়ে এগিয়ে এসে বলল—আমি।

—আমাদের মা ঠাকরুণ জানতে পাঠিয়েছেন আজ রাত্রে আপনারা কি এখানে থাকবেন? যদি থাকেন তাহলে আপনাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এখানে হতে পারে। কেননা আমাদের নিয়ম আছে এই গ্রামে কেউ অতিথি হয়ে এলে আমরা তাদের অভুক্ত থাকতে দিই না।

বাবরি চুলওয়ালা লোকটি বলল—তা মন্দ প্রস্তাব কি? কিন্তু তোমাদের প্রজাবৎসল জমিদার তারাপ্রসন্নবাবু থাকতে হঠাৎ মা ঠাকরুণ এই নিমন্ত্রণ জানালেন কেন?

নায়েব মশাই হাত কচলাতে কচলাতে বললেন—মানে, বাবুমশাই তো নেই। উনি আজই সকালে লোকজন নিয়ে বর্ধমান গেছেন একটি বিশেষ কাজে। ফিরতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। তাই মা ঠাকরুণ বলে পাঠালেন বাবু নেই বলে অতিথিসেবার যেন কোনরকম ত্রুটি না হয়। আর এও বলে দিয়েছেন আপনারা ভিনদেশি লোক। হয়তো জানেন না এ সমস্ত জায়গা ভালো নয়। তাই আপনারা পারলে এ রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে যেখানে ইচ্ছে যান।

—সে ভেবে দেখবখন। তা তোমাদের সেই ভুবন সর্দার লোকটি কি এখানে আছে?

নায়েব মশাই বললেন—হঠাৎ ভুবন সর্দারের খোঁজ করছেন কেন বলুন তো?

—সে আমাদের পুরনো বন্ধু। তার সঙ্গে একটু দেখা করবার ইচ্ছে আছে আমাদের।

—তাই নাকি! কিন্তু মহাশয় ভুবন সর্দার তো এখানে নেই।

—কোথায় গেছে সে?

—ভুবনও তো বাবুর সঙ্গে গেছে। পথে ঘাটে বাবুর যদি হঠাৎ কোন বিপদ হয় তখন বাবুকে রক্ষা করবে কে! কাজেই ভুবনের সঙ্গে তো এখন দেখা হবে না।

বাবরি চুলওয়ালা লোকটি এবার গোঁফে তা দিয়ে বলল—জয় মা। তা তোমাদের ভুবন সর্দার লোকটি কিন্তু সত্যিই দুর্ধর্ষ। তা কি জান—ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। এই যে সে বাবুর সঙ্গে গ্রাম থেকে চলে গেল এখন হঠাৎ কোন বিপদ হলে তোমাদের রক্ষা করবে কে?

নায়েব মশাই বললেন—সে অবশ্য ঠিক। তবে আমাদের এখানে সচরাচর কোন বিপদের আশঙ্কা দেখি না আমরা। তার পরেও যদি কিছু ঘটে তবে সেটা দুর্ভাগ্য।

বাবরি চুলওয়ালা লোকটি বলল—বেশ। আমরা এই রকমটিই চাইছিলুম। তোমাদের মাঠাকরুণকে বলো আমরা আজ রাত্রে এখানেই থাকছি। তোমরা আমাদের রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা একটু তাড়াতাড়িই করো তাহলে।

নায়েব মশাই ফিরে এসে সেই কথাটা ভুবন সর্দারকে বলতেই ভুবন বলল—ঠিক আছে। যা ভেবেছি তাই। আপনি এক কাজ করুন—বেশ কড়া করে কিছু লোককে সিদ্ধি বাটতে বসিয়ে দিন। তারপর সেই সিদ্ধির সরবত বালতি বালতি নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে থাকুন ওদের, তবে খুব সাবধান, লোভে পড়ে আপনার লোকেরা যেন ঐ সিদ্ধি চেখে দেখতে না চায়। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নায়েব মশাই বললেন—ও ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও ভুবন। এই বলে নায়েব মশাই তাঁর সমস্ত অনুচরদের সিদ্ধি বেটে সরবত তৈরি করতে লাগিয়ে দিলেন। তারপর সেই সরবত বড় বড় বালতিতে করে নিয়ে চললেন বারোয়ারীতলায়।

এদিকে নায়েব মশাই চলে আসার পর দলের লোকেরা কি সব কথাবার্তা কয় তা শোনবার জন্য ভুবনের একজন অনুচর লুকিয়ে ছিল বটগাছের আড়ালে। নায়েব মশাই চলে আসতেই লোকটি দেখল বর কনের দল আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়ল।

বাবরি চুলওয়ালা লোকটি বলল—আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম রে ভাই। এ যে দেখি না চাইতেই জল। বাবু তারাপ্রসন্ন নেই। ভুবন সর্দার নেই। তার মানে আরো কিছু লোক নেই। এ বাড়িতে ডাকাতি করার এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কি হতে পারে।

আর একজন বলল—তার ওপরে উপরি পাওনা এই নেমন্তন্ন। ভালোই হ'ল। অন্ধকারে লুকিয়ে চুরিয়ে আচমকা ঢুকতে হবে না। দল বেঁধে খেতে যাব আর সেই সুযোগে লুটপাট করে কেটেকুটে রেখে আসব।

বাবরি চুলওয়ালা লোকটি বলল—এমন সুযোগ হবে জানলে এত পরিকল্পনা করে বাজি বাজনা না নিয়ে এলেই হোত। হৈ হৈ করে আচমকা ঢুকে পড়লেই চুকে যেত ল্যাঠা।

লোকটি এসব শুনেই চুপিচুপি এসে খবর দিল ভুবনকে। তারাপ্রসন্নবাবুও

শুনলেন। শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন তিনি।

ভুবন সর্দার বলল—আপনি নির্ভয়ে থাকুন বাবু। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আপনার গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেব না আমি।

তারাপ্রসন্নবাবুর ভয় তবুও গেল না। তিনি দুহাত জোড় করে ইষ্টদেবতাকে ডাকতে লাগলেন।

ডাকাতের দল যখন বারোয়ারীতলায় বটগাছের নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আনন্দে উল্লাস করছে তখন নায়েব মশাইয়ের লোকেরা দলে দলে সিদ্ধির বালতি নিয়ে এসে বলল—তা মাননীয় অতিথিরা, আপনাদের জন্য আমাদের এখানে লুচি মণ্ডার ব্যবস্থা হয়েছে। ততক্ষণ একটু সরবত খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন।

নায়েব মশাইও তদারকি করতে করতে বললেন—ওরে দে দে অতিথিদের সরবত দে। বেশ যত্ন করে খাওয়া।

ডাকাতরা তো আকণ্ঠ সেই সরবত খেয়ে খুব প্রসংশা করতে লাগল। আহা কি চমৎকার! এমনটি আমরা কখনো খাইনি।

নায়েব মশাই বললেন—আমাদের গ্রামের এই সরবতের এক বিশেষ গুণ আছে। খেলে খিদে হয়, হজম হয়। ঘুম আসে। একবার খেলে ভোলা যায় না।

একে সিদ্ধির সরবত। তার ওপর অঢেল খাওয়া। কাজেই খেতে খেতে নেশা হ'ল। আর নেশার ঘোরে সবাই তখন চেঁচাতে লাগল—আরো দাও, আরো দাও করে।

ওরা যত চায়, এরাও ততই দেয়। তারপর যখন দেখল আর না খাওয়ালেও চলবে তখন গিয়ে খবর দিল ভুবন সর্দারকে।

একটু পরেই দেখা গেল কয়েকজন লোক ঢোল কাসি বাজিয়ে আসছে। একজনের কাঁধে মস্ত একটা হাঁড়ি কাঠ। আর ভুবন সর্দারের হাতে একটি ধারালো কাতান (খড়গ)।

ওরা এসে ঢোল কাঁসি বাজিয়ে বারোয়ারীতলায় হাঁড়ি কাঠ পুঁততে লাগল।

আর ভুবন সর্দার কাতান উচিয়ে বারোয়ারীতলায় দেবীর শূন্য আসরের কাঠামোর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—মা—মাগো, আজই যেন ওদের শেষ রাত হয় মা।

এই দেখে একজন ডাকাত সিদ্ধির ঘোরেই জিজ্ঞেস করল—কি ভায়া, তোমরা এসব এখানে এনেছ কেন?

ভুবন সর্দার বলল—আজ আমাদের শুভ রাত্রি। তাই আজ মায়ের সামনে বলি হবে।

—অ। তা আমরা সেই বলির প্রসাদ পাবো তো?

—নিশ্চয়ই পাবে। সবাই জোড় হাত করে মাকে ডাকো।

ইতিমধ্যে ভুবনের ইঙ্গিতে ডাকাতের দলকে লেঠেলরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

ভুবন বলল—এদিকে যে এক মুশকিল হয়ে গেছে ভাই।

—কি মুশকিল হয়েছে বলো?

—বলি তো হবে, কিন্তু বলির পাঁঠা যে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সে কি রকম কথা। ওসব কিছু আমরা শুনতে চাই না। আমরা বলি দেখব। বলির প্রসাদ চাই আমাদের। যেমন করে পারো বলি দাও।

ভুবন সর্দার বলল—আরে সেই জন্যেই তো আমি এসেছি। আমি বলি কি পাঁঠা নাইবা পেলাম। মায়ের পুজোর জন্যে তোমাদের ভেতর থেকে কি কেউ বলির পাঁঠা হতে পারো না?

এমন সময় ডাকাতদের ভেতর থেকে একজন 'প্যাঁ প্যাঁ' করে ডাকতে ডাকতে এসে বলল—আমি, আমি হব বলির পাঁঠা। আমাকে বলি দাও আজ, তবে ভাই, একটা কথা আগেই বলে রাখছি, আমার ভাগের পেসাদটা কিন্তু বেশি চাই।

সেই না শুনে আর একজন ডাকাত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—একি মগের মুলুক নাকি? তুই কেন বেশি পেসাদ পাবিরে? তাছাড়া আমি থাকতে তুই কি পাঁঠা হবি। পাঁঠা তো আমি হবো।

অন্য ডাকাতরা তখন পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। ওরা পাঁঠা হলে আমরাও তো পাঁঠা।

ভুবন সর্দার বলল—তোমরা সবাই পাঁঠা। একটু সবুর করো, তোমাদের সবাইকেই এক এক করে এই হাঁড়ি কাঠে বলি দেবো আমি।

এইবারেই হল মুশকিলের চূড়ান্ত। কে আগে পাঁঠা হবে তাই নিয়ে ডাকাতদের দলে নিজেদের ভেতর লেগে গেল দারুণ মারামারি। আর তারই ফাঁকে ভুবন করল কি হাতের সামনে যাকে পেল তাকেই ধরে বলি দিতে লাগল।

এইভাবে দলকে দল শেষ করে দেবার পর একজনই শুধু বাকি রইল। সে হল সেই বাবড়ি চুলওয়ালা লোকটি। সেই হচ্ছে দলের সর্দার। সর্দার বলল—আমার দলের লোকেরা সবাই যখন পাঁঠা হ'ল তখন আমিই বা বাকি থাকি কেন? আমিও পাঁঠা হবো। তবে ভাই একটু আস্তে কোপটা মেরো। যেন না লাগে।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দারের মাথা হাঁড়িকাটে লাগানো হ'ল। আর লাগানো মাত্রই ঢোল কাঁসি বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ভুবন সর্দারের উদ্যত খড়গ দ্বিখণ্ডিত করল ডাকাত সর্দারকে।

ভুবনের বুদ্ধির চালে পঞ্চাশজন ডাকাতকে এক রাতের মধ্যে শেষ করে দেওয়া হ'ল। সেই রাতে এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত কুখ্যাত ডাকাতকেই বলি দেওয়া হয়েছিল। ডাকাত বলির পর তারাপ্রসন্নবাবু ভুবন সর্দারকে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিলেন। অনেক জমিজমা লিখে দিয়েছিলেন। আর গ্রামসুদ্ধু লোককে পরদিন পেট ভরে মণ্ডা মিঠাই খাইয়েছিলেন। সেই থেকে ভুবন সর্দারের নামই হয়ে গিয়েছিল ডাকাত কাটা ভুবন।

কালী ডাকাত

নির্মলেন্দু গৌতম

সেই যে ডাকাত সর্দার, যার নাম কালী ডাকাত, তার মুখ কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ দেখতে পায়নি। না পাবার কারণও আছে।

সে যখন ডাকাতি করতে আসে, তখন তার পুরো মুখ ঢাকা থাকে কালো কাপড়ে। শুধু আগুনের গোলার মতো তার চোখ দু'টো দেখা যায়। সেই চোখের দিকে তাকালে হিম হয়ে যায় শরীর। মুখ দেখার কথাটা তখন কারও ভাবনার মধ্যেই আসে না।

গ্রামের শেষে বন। সেই বনের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা একটা পথ অনেক দূর চলে গেছে। যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায় পথটা, সেখানে মস্ত একটা কালী মন্দির। সবাই জানে, সেই কালীমন্দিরে অমাবস্যার রাতে কালী ডাকাত আসে তার দলবল নিয়ে। পুজো দেয় মন্দিরে। গভীর রাত পর্যন্ত ডাকাতদের আনাগোনা চলে সেখানে। তাদের হইহল্লা অনেক সময় শোনা যায় গ্রাম থেকেও।

না, অমাবস্যার রাতে গ্রামের কেউ সেই মন্দিরে পুজো দিতে যাবার কথা

ভাবেও না। কার সাহস আছে যাবার। সবাই জানে, সে মন্দির শুধু কালী ডাকাতের।

অন্য দিনগুলোয় গ্রামের লোকজন কিন্তু মন্দিরে যায়। সেই মন্দিরে পুজো দিলে মনের ইচ্ছে নাকি পূর্ণ হয়। কতজনেরই তো পূর্ণ হয়েছে। পুরোহিত ঠাকুরের হাতে পুজোর জিনিসপত্র দিয়ে শুধু মনের কথাটা বলতে হয়। পুরোহিত ঠাকুর পুজো করতে করতে মা কালীকে শুধু সেই কথাগুলোই বলতে থাকেন।

ব্যস, দু-চার দিনের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে যায় মনের ইচ্ছেটা। গ্রামের কারও ছেলের অসুখ, কিন্তু ডাক্তার দেখাবার ক্ষমতা নেই—অথচ কেউ জানে না কেন, ডাক্তারবাবু এসে যাবেন। একটা পয়সাও নেবেন না তিনি। কারও মেয়ের বিয়ের গয়না দরকার। গয়না না হলে বিয়েই হবে না—ভোরবেলা দরজা খুলতেই গয়নার একটা বাক্স দেখতে পাবে মেয়ের বাবা। বর্ষায় ভাঙা ঘরে থাকা সম্ভব নয় কিছুতেই। সকালবেলা উঠেই সেই ভাঙা ঘরের মালিক দেখতে পাবে বাড়ি বানাবার জিনিসপত্র সব বাইরে জড়ো করা।

আবার তারা যায় কালীমন্দিরে। পুজো দেয়। পুরোহিত ঠাকুরকে বলে, "সত্যি, তোমার কথা মা শোনে।"

পুরোহিত ঠাকুর শুধু হাসে। কোন উত্তর দেয় না।

সত্যিই, পুরোহিত ঠাকুরের চেহারাটাও দেখবার মতো। মস্ত লম্বা চওড়া চেহারা। একমাথা চুল। মস্ত বড় দুটো চোখ। তাকালেই যেন মনে হয় সবার জন্য তার চোখ দু'টো মমতায় ভরে আছে।

যখন পুজো করতে বসেন পুরোহিত ঠাকুর তখন বুঝি তাঁর কোনোদিকে খেয়াল থাকে না। মন্ত্র পড়তে থাকেন যখন, তখন মন্দিরটা ভরে ওঠে তাঁর গলার স্বরে। জীবন্ত মনে হয় মা কালীকে। ঠিক যেন পুজো নিচ্ছেন পুরোহিত ঠাকুরের।

যারা পুজো দিতে আসে, তারা সেই পুজো দেখতে দেখতে বুঝি নিজেদের ভুলে যায়।

এখন যে পুরোহিত ঠাকুর, তিনি কেন অমাবস্যার রাতে ডাকাতদের মন্দিরে পুজো করতে দেন, সেকথা ভেবে গ্রামের লোকেরা কিন্তু অবাক হয়।

কেউ কখনও তা নিয়ে প্রশ্ন করলে পুরোহিক ঠাকুর হাসেন। বলেন, 'মা কালীর মন্দিরে, যে কেউ পুজো দিতে আসতে পারে।'

'তাই বলে ডাকাতরা আসবে?' কেউ হয়ত প্রশ্ন করে সঙ্গে সঙ্গে।

পুরোহিত ঠাকুর বলেন, 'ডাকাতরা তো ডাকাতি করতে আসে না। পুজো দিতে আসে। কেউ পুজো দিতে এলে আমি কেন বাধা দেব?'

কথাটা যে ঠিক, গ্রামের লোকেরা তা বোঝে। তবু কেউ কেউ বলে, 'ডাকাতরা এলে তোমার ভয়-টয় করে না?

'ভয় করবে কেন? তারা তো আর ডাকাতি করতে আসে না। আসে পুজো

দিতে।' পুরোহিত ঠাকুর উত্তর দেন।

না, আর কিছু বলার থাকে না গ্রামের লোকদের।

সেদিন অমাবস্যা ছিল। গ্রামের লোকেরা সেদিন শুনতে পেল কালীমন্দির থেকে ভেসে আসা দারুণ শোরগোলের শব্দ। ঢাক আর ঘণ্টার শব্দও ভেসে এল সেই সঙ্গে।

এ রকম শব্দ শোনা গেলে বোঝা যায়, কোথাও ডাকাতি করতে যাবে ডাকাতরা।

গ্রামের লোকেরা তাই ঠিক বুঝতে পারল, কোথাও আজ ডাকাতি হবে।

কিন্তু কোথায় ডাকাতি হবে?

না, সেটা বোঝা সম্ভব নয়।

তবে এটা যে কালী ডাকাতের দল, সেটা বুঝতে কারো অসুবিধা হলো না। কারণ মন্দির থেকে এ রকম দারুণ শব্দ ভেসে আসে যেদিন, সেদিন কালী ডাকাতের দল আসে। আর যেদিন কালী ডাকাতের দল আসে, সেদিনই কোথাও না কোথাও গভীর রাতে ডাকাতি হয়।

না, কালী ডাকাতকে গ্রামবাসীরা ভয় পায় না। ভয় না পাবার কারণ কালী ডাকাত কখনও অন্যায়ভাবে মানুষের ক্ষতি করে না। যেখানে অন্যায়, অত্যাচার, কালী ডাকাত সেখানেই তার দলবল নিয়ে যায়। আর যেখানে কালী ডাকাত যায়, সেখানে কেউ তাকে বাধা দেয় না। দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না।

কালী ডাকাত যে কোথায় থাকে, কিভাবে থাকে, সেটা কেউ কিন্তু জানে না। মন্দিরে পুজো দিতে আসে কোন পথে, তাও কেউ জানে না।

মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'সে কোথায় থাকে, কোন পথে আসে, তা আমি কি করে জানব? সে আসে, পুজো দেয়, তারপর দলবল নিয়ে চলে যায়।

'তার মনের ইচ্ছেটা তোমায় বলে না কখনও?'

কেউ যখন একথা জিজ্ঞেস করে, তখন পুরোহিত ঠাকুর বলেন, 'নিশ্চয়ই বলে।'

কেউ তখন প্রশ্ন করে, 'তার মনের ইচ্ছেটা কী?'

'তার মনের ইচ্ছে সবার দুঃখ দূর হোক।' পুরোহিত ঠাকুর বলেন।

গ্রামের সবাই তাই জানে, কালী ডাকাত সাধারণ ডাকাত নয়। তাই তার ডাকাতির খবর যখন আসে, তখন কিন্তু সবাই বুঝতে পারে, কালী ডাকাত ডাকাতি করলেও খারাপ কিছু করেনি।

সেদিনও মধ্যরাতে ডাকাতদের পুজোর হৈ-হট্টগোল থেমে গেল। গ্রামের যারা জেগেছিল, তারা বুঝতে পারল, কালী ডাকাত এবার বেরিয়েছে ডাকাতি করতে। কাল সকালেই খবর আসবে, কোথায় তারা ডাকাতি করতে গিয়েছিল!

সকালের অপেক্ষায় সময় কাটাতে থাকল তারা।

সকালবেলা সত্যি সত্যি খবর এল কালী ডাকাতের ডাকাতির।

জমিদার রামনারায়ণ একদল লেঠেল নিয়ে খাজনা আদায়ে বেরিয়েছিলেন দিন কয়েক আগে। গোটা কয়েক গ্রামে খাজনা আদায়ের নামে প্রায় লুঠতরাজ করে ফিরেছিলেন। কান্না-কাটিতে ভরে উঠেছিল গ্রামগুলি।

গ্রামবাসীদের কিছু করার ছিল না। একে জমিদার, তাতে দশাসই চেহারার সব লেঠেল। সেই লেঠেলদের হাতের লাঠি ভারী নির্মম। যেখানে সেটা নামে, সেখানেই নির্মমভাবেই নামে। সেই লাঠির বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহস কারো নেই। তাই গ্রামবাসীরা অসহায়ভাবে মার খেয়েছে লেঠেলদের হাতে।

সেই খবর এসেছিল কালী ডাকাতের কাছে।

কালী ডাকাত এর শোধ নেবার জন্য বেরিয়েছিল জমিদার রামনারায়ণের বাড়িতে ডাকাতি করতে।

গভীর রাতে জমিদার বাড়িতে যখন দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কালী ডাকাত, তখন লেঠেলরাই লাঠি নিয়ে বাধা দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু কালী ডাকাতের দলের সঙ্গে তারা পারবে কী করে?

সবার সামনে ছিল কালী ডাকাত।

সে একাই পঞ্চাশজন লেঠেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল তার হাতের লাঠি তুলে।

না, বেশি সময় লাগেনি। বলতে গেলে চোখের পলকেই পঞ্চাশজনের হাতের লাঠি ছিটকে পড়েছিল দূরে। মাটির ওপর আছড়েও পড়েছিল অনেকেই। বাকিরা পালাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পালাতে পারেনি কেউ। কালী ডাকাতের দলের ডাকাতরা তাদের পালাতে দেয়নি।

কালী ডাকাত নিজের হাতেই লেঠেলদের হাতগুলো এমনভাবে ভেঙে দিয়েছে যাতে তারা আর কোনদিন লাঠি ধরতে না পারে।

না, জমিদার রামনারায়ণকে তারা প্রাণে মারেনি।

তার হাত-পা বেঁধে মস্ত গেটে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তার আগে অবশ্য তার গলার ওপর মস্ত রামদাখানা চেপে ধরে বলে দিয়েছে, আর যদি খাজনা আদায় করতে কেউ সেই গ্রামগুলোতে যায়, তাহলে সেখান থেকে কেউ আর ফিরবে না।

খাজনার সঙ্গে যা যা লুঠপাট করে নিয়ে এসেছে লেঠেলরা, তার দশগুণ জিনিস বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ফেরার সময় সেই সব গ্রামে রেখে এসেছে কালী ডাকাতের দলের লোকেরা।

এতসব করতে গিয়ে কালী ডাকাত নাকি এবার মাথায় আঘাত পেয়েছে।

জমিদার বাড়ির কয়েকজন প্রাণের ভয়ে লুকিয়েছিল। তারা দেখেছে, কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে কালী ডাকাতের।

কালী ডাকাতের মাথায় আঘাত লাগার কথাটা শুনে অবশ্য গাঁয়ের সবাই দুঃখ পেল। এমন যে ডাকাত, তার আঘাত পাবার কথায় দুঃখ পাওয়াই তো উচিত।

সারাদিন ধরে এই গল্প গ্রামের রাস্তায়, মাঠে-ঘাটে পুকুরপাড়ে চলল। সবাই জানে, নতুন কোন ঘটনা যতক্ষণ না ঘটবে, ততক্ষণ এই গল্পই চলবে গ্রামে।

এমন খুশির গল্প আর কী হতে পারে!

জমিদার রামনারায়ণের বাড়িতে ডাকাতির দু'দিন পর গ্রামের দু'জন ভোর-ভোর সময় কালী মন্দিরে পুজো দেবার জন্য রওনা হল।

জঙ্গলের পথ পেরিয়ে যখন তাঁরা এসে পৌঁছুল কালীমন্দিরে, তখন সকালের রোদে ভোরে উঠেছে চারদিকে।

ধূপধুনোর গন্ধে ভরে উঠেছে মন্দির প্রাঙ্গণ।

তারা এসে দাঁড়াল মা কালীর সামনে। গড় হয়ে প্রণাম করল।

প্রণাম করে উঠেই ঘুরে দাঁড়াল, পুরোহিত ঠাকুর দাঁড়িয়ে। মাথায় তার মস্ত একটা ফেট্টি। ফেট্টির একটা জায়গা রক্তে ভেজা।

চমকে উঠল দু'জন।

মাথা ফাটলো কী করে পুরোহিত ঠাকুরের?

একজন কথাটা জিজ্ঞেস করলো পুরোহিত ঠাকুরকে। হাসলেন পুরোহিত

ঠাকুর। বললেন, 'জেনে কী হবে?' দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল।

'কী ভাবছ?' পুরোহিত ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন এবার। ফের দু'জন তাকাল পুরোহিত ঠাকুরের দিকে।

কালী ডাকাত মাথায় ফেট্টি বেঁধে মুখ ঢেকে ডাকাতি করতে আসে। শুধু দু'টো চোখ ছাড়া তার মুখ কখনও কেউ দেখেনি।

সেই কালী ডাকাতের মাথা ফেটেছে জমিদার রামনারায়ণের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে। পুরোহিত ঠাকুরের মাথাও ফেটেছে। একই ঘটনা একই সঙ্গে দু'জনের ঘটেছে।

পুরোহিত ঠাকুরের কাছে মা কালীকে বলার জন্য মনের ইচ্ছেটা বললেই পূর্ণ হয়।

কালী ডাকাতের চেহারার যে বর্ণনা শুনেছে সবাই পুরোহিত ঠাকুরের চেহারার সঙ্গে তার মিলও তো আছে। সেই মস্ত লম্বা চওড়া চেহারা! সেই গলার স্বর—

পুরোহিত ঠাকুর এবার হাসলেন দু'জনের দিকে তাকিয়ে। তারপর বললেন, 'জানি, আমায় তোমরা কালী ডাকাত বলে ভেবে ফেলেছে। সত্যিই আমি কালী ডাকাত।'

দু'জন কিছু বলতে পারল না। ভয়ে, উত্তেজনায় দু'পা পিছিয়ে গেল তারা।

পুরোহিত ঠাকুর বলল, 'শোনো, তোমরা তোমাদের মনের ইচ্ছেটা বলে চলে যাও। আমি তোমাদের নামে মা কালীর কাছে পুজো দিয়ে দেব।'

কোন রকমে মনের ইচ্ছেটা বলে দু'জন সেই যে ঘুরে ছুট দিল গ্রামের দিকে, একবারের জন্যও আর পেছন ফিরল না।

দিন কয়েক পর অনেক ভেবে, সাহস করে যখন গ্রামের কয়েকজন সেই বনের ভেতরের রাস্তা পেরিয়ে কালী মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছুল, তখন অবাক হলো সবাই।

মন্দিরের দরজা খোলা! মা কালীর মূর্তি নেই সেখানে! চারদিক নির্জনতায় থমথম করছে।

কারো আর বুঝতে অসুবিধা হলো না, কালী ডাকাত মন্দির ছেড়ে চলে গেছে। সত্যিই, সবাই যখন জেনে গেছে সেই কালী ডাকাত, তখন কি আর তার থাকা চলে মন্দিরে?

কিন্তু কালী-ডাকাত তো তাদের কাছে পুরোহিত ঠাকুর।

সে সবার ইচ্ছে পূর্ণ করে মা কালীর নামে।

কি জানে, আর কখনও সে ফিরে আসবে কিনা।

নির্জন মন্দিরে গ্রামের লোকেরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়েই রইল।

একটি অভিনব ডাকাতি

পার্কে আনন্দ বসেছিল। তাকে ঘিরে ক'জন বন্ধু। এক কোণায় রাজ্যের ডাঁই করা আবর্জনা। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ন্যাড়া গাছটার ডালে কয়েকটা কাক বসে ডাকছে।

অমল পিঠে হাত রেখে বলল, আনন্দ, এমন নিরানন্দ হয়ে বসে থাকিস না। উপায় একটা হবেই।

আনন্দের চোখে উদাস শূন্যতা, কী হবে? পয়সা কোথায়? অপারেশনের খরচ ষাট-সত্তর হাজার টাকা। সেদিন তো সঙ্গে ছিলিস। শুনেছিস। ডাক্তাররা তো বলেই দিল—এর কমে হবে না।

অমিত বলে, আমরা জানি। ও-রকম অপারেশনের খরচ ওই রকম। টাকাটা যোগাড় করতে হবে মাসিমার জন্য। আমরা সকলে সেটা করব। কিছু ভাবিস না।

—ভাবব না? চাকরি নেই। পড়াশুনা করে চাকরি যোগাড় হল না। অফিস থাকলে 'লোন' নিতে পারতাম। কোন বড়লোক আত্মীয়-স্বজন নেই। হাত

পাতলে যারা সাহায্য করবে। টিউশনি ক'রে যা পাই তাতে মাস চলে না।.........

সুজিত কথা থামিয়ে দেয়। বলে, এ আর নতুন কথা কি? আমরা সকলে গ্র্যাজুয়েট। সকলেই বেকার। বয়স সকলের প্রায় শেষ হয়ে এলো। চাকরি আর জুটবে না, সারা জীবন এ রকম বেকারই থাকতে হবে। আমাদের দেশের কোটি কোটি এরকম বেকারদের জন্য জনদরদী কোন নেতা ভাবে না। সরকারও ভাবে না।

সমীর ফোঁস করে উঠল, সরকার সরকার করিস না তো! সরকারের মন্ত্রিগুলোর কেচ্ছাকাহিনী কাগজে দেখছিস না? কত রকমের কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে আছে নিজেরাই। বড় বড় চুরি। বড় বড় রাহাজানি। বড় বড় ডাকাতি। ওরাই আবার ভাববে আমাদের কথা?

আনন্দ মাথা তোলে কি বলছিস তুই! সরকারের কেউ কেউ অসৎ ব'লে তো সকলে অসৎ নয়।

—বেশ, তা স্বীকার করি। কিন্তু কিছু যদি সৎ থাকে তা দিয়ে হয় না। দু'জন মস্তান বিশজন মানুষের সামনে মস্তানি করে বেরিয়ে যায়। ভয়ে আর সব চুপ করে থাকে। পাঁচজন লোক রেললাইনে বসে ট্রেন আটকায়। কয়েকশ লোক স্টেশনে থাকলেও ঝামেলা এড়াতে—স্পিকটি-নট। আর সরকারের কথা বলিস না। প্রশাসনের কথা বলিস না। কোনটা করছে তারা? পুলিশ বাঁ-হাতে টাকা নিয়ে গাল চাটছে তোলাবাজদের আর ডাকাতদের।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অমল বলে, কি ভাবছিস তোরা?

অমিত বলে, ভাবি নি। তবে আমাদের ভাবতে হবে। আনন্দের মা তা বলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে?

সুজিত বলে, অপারেশনের টাকা যেভাবেই হোক যোগাড় করতে হবে আমাদের।

সমীর বলে, ঠিক। এই কথা আমি বলতে চাইছিলাম। আর টাকা যোগাড় করবই। যে ভাবে হোক।

কদিন পর। তখন বিকেল তিনটে। চারতলার একটা ফ্ল্যাটে কলিংবেল বেজে উঠল। সুরেলা এক মিষ্টি আওয়াজ ভরে উঠল ভেতরে।

ভিতরে ছিলেন এক বৃদ্ধা। তিনি দরজা খুললেন। দেখলেন,—চার-পাঁচজন ছেলে।

বললেন, পুজোর চাঁদা? চাঁদা আমি তো দিতে পারব না। তোমাদের আসতে হবে তা হলে সাড়ে চারটে পাঁচটায়। বৌমা না এলে..............

—জানি। কাকিমা স্কুল থেকে ফেরেন চারটের পর। কিন্তু আমরা চাঁদার জন্য আসিনি, ঠাকুমা।

—তবে?

—আমরা এসেছি একটা সমস্যায়। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি পরামর্শ দিয়ে সমাধান করতে পারবেন।........একটু ভিতরে কি বসব?

বৃদ্ধা বললেন, বসবে? আজকাল যা দিন এসেছে কাকে বা বিশ্বাস করে ঘরে বসাই।

ছেলেদের একজন বলে উঠল, ঠিক বলেছেন, ঠাকুমা। দুপুরের দিকে বাড়িতে কেউ নেই দেখে, ফেরিওয়ালারা দরজায় কড়া নেড়ে—কাপড়-চোপড় থালা-বাসন বিভিন্ন কসমেটিক বিক্রির ছুতোয় ডাকাতি করে যাচ্ছে।

এরপর এক একজন বলে চলল।

—এখন দুপুর নয়। তিনটে বাজে।

—আমরা কিন্তু ফেরিওয়ালা নই।

—কেবল আপনার সঙ্গে দরকার বলেই.........।

বৃদ্ধ বললেন, এসো। বসো। কি বলছ শোনা যাক।

ছেলেগুলো সব এবার সোফায় বসে পড়ে।

খুব বিনীত ভাবে একজন আরম্ভ করে।—ঠাকুমা। আমাদের বন্ধুটির মা খুবই অসুস্থ। নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। দু-একদিনের মধ্যে অপারেশন হবে। অথচ বন্ধুটি বেকার। বি.এ. পাস। কিন্তু কোন চাকরি নেই। আমরা যে সাহায্য করব—তার উপায় নেই। সবাই বাবার হোটেলে খাই। আমরা কেউ বি.কম. কেউ বি.এস.সি. কেউ এম.কম। সে-রকম মামা খুঁজে না পাওয়ায় কেউ চাকরি যোগাড় করতে পারিনি।

অথচ আমরা ওকে সাহায্য করতে চাই।

আমরা যে-যার আত্মীয়দের বাড়িতে ঘুরেছি। কেউ কিছু দিতে রাজি হয় নি। সবাই-এর প্রশ্ন, শোধ দেবে কি করে?

তাই আপনার কাছে এসেছি। বন্ধুটি এসেছে, আমরাও এসেছি। বসাককাকু আমাদের কারোর আত্মীয় নন—জেনেও। অথচ, তিনি একজন মানুষ। একজন বিত্তবান মানুষ। বসাক জুয়েলারি স্টোর্সের মালিক। তিনি কি অপারেশনের

খরচ ষাট-সত্তর হাজার টাকা ধার দিতে পারেন না? আমরা কিছু বন্ধক রেখে ধার নিতে পারব না। সততার জামিনে এই কর্জ পেতে চাই। একদিন না একদিন আমরা শোধ দেবই।

বৃদ্ধা অর্থাৎ বসাক জুয়েলারি স্টোর্সের মালিকের মা বললেন, অতগুলো টাকা কেউ কি এরকম ভাবে দিতে পারে, বাবারা। আমার ছেলে কেন, অন্য কোন বড় বিত্তবান মানুষ—কেউ পারবে না।

ছেলেগুলো প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'বাবা' বলবেন না, ঠাকুমা। আমরা সকলেই আপনার নাতি।

—নাতি?

—হ্যাঁ।......জানি আপনার বৌমার কোন ছেলে নেই। আমরা আপনার বৌমার ছেলে মানে আপনার নাতি হতে পারি না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তা পারো বই কি?

—তবে কি আমরা এই বন্ধুর মায়ের অপারেশনের টাকাটা আপনার কাছ থেকে পাব না?

বৃদ্ধা দোলাচল মনে বললেন, তা কি করে হয়।

তারপর পাঁচজনের দু'জন বসে রইল সোফায়। তিনজন উঠে দাঁড়াল। ঠাকুমা, বাথরুমটা কোন্ দিকে? একটু বাথরুম থেকে আসি।

দুজন বৃদ্ধার সঙ্গে গল্প করে চলেছে। আর তিনজন তখন ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানার তোষকের নীচ, কিংবা ড্রায়ার টেনে খুঁজে নিতে ব্যস্ত আলমারির চাবি।

চাবি খুঁজেও পেয়েছে।

আলমারি খুলে পেয়েছে কিছু সোনার গয়না ও নগদ টাকা। সেগুলো ভরে নিয়েছে এক সাইড ব্যাগে। তারপর কেউ হাতে পিস্তল—কেউ হাতে ছোরা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধার।

বৃদ্ধা আঁতকে ওঠেন, একি? তোমরা ভাল মানুষ সেজে ডাকাতি করতে এসেছিলে?

—চেঁচামেচি করবেন না, ঠাকুমা। একদম না। তাহলে অন্য কিছু করে ফেলতে আমরা পিছপা হব না। প্লিজ ঠাকুমা প্লিজ।........

আর, আমরা ভালমানুষ সেজে নয়, আমরা এখনও ভাল মানুষ। আপনার কাছে অনুরোধ রেখে, কিছু পাওয়ার আশ্বাস পাইনি। তাই আমরা ডাকাত নয়; ডাকাত সেজেছি। বন্ধুর মায়ের অপারেশনে যেমন খরচ লাগে—সে মত গয়না ও নগদ নিয়ে চলে যাচ্ছি।

চলে যাওয়ার সময় সকলে একে একে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বৃদ্ধাকে।

—আশীর্বাদ করুন, ঠাকুমা। যেন আমাদের আর কোনদিন এরকম ডাকাতি করতে না হয়।

বুনো ডাকাত

অমিতাভ রায়
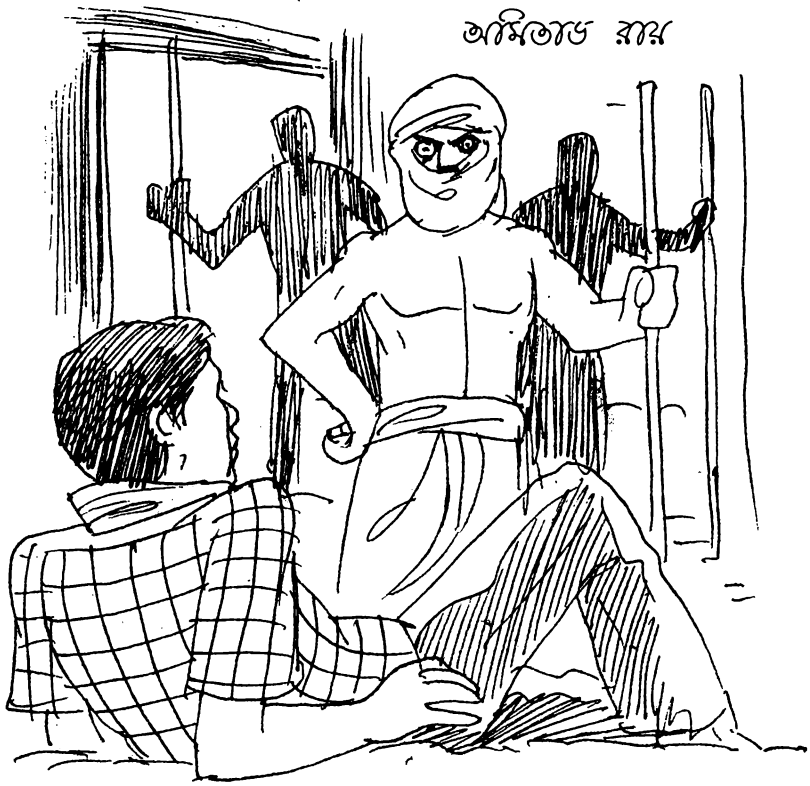
সবে শীত পড়েছে। দিন ছোট হতে শুরু করেছে। খেয়েদেয়ে সকাল সকাল শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরেছিলাম যাতে দিনের আলো থাকতে থাকতেই রাঙা দ্বীপে পৌঁছতে পারি। আমরা ভেবেছিলাম এক আর হল আর এক। দলের কয়েকজন ভীড়ের জন্য ট্রেন থেকে নামতে পারল না, তাদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সবাই মিলে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শুনি এ রাস্তায় কদিন থেকেই বাস বন্ধ। অগত্যা সাইকেল ভ্যানে করে যখন জামতলা পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যে গাঢ় হয়েছে। ভাগ্য ভাল, ঘাটে একটা ভুটভুটি ছিল অনেক অনুরোধের পর সে রাজি হল আমাদের রাঙাদ্বীপে পৌঁছে দিতে। ছজনের দলটা যখন রাঙাদ্বীপের ঘাটে কাদায় হাবুডুবু খেতে খেতে ডাঙার দিকে আসছি তখন ঘোর অন্ধকার। ভুটভুটির সারেং হ্যারিকেন নিয়ে আগে আগে চলেছে। আগে থেকে খবর পাঠানো ছিল আমরা আসছি সুতরাং আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পাকা ছিল। কোন ক্রমে স্কুল বাড়িতে ঢুকে খেয়ে নিয়েই সবাই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম।

রাঙাদ্বীপে আমরা অবশ্য নতুন নয়। এটা দ্বিতীয়বার আমাদের আসা। সুন্দরবনের মধ্যে একটা বড় দ্বীপ এই রাঙাদ্বীপ। অনেক লোকের বাস। এখানকার

মানুষজন খুব ভালো আর সরল। রাঙাদ্বীপের অগ্রগতি ক্লাব অনেক বছর ধরে একটা বড় জমাটি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। আশপাশের পাঁচ সাতটা দ্বীপ থেকে ভুটভুটি করে ছেলে বুড়ো সব খেলা দেখতে আসে। অন্য কোন বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকায় ফুটবল প্রতিযোগিতাটা এখানকার মানুষ চেটেপুটে উপভোগ করে। জেলার দলগুলোতো আছেই সঙ্গে কোলকাতা, হাওড়ার অনেক দলই এই প্রতিযোগিতায় খেলতে আসে। আমাদের ক্লাব ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন গত বছরই এই প্রতিযোগিতায় খেলতে আসে। শুধু খেলতে আসা নয়। সবার মন জয় করে আমরা চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিলাম। এবার উদ্যোক্তারা তাই আমাদের স্পেশাল খাতির করে ডেকেছে। খেলা শুরু দিন তিনেক পর। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে সুন্দরবন বেড়াবার। উদ্যোক্তাদের বলে কয়ে আমরা ছয়জন তাই আগেই হাজির হয়েছি। দলের সবাই পরে আসবে।

তখন গভীর রাত, পথের ক্লান্তিতে ঘুমটা খুব জমাট হচ্ছিল, হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে টিম টিম করে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। আবছা আলোয় দেখলাম সঙ্গীরা ঘুমোচ্ছে। পাশ ফিরে চোখ বুজিয়েছি.........মনে হল কারা যেন চাপা গলায় কথা বলছে। গ্রামে গঞ্জে শুনেছি এখনো ভূত-টুত আছে। ভয় পেয়ে অপুকে ডাকলাম। ঘুমকাতুরে অপু হ্যাঁ, হুঁ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ দরজায় ঠক্ ঠক্ ঠক্ শব্দ। তড়াক করে বিছানার উপর বসে দেখি অপু কেন সবার ঘুম ছুটে গেছে। অবাক হয়ে আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি আবার ঠক্ ঠক্ ঠক্। এবার আমরা বেশ ভয়ই পেলাম। ঘরের বাইরে একাধিক লোকজনের কথা আর নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছি। খেলার মাঠে অপু ডাকাবুকো ব্যাক হলেও বাস্তবে অপুই সবচেয়ে ভয় পেল। গোলকিপার তিমির দরজা খুলবে বলে টর্চ নিয়ে এগোচ্ছে এমন সময় মড় মড় মড়াৎ। দরজাটা ভেঙে পড়ল। ভাঙা দরজা দিয়ে হুড় হুড় করে কয়েকটা লোক ঘরে ঢুকে পড়ল। লোকগুলোর মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। ষণ্ডামার্কা চেহারা। সবার হাতে তেল চুকচুকে লম্বা লাঠি। একজন দরজা আগলে দাঁড়িয়ে, যাতে আমরা পালাতে না পারি। বুঝতে পারলাম ভূত-টুত নয় ডাকাত পড়েছে। তিমির বলল আপনারা বোধহয় ভুল করছেন আমরা খেলতে এসেছি সঙ্গে কিছু নেই।'

সর্দার মত একটা লোক বলল—'আমরা ভুল করিনি। চলুন। ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন।

বুঝলাম প্রতিবাদ করে লাভ নেই। ভয়ে ভয়ে ঘর থেকে বেরোলাম। আড় চোখে গুনে দেখি দশ দশ জন ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি। গম্ভীর গলায় এক ডাকাত বলল—'পা চালিয়ে চলুন।'

অপু ভয়ে বলে ফেলল—'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের?'

—কথা বলবেন না।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে এগোতে থাকি আমরা। ডাকাত দলের নির্দেশ মত ঘাটে বাঁধা ভুটভুটিতে উঠতে হল আমাদের। অবশ্য ডাকাতগুলো আমাদের কোলে তুলে ভুটভুটিতে তোলায় কাদা মাড়াতে হল না। অন্ধকারে নদীতে বিকট

শব্দ করতে করতে ভুটভুটি চলতে থাকল। নিথর নিস্তব্ধ পরিবেশে কেবল ভুটভুটির যান্ত্রিক শব্দ। সেই শব্দকেও ছাপিয়ে শুনতে পাচ্ছি নিজেদের বুকে হাতুড়ি পেটার শব্দ। ডাকাতদের কি উদ্দেশ্য, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে কিছুই জানি না। আর জানলেও করার কিছু নেই। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কানে এলো ডাকাতের নির্দেশ—'বাবুরা এবার নামতে হবে।' ডাকাতের মুখে 'বাবুরা' সম্বোধন শুনে আমরা আরো ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করার সাহস না দেখিয়ে সবাই সুড় সুড় করে নেমে পড়লাম। দিনের আলো ফুটতে শুরু হয়েছে। যতদূর বুঝতে পারছি আমাদের অন্য কোন দ্বীপে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা মাটির বাড়ির সামনে এসে ডাকাত দলের একজন হাঁক পাড়ল—'বাবুরা এসে গেছেন।' ভেতর থেকে এক প্রৌঢ় বেরিয়ে আন্তরিক ভাবে বললেন—"এমন ভাবে ধরে আনতে হল বলে দুঃখিত। আপনারা ভেতরে আসুন।'

ভদ্রলোকের কথায় কিঞ্চিৎ ভরসা পেয়ে বললাম—কিন্তু আমাদের ধরে আনার কারণটা কি?

—সব বুঝতে পারবেন। আপাতত আপনারা বন্দী। আমাদের সতর্ক পাহারা আছে, পালাবার চেষ্টা করবেন না। খানদান, মাঠে খেলুন, ভুটভুটি নিয়ে বনে বেড়ান......কিন্তু খবরদার, পালাবার চিন্তা মনেও আনবেন না।

তিমির বলল—'কিন্তু আমাদের আটকে কোন লাভ হবে না। মুক্তিপণ টণ দেবার মত অবস্থা আমাদের নয়। আপনারা শুধু শুধু.....।' কান্নায় বুজে আসে তিমিরের গলা।

প্রৌঢ় বললেন—'ভয় পাবেন না। মুক্তিপণ আদায় আমরা করব না। আপনাদের শুধু একটা কাজ করে দিতে হবে, ব্যাস। শুনুন চিন্তা করবেন না বাড়ির ঠিকানা দিন, সবায়ের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দেব।'

অগত্যা ছয়জন বাড়ির ঠিকানা বলে ব্যাজার মুখে বাড়ির ভেতর গিয়ে

দেখি আমাদের জন্য এলাহী ব্যবস্থা। বড় বড় কাঁসার থালায় ভাত, মাছের মুড়ো, চিংড়ি মাছের ঝাল আরো কত কী। ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝতে পারছি না। বন্দীদের প্রতি এমন জামাই আদর করা হয় ধারণা ছিল না।

প্রথম দিনটা খুব উদ্বেগে কাটল। কিন্তু পরের দিন থেকে মনেই হল না আমরা বন্দী। প্রৌঢ় ভদ্রলোক সব ব্যবস্থা করেছেন—খাওয়া দাওয়া, সুন্দরবন বেড়ানো, বাস। খবরের কাগজ জোগাড় করে দেওয়া.....সব। চতুর্থ দিন সকালে প্রৌঢ় বললেন—'আর মাত্র কটা দিন আপনাদের আটকে রাখব। এই কদিনে আপনারা আমাদের জন্য দুটো কাজ করে দেবেন।'

বন্দীত্ব ঘুচবে শুনে উৎসাহে অপু বলে—'কি কাজ বলুন না। এখনই করে দিচ্ছি।'

—ব্যস্ত হবেন না। আপনাদের কোন ক্ষতি আমরা করব না। কাল সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে আমরা এক জায়গায় যাব। যাবার পথে বলব কি কাজ।

মুক্তি পাব বলে খুব ভাল লাগছিল। কিন্তু কি কাজ, না পারলে কি শাস্তি হবে—এই সব ভেবে আবার একটা ভয় চেপে ধরল। অবশ্য যারা আমাদের চুরি করে এনেছে তাদের হাবভাব, আচার-আচরণ কিন্তু ডাকাতসুলভ নয়। উপরি যে গ্রামে আমরা নজরবন্দী সেই গ্রামের ছেলেপুলেরা আমাদের দলটাকে দেখলে বেশ সমীহ করছে।

সেদিন সকাল সকাল খেতে দিল। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বেলা বারোটা আন্দাজ—একদল লোক এসে বলল—'তৈরি হয়ে নিন বেরোতে হবে।' বাধ্য ছেলের মত বাড়িটা থেকে বেরিয়ে বুক শুকিয়ে গেল। সারা পাড়ার যত ছেলে বুড়ো জড়ো হয়েছে বাড়ির সামনে। সঙ্গে ঢাক ঢোলও আছে। আমরা বেরোতেই পাড়ার মেয়ে বৌরা ফুলের মালা আর চন্দনের টিপ পরিয়ে দিল। কালীঘাটের মন্দিরে ছাগল বলি দেবার সময় ছাগলটাকে যেমন মালা চন্দন পরানো হয় তেমন হতে লাগল আমাদের সাথে। কথাটা ফিস্‌ফিস্ করে অপুকে বলতেই অপু ভেউভেউ করে কেঁদে উঠল—'আমাদের কি বলি দেবেন আপনারা।' জনতা হৈ হৈ করে উঠল। এবার আমরা সবাই ভয় পেলাম, মুখ কাঁদ কাঁদ আর আমাদের অবস্থা দেখে জমায়েতে হাসির রোল উঠল, ঢাক বেজে উঠল। আমাদের সামনে রেখে জনতা হাঁটতে শুরু করল। আমরা কাকুতি মিনতি করতে লাগলাম বাঁচার জন্য। কে শোনে কার কথা। কোল পাঁজা করে ভুটভুটিতে নিয়ে তুলল। এবার আর কান্না চাপতে পারলাম না, সবাই কেঁদে ফেললাম। নিশ্চিত মৃত্যু সামনে দেখতে পাচ্ছি। প্রৌঢ় ভদ্রলোক উঠতেই ভুটভুটি চলতে শুরু করল। প্রৌঢ় কাছে আসতে তাঁর পায়ে পড়লাম। প্রৌঢ় বললেন—তোমাদের বাঁচাতে পারি কিন্তু দুটো কাজ করতে হবে।' সমস্বরে বললাম—করব! করব!

প্রৌঢ় বললেন—'তবে ধৈর্য ধরুন।' ইতিমধ্যে আমাদের পিছনে আরো পাঁচখানা ভুটভুটিতে গ্রামের লোক ভর্তি হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ চলার পর মনে হল নদীর ধারের দৃশ্য চেনা লাগছে। তিমির বলল—'আরে এ যে রাঙাদ্বীপ!'

সত্যিই তো আমাদের ভুটভুটি রাঙাদ্বীপের ঘাটে ভিড়ছে। ঘাটের আশপাশে প্রচুর নৌকা, ভুটভুটি, ট্রলার দাঁড়িয়ে। চারিদিকে খুব ভীড়। অপু আক্ষেপ করে বলল—'ইশ্! কোথায় এই দ্বীপে খেলব, না ডাকাতের খপ্পরে পড়লাম।

প্রৌঢ় বললেন—'নামতে হবে।'

আশ্চর্যের ব্যাপার প্রৌঢ় আর তাদের গ্রামের লোকজন আমাদের নিয়ে খেলার মাঠের দিকেই চলেছে। মাঠের কাছে গিয়ে প্রৌঢ় বললেন—'বাছারা কোন প্রশ্ন না করে খেলার জামা, গেঞ্জি, বুট করে নাও।' আমাদের পরার জন্য জার্সি দেওয়া হল। ধরাচুড়ো পরে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছি। প্রৌঢ় বললেন—'বাবারা তোমাদের কাজ আর কিছু নয়। আমাদের গ্রামের ক্লাবের হয়ে খেলে দুটো ম্যাচ জিততে হবে।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম—'সে আগেই বলতে পারতেন শুধু শুধু এই কটাদিন আমরা কি না চিন্তা করলাম।'

প্রৌঢ় বললেন—'দুঃখিত বাবারা। কিন্তু কি করব বল। এত বছর প্রতিযোগিতা হচ্ছে অথচ স্থানীয় কোন দল আজ পর্যন্ত জিততে পারল না। গত বছর তোমাদের খেলা দেখে ভালো লাগে। তখনই ঠিক করেছিলাম আমাদের দলের হয়ে তোমাদের খেলাব। এবছর অনেক কষ্টে আমাদের দল সেমিফাইনালে উঠেছে। আর মাত্র দুটো খেলায় জিতলে সুন্দরবনের ধ্বজা আকাশে উড়বে। বাবারা তোমরা ভরসা। অনেক অবিচার করেছি তোমাদের ওপর। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষের মন থেকে হেরো তকমা তোলার জন্য তোমাদের ধরে আমাদের দলে খেলাচ্ছি। অপরাধ হলে ক্ষমা কর।' প্রৌঢ়ের চোখে জল। প্রৌঢ় যখন কথা বলছিল গ্রামের সমর্থকরা আমাদের ঘিরে ধরেছিল। তাদের প্রত্যেকের চোখে একই আকুতি—'আমরা জিততে চাই।' আমাদের দলনেতা তিমির বলল—'ঠিক আছে আমরা খেলব।'

মাঠে নেমে শুনি সুন্দরবন ক্লাবের হয়ে সেমিফাইনালে আমাদের খেলতে হবে সেই ফ্রেন্ডস ইউনিয়ানের বিপক্ষে যেখানে খেলে আমরা বড় হয়েছি অর্থাৎ আমাদের নিজেদের ক্লাবের বিরুদ্ধে। ধন্দে পড়লাম, সুন্দরবন ক্লাবের কর্তাদের অনুমতি নিয়ে আমরা ছুটলাম ফ্রেন্ডসের কোচ আমাদের প্রিয় বাবুদার কাছে। তাঁকে সব বলতে তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন—'যারা খেলাকে এত ভালোবাসে তাদের হয়ে খেলা গৌরবের।' ব্যাস সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছেড়ে আমরা সুন্দরবন ক্লাবের হয়ে খেললাম। দু দুটো খেলাতেই জিতে চ্যাম্পিয়ান হলাম। ঢাক ঢোল বাজিয়ে সবাই খুব মজা করতে লাগল।

পরদিন আমাদের মুক্তির দিন। বিদায় জানাতে এলো গ্রামের সবাই। প্রৌঢ় বললেন—'বুনো ডাকাতদের ক্ষমা কোরো বাবারা।'

দলনেতা তিমির বলল—'আগামী বছরও আপনাদের দলের হয়ে খেলব।'

আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল গ্রাম ভর্তি শতেক বুনো ডাকাত, কাঁদতে লাগল শহুরে ছটা ছেলেও।

কালু ডাকাতের নবজন্ম

পুন্ডরীক চক্রবর্তী

আমায় তুমি ডেকেছ বাবা?

হ্যাঁ, বসো। তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে।

রাম একটু আশ্চর্য হল। হঠাৎ কী এমন জরুরি কথা এই সন্ধেবেলায়। মনে মনে একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করে। শুধু উত্তেজনাই নয়, কিছুটা ভয়ও পেল। রাম শুধু তার বাবাকে ভয় পায়, তা নয়। ভয় পায় এলাকার সব মানুষজন।

এলাকার কুকুরগুলো পর্যন্ত লেজ গুটিয়ে বসে থাকে।

আসলে কালুডাকাতের যেমন বাজখাই গলা তেমনি মেদবহুল স্বাস্থ্য। রঙটাও যদি ফর্সা হত অন্য কথা ছিল। মোষের চামড়া কেটে বসানো। তার ওপরে চোখ দুটো জবা ফুলের মতো টকটকে লাল। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। রাতের বেলা দেখলে তো কথাই নেই। দিনের বেলা দেখলেই বুক কাঁপে। লোকে বলে অসুর। অবশ্য তা আড়ালে।

পাড়ার মানুষজনও সমীহ করে কথা বলে। সমীহ না করে উপায় কী? কালুডাকাত যে গরীব মানুষদের কাছে দেবতা। আর ধনী ব্যক্তিদের কাছে সাক্ষাৎ

যম। এই সম্মান ও ভয় পাশাপাশি হাঁটে কালুডাকাতের জীবনে।

দরজাটা ভেতর তেকে ভেজিয়ে দিয়ে চাপা গলায় কালুডাকাত বলল, এখন তুমি বড় হয়েছ। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। আমার অর্জিত ধনদৌলত, সম্পত্তি সবই উত্তরাধিকার সূত্রে তুমি তার মালিক হবে। আমিও তাই ঠিক করেছি এখন থেকে আমার সঙ্গে থাকবে। আমার বয়েস হচ্ছে, আস্তে আস্তে কাজ দেখাশোনা, দল পরিচালনার দায়িত্ব তোমাকেই বুঝে নিতে হবে।

কী বলছ বাবা। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কালুডাকাত গম্ভীর স্বরে বলল, আমি কি করি নিশ্চয়ই তুমি তা জানো।

রাম মাথা নিচু করে নেয়। বাবা কি করে সে আজ জানে বৈকি।

তখন ও কত ছোট। ফিসফিসানি কথায় ঘুম ভেঙে যেত রাতে, ওর কৌতুহল হত। কান পাতত। কী বলছে বাবা, নিশুতি রাতে চাপা গলায় মাকে! সে বুঝতে পারত বাবা যেন কোথাও যেতে চায়। মা প্রাণপণ বাধা দিচ্ছে। আবার অনেকদিন ঘুম ভেঙে দেখেছে বাবার বিছানা খালি। মা, মাঝরাতে জানলার রড ধরে উদ্বিগ্ন হয়ে কখনো দাঁড়িয়ে, কখনও বা ঘরবার পায়চারি খাচ্ছে। আবার সকালে উঠে দেখত বাবা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। এই গোলকধাঁধার রহস্য বোঝার বয়েস তখন হয় নি।

এও দেখত রাম, হঠাৎ কাকভোরে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে তাদের বাড়িটাকে। পুলিশ দেখে রামের বুক কাঁপত। প্রশ্ন জাগত, তাদের বাড়িতে এত পুলিশ কেন? পাড়াপড়শিরা উঁকি ঝুঁকি দিত। বাবাকে কেন জানে না পুলিশে থানায় ধরে নিয়ে যায়। বাবাকে ধরে নিয়ে যায় কেন? সরাসরি মাকে প্রশ্ন।

মা নিশ্চুপ। পাথর।

বলো না মা, চুপ করে আছো কেন?

মা চোখের জল মুছত। এড়িয়ে যেত। ব্যাপারটা কৌতুহল ও রহস্যে ঘেরা থাকত রামের কাছে। একটু বড় হতে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেছে, বাবা তোমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় কেন?

কালু ডাকাত আর গোপন করেনি তার ছেলের কাছে। একদিন ডেকে বলল, শোন তাহলে, তোমার বাবার পেশা একরকম ডাকাতি করা। আরও জেনে রাখো তোমার ঠাকুরদার পেশাও ছিল ডাকাতি করা। আমার হাতে খড়ি তার কাছেই।

সে কী? ডাকাতি করা কারো পেশা হয় নাকি?

বাবার মুখে একথা শুনে দুপা পিছিয়ে গেছিল রাম। বলেছিল সে তো খুব মন্দ কাজ। ছি ছি ছি। বাবার প্রতি সব সন্তানেরই যে উচ্চ ধারণার বেলুন থাকে সেটা চুপসে গেল মুহূর্তে।

কালুডাকাত বলল, হ্যাঁ, মন্দ কাজ বৈকি। তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি ভাল কাজের জন্য মন্দ কাজ করি। আর তাই ডাকাতি করাতে আমার লজ্জা

নেই। বরং গর্ব বোধ করি। আর একটু বড় হলে তা জানতে পারবে। এর বেশি আর কোনদিন কিছু জানতে চেও না।

রাম এরপর থেকে আর কোনদিন কখনো বাবার কোন ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করেনি। বরং আহত মন নিয়ে যেটুকু জেনেছে, দেখেছে বাবাকে বস্তির মানুষগুলো কত আদর যত্ন খাতির করে। গরীব মানুষেরা বাবার নামে কপালে হাত ঠেকায়। বাবাকেও সে দেখেছে তাদের সুখ দুঃখের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছেনা, কার ছেলের চোখ অপারেশন। কোথায় কোন গ্রামে কল নেই। পাকা রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ আসছে না, এই সব ঝামেলায় বাবা আপনা থেকে এগিয়ে যায়। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে। অদ্ভুত মানুষ এই বাবা! তাই ভালো না বেসে শুধু অপরাধী করা যায় না।

শোন রাম, সামনের দিন থেকে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

না বাবা, আমার দ্বারা ও কাজ হবে না।

কী! বাবার মুখের ওপর কথা। খুব যে সাহস দেখছি তোমার!

রাম মাথা নিচু করে বলল, খেতে পাই না পাই ও পথে আমি যাব না। দরকার হলে কুলিমজুরের কাজ নেব।

হাঃ. হাঃ হাঃ হাঃ। কালুডাকাতের ছেলে হয়ে তুমি কুলি মজুরের কাজ নেবে!

হ্যাঁ, বাবা। অসৎভাবে উপার্জন করা টাকায় পরমান্ন খাওয়ার চেয়ে সৎভাবে খুঁদকুড়ো খাওয়া ভালো।

কোনটা সৎ আর কোনটা অসৎ বুঝে গেছ দেখছি। কালু ডাকাত বাজখাই গলায় বলল।

রাম আজ বাবার মুখের ওপর এই প্রথম মাথা উঁচু করে বলল, হতে পারে দলিত এক শ্রেণীর মানুষের মঙ্গলের জন্য তোমার উপার্জনের ধনসম্পদ বিলিয়ে দাও। কিন্তু তা বলে ডাকাতি করা, লুঠতরাজ করা সেটা কী সৎকাজ বলে মনে করে নিতে হবে?

কালুডাকাত গর্জন ছাড়ল, ডাকাত! ডাকাত! ডাকাত! ডাকাত কে না? উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ওরা ডাকাত নয়? ডাকাত সবাই। তাহলে?

রাম ঠাণ্ডাভাবে বাবাকে বোঝাতে চায়, তোমার ওই যুক্তিতর্কের সত্যতা এখানে খাটে না বাবা। একটু ভেবে দ্যাখো বুঝতে পারবে।

কালুডাকাত রক্তবর্ণ চোখে বলল, থাক, আর জ্ঞান দিতে হবে না। আমার কথার অবাধ্য হলে কী শাস্তি হয় জানো?

জানি বাবা।

বাবার এই নিষ্ঠুর মন্তব্যে রামের মনে মোচড় লাগে। সংসারে সবচেয়ে প্রিয়জন মা। যার আঁচলে সকল দুঃখকষ্ট ক্লান্তি মুছে ফেলা যায়। সেই মাকে তার আজ মনে পড়ছে। মা কি কম চেষ্টা করেছিল বাবাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে

আনতে। কিন্তু পারে নি।

সেই ভয়ানক দিনটির কথা মনে পড়লে আজও বুক কেঁপে ওঠে। চোখ ফেটে জল আসে।

ঘুম ভেঙে গেছে। মাঝরাত। বাবা আর মায়েতে চলছে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা। মা কিছুতেই বাবাকে সে রাতে ঘরের বাইরে যেতে দেবে না। বাবা সে বাধা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায়। মাও সেদিন মরিয়া। মার কথা শুনতে পেলাম লজ্জা করে নাঁ তোমার? একমাত্র সন্তান রামের সামনে পিতৃপরিচয় নিয়ে দাঁড়াতে?

না লজ্জা করে না।

তা করবে কেন? স্কুলের ছেলেরা ওকে কী বলে জানো?

কি বলে? কালু ডাকাত জানতে চায়।

বলে, তোর বাবা নিশাচর। তোর বাবা ডাকাত।

আমি তার জিব ছিঁড়ে নেব। কালু ডাকাত হুঙ্কার ছাড়ল।

মা বলল, শুনতে অপ্রিয় হলেও তারা তো মিথ্যে বলেনি।

মুখ সামলে কথা বলো। বাবাকে দেখে মনে হল ক্ষ্যাপা সিংহ।

মা আরও বলল, শাকভাত খেয়ে থাকব তবু ও পথ তোমায় ছেড়ে দিতে হবে। ও পথ ভয়ঙ্কর। রামের গায়ে কালি লাগতে শুরু করেছে। রামের গায়ে আমি আর নতুন কালি লাগতে দেব না।

বাবা যেন আর সময় নষ্ট করতে চাইল না। বোধ হয় দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎই এক হ্যাঁচকা মেরে বাবা মাকে ছুঁড়ে দিল দূরে। মা গিয়ে পড়ল ঘরের কোণে ছিটকে আনাজকাটা বঁটির ওপর। বঁটির ওপর পড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করে চিরদিনের মতো চুপ করে গেল মা।

মায়ের অকালমৃতুতেও বাবার হুঁশ ফিরল না।

রাম শেষবারের মতো মাথা নিচু করে আগুনে জলে ঢালার ভঙ্গিমায় বলল, বাবা, তুমি আমায় এতদিন দেখছ, কোনদিন কি তোমার কোন কাজে অবাধ্যতা করেছি?

না, তা করনি বটে।

তাহলে খামোকা আমার ওপর তুমি চটছো কেন? পায়ে পড়ি বাবা, আমাকে ও পথে টেনো না। আর তুমিও ও পথ ছেড়ে দাও।

ডাকাতি ছেড়ে কী ভিক্ষে করে খাব?

চুরি করা ধনরত্নে কাজ নেই বাবা।

বলিহারি স্পর্ধা তোমার। আবার আমায় জ্ঞান দিচ্ছ। আবার বলছি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেলে ফল ভাল হবে না। বেশ আমি দু-একদিন তোমায় ভাবতে সময় দিলাম। এই বলে কালু ডাকাত ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

থানায় নতুন বড়বাবু এসেছেন। খুব কড়া। রাশভারি। কালুডাকাতের নাম তিনি শুনেছেন। কিন্তু হাতে নাতে ধরা না পড়লে তো কাউকে ধরা বা শাস্তি দেওয়া যায় না। তাছাড়া সাধারণ মানুষজন কালুডাকাতকে যেভাবে আগলে

রাখে তাতে করে কিছু একটা করা মানে পাবলিকের বিরুদ্ধে যাওয়া। আজকাল পাবলিকের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে বোকামি। রাতারাতি বদলির নির্দেশ অথবা লাশ হতে হবে।

একদিন রাম দেখল তার বাবা ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

গণধোলাই চলছে। চড়, কিল, ঘুঁসি মুখে বুকে পড়ছে বৃষ্টির মতো। কেউ বলছে পা ভেঙে দে। কেউ বলছে হাতদুটো ভেঙে দে। কেউ বলছে চোখ দুটো উপড়ে নে।

মাটিতে গড়িয়ে পড়ে কী ভয়ানক মার তার বাবা খাচ্ছে। চোখে দেখা যায় না। এরি মধ্যে কে একজন বলল, থানায় দিলে পুলিশে হিস্যে নিয়ে ছেড়ে দেবে তার চেয়ে মেরে ফ্যাল। মর্গে পাঠিয়ে দে।

বাবা, বাবা করে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায় রাম।

ভাগ্যিস স্বপ্ন। সত্যি হলে রাম হার্টফেল করত। দুঃস্বপ্নের ভেতর রাম আগাম সর্বনাশের গন্ধ পেয়ে সময় নষ্ট করতে চাইল না। অনেকদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল তার মনে। এবার একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে তাকে।

ভেতরে আসতে পারি স্যার?

থানার বড়বাবু মুখ তুলে তাকালেন। একজন নব্য যুবক।

আসুন। কি চাই?

একটা খবর ছিল স্যার।

খবর শব্দটা শোনামাত্র দারোগাবাবু নড়ে বসলেন।

বলুন, কিসের খবর? চোখ ছোট করে শিকারির ভঙ্গিমায় দারোগাবাবু জানতে চাইলেন।

রাম বসল না। এদিক, ওদিক তাকিয়ে দেখল ঘরে দারোগাবাবু একাই আছেন। তার সুবিধেই হল। রাম কাঁপা ঠোঁটে ভয়ে ভয়ে বলল, যদি অভয় দেন তো বলি।

দারোগাবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, দিলাম, বলুন কী খবর? রামের ঠোঁট পুনরায় জড়িয়ে গেল। স্যার যদি............দারোগাবাবু সাহস দিয়ে বলেন, ভয় নেই বলে ফেলুন। প্রয়োজনে আমার কাছ থেকে সব রকমের সাহায্য পাবেন বলুন—।

রাম বলল, আজ রাতে কুসুমগঞ্জে অমল দত্তর বাড়িতে ডাকাত পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দারোগাবাবু শিউরে উঠলেন, সে কী! ভাবলেন নতুন কোন ইনফরম্যার। পরিচয় হয়নি। তা কাদের দল তাও জানা আছে নিশ্চয়?

আছে বৈকি স্যার।

দারোগাবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রামের গলা বুজে আসছিল চাপা কান্নায়, তা হোক, বলতে তাকে হবে। কালুডাকাতের দল।

কালুডাকাত! কালুডাকাত!

আস্তে স্যার, খবরটা জানাজানি হলে বিপদ আছে।

হ্যাঁ, তা আছে বৈকি। যাইহোক খবরটা পাকা হলে বকশিস পেয়ে যাবেন।

রাম আর দাঁড়ায় না। হন হন করে বেরিয়ে এসে রাস্তায় মিশে গেল।

দারোগাবাবু মনে মনে ভাবলেন, খবরটা যদি পাকা হয় তাহলে এ মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। নিশ্ছিদ্রভাবে কালুডাকাতকে ধরার ছক কষলেন তিনি।

শোনা কথা, কালুডাকাত সে নাকি ঘোষণা করেছে এবারে হাতেনাতে ধরা পড়লে ডাকাতি ছেড়ে দেবে। দেখাই যাক।

আধা বিশ্বাস আধা অবিশ্বাসে দারোগাবাবু লম্বা সিগারেট ধরালেন।

খবরটা পাকাই ছিল।

অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে স্বয়ং কালুডাকাত তার দলবল নিয়ে সবেমাত্র হাজির হয়েছিল দত্তদের নির্জন আমবাগানে আর অমনি বিনা মেঘে বাজ পড়ার মতো একটা জিপ এসে থামল ভেতরের রাস্তায়।

এতরাতে জিপগাড়ি। কালুডাকাত ও তার দলবলের বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না, পুলিশের গাড়ি। দলের কেউ নিশ্চয়ই তার সঙ্গে বেইমানি করেছে। কে করল এই বেইমানি? চোয়াল শক্ত করে ভাবে কালুডাকাত! কূলকিনারা পায় না।

আত্মরক্ষাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ।

কালুডাকাতের ইশারায় দলের লোকেরা পালাবার পথ খোঁজে।

বাঘা দারোগাবাবু! পালাতে দেবে কেন? শেষপর্যন্ত পুলিশের তাড়া খেয়ে কালুডাকাতের দল ছত্রাখান হয়ে গেল। যেদিকে পারল দৌড়ে পালাল।

কালুডাকাত তীরের মতো গোপন পথে দৌড়াতে থাকে। কিন্তু পালাবে কোথায়?

দারোগাবাবু তাঁর দলবল নিয়ে কঠিন বেড়াজালে ঘিরে ধরেছে।

দুচারটে বোমা ফাটল। বন্দুকের আওয়াজ উঠল। তারপর দলবলেরা সব এদিক ওদিক হাওয়া। কালুডাকাত সেই শুধু ধরা পড়ে গেল দারোগাবাবুর প্রায় মুখোমুখি।

খবরদার কালু, পালাবার চেষ্টা কর না। আমি কিন্তু গুলি করে দেব। দারোগাবাবুর কণ্ঠে নিষ্ঠুরতার স্বর। চ্যালেঞ্জ জানায় কালুডাকাতকে।

ওই অন্ধকারে বিপজ্জনক মুহূর্তে হঠাৎ আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রায় হাউমাউ করে সে কেঁদে বলল, দোহাই স্যার, গুলি করবেন না। উনি আমার বাবা। দারোগাবাবু মুখে টর্চের আলো মেরে দেখেন, সেই নব্য যুবকটি, যে থানায় নিজে গিয়ে দারোগাবাবুকে গোপন খবরটি দিয়ে এসেছিল।

দারোগাবাবু আকাশ থেকে পড়েন। চোখ কপালে তুলে বললেন, তাই নাকি?

হ্যাঁ স্যার, উনি আমার বাবা।

আশ্চর্য দারোগাবাবুর কয়েক মুহূর্তের জন্য সব গোলমাল ঠেকে। চাকরি জীবনে অনেক ঘটনার সাক্ষী তিনি। কিন্তু এমন ঘটনার মুখোমুখি তিনি আগে কখনো হন নি!

ওদিকে কালুডাকাত দূর থেকে শুনতে পেয়েছে রামের কণ্ঠস্বর। চেঁচিয়ে বলল, ওরে বিশ্বাসঘাতক, ছেলে হয়ে তুই বাবাকে ধরিয়ে দিলি। এই ছিল তোর মনে?

দারোগাবাবু কালুডাকাতকে নিয়ে তুলল জিপ গাড়িতে। পাশে বসিয়ে নিল রামকে।

রাম নিজেকে সামলাতে পারে না। প্রচণ্ড অভিমানে ভেঙে মুচড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে গড়িয়ে পড়ল বাবার পায়ের কাছে।

যে কান্না গিয়ে স্পর্শ করে পিতৃস্নেহকে।

দারোগাবাবু রামের পিঠ চাপড়ে বললেন, ভেঙে পড়বেন না। আমি তো আছি। এমন সৎ ও সাহসী যুবক সত্যি ইতিপূর্বে আমি আর দেখিনি। আপনাদের মতো সৎ ও নির্ভীক যুবক আজ বড় প্রয়োজন।

ওদিকে কালুডাকাতও মনে মনে বেশ অনুতপ্ত। যেন বলতে চাইল, মন খারাপ করো না রাম। আমাকে আজ ধরিয়ে দিয়ে পুলিশের হাতে বরং নতুন করে জীবন শুরু করার একটা মুহূর্ত এনে দিলে। বাকি জীবন আমিও সৎভাবেই বেঁচে থাকতে চাই।

রাতের অন্ধকারে পুলিশের জিঁপ-গাড়িটা ছুটতে থাকে থানার দিকে।

বিহারী দারোগার ডাকাত ধরা

সোকেন্দার আলি সেখ

বিহারী দারোগা ঠুঁটো জগন্নাথ নয়। তল্লাটের দশ-বারো জন ছিঁচকে চোরকে লকআপে পুরে অ্যায়সা টাইট দিয়েছেন বলেই সব চোরের এখন 'পালাই-পালাই' অবস্থা। শোনা গেছে দাগী চোর-বাটপাড় আর বদমাশরা চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই ছেড়ে দিয়ে, খুন-খারাপি-গুণ্ডামি ছেড়ে দিয়ে ট্রেনে বাদাম লজেন্স হকারি করছে। ফলে, মগরা-হাট থানায় এখন কোনও ঝক্কি নেই। ঝক্কি নেই বলেই নাদুস-নুদুস ভুড়িঅলা বিহারী দারোগা থানার সেই গদিঅলা চেয়ারে বসে, টেবিলে জুতো-সমেত পা তুলে দিয়ে ফো-র-র ফোৎ—ফো-র-র ফোৎ-ৎ করে দিনেরাতে নাক ডাকিয়ে ঘুমোন। সেই ঘুম হালদার পুকুরের পশ্চিম পাড় থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। পাড়ার ছোকরা ছেলেরা সেই ডাক শুনে হাসে। প্রাইমারী স্কুলের ছেলেরা বলে, বিহারী দারোগার নাকের ভিতর দিয়ে ডায়মণ্ডহারবার লোকাল যাচ্ছে।

সেই ঘুমের মাঝে হন্তদন্ত হয়ে থানায় ছুটে আসেন হরিপদ। তখন দারোগার মতো খৈনি জল মুখে দিয়ে কাঠের টুলে বলে ঝিমোচ্ছিল জোকার মার্কা কনস্টেবলটিও। সব মিলিয়ে শান্তির পরিবেশে, থানায় বড়বাবু থেকে মেজবাবু, মেজবাবু থেকে সেজবাবু, সেজবাবু থেকে কনস্টেবল-হোমগার্ড সবারই ক্লান্তিহীন অবিরাম ঘুমের কমপিটিশন্ চলছিল। নিদ্রাভঙ্গের কোন কারণই ছিল না।

সেই শান্তি ভঙ্গে বাদ সাধল সোনার কারবারি হরিপদ বেনে। হরিপদ সেলিম-ডাকাতের ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বড়বাবুর মানে বিহারী দারোগার ঘরে ঢুকে বলে—'বাঁচান বড়বাবু! বাঁচান! বাঁচান!'

কে কাকে বাঁচাবে! থানার সব জীবিত প্রাণীগুলো বুদ্ধদেবের নীতি-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গিয়ে যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। হরিপদ প্রাণের ভয়ে যতই চেঁচাক না কেন, কে শুনবে সেই হৃদয়বিদারক কাতর আবেদন!

হরিপদ বেনে জুতো সমেত বিহারী দারোগার দু'টো পা জড়িয়ে ধরে বলে—'দারোগাবাবু আপনার পদ ধরে ডাকছে হরিপদ, আমাকে বাঁচান। আমি ডাকাতের ভয়ে জর্জরিত!'

বিহারী দারোগার তবুও সেই ফোর-র-র ফোৎ—ফোর-র-র ফোৎ থামছে না। মনে হচ্ছে, ক্রেন দিয়ে চেয়ার সমেত দারোগাবাবুকে পুলিশ মন্ত্রীর সামনে কিংবা পুলিশের হেড কোয়ার্টার লালবাজারে নিয়ে গেলেও, শান্তিপ্রিয় মানুষটির ঘুম ভাঙবে না।

হরিপদ হাত কচলাতে-কচলাতে বলে—'ইস্ যদি ব্যবসা না করে, সরকারি চাকরি করতুম তাহলে ভালো হত। সরকারি চাকরিতে এমন ঘুমোন যায়, তা জানা ছিল না।'

ভাবতে-ভাবতে হরিপদর মনে পড়ে যায় ডায়মন্ডহারবারের সেলিম ডাকাতের কথা। সন্ধে হলেই সেলিম আসবে দলবল নিয়ে। সেলিম-সেলিম ভাবতে-ভাবতে ডুকরে কেঁদে ফেলে হরিপদ। থাকতে না পেরে কুম্ভকর্ণ দারোগার ঘুম ভাঙানোর জন্য জুতো সমেত পা ধরে হেঁচকা টান মারে হরিপদ।

সেই টানে বিহারী দারোগা চমকে উঠেন। কাঁচা অমন ঘুমের ব্যাঘাত কেন হল, তা ঠাওর করতে পারলেন না। ধড়মড়িয়ে চেয়ার থেকে কাৎ হয়ে পড়ে গিয়ে পকেট থেকে হুইসেলটা বাজিয়ে দিলেন।

হুইসেলের আওয়াজে মগরাহাট থানার সব ক'টা 'ফোর-র ফোৎ— ফোর-র ফোৎ লোকাল ট্রেনের যাত্রার বিঘ্ন ঘটল। রে-রে-রে করে ছুটে এলো সেজ-মেজ-ন' সেজ সবাই।

হরিপদ কানে হাত দিয়ে মাফ চাইবার ভঙ্গিতে বলে, 'মাফ করবেন হরিপদকে। অধম আপনার ঘুমের বিঘ্ন ঘটিয়ে ফেলল।'

বিহারী দারোগা আড়মোড়া ভেঙে হাঁসের ডিমের মতো বড় বড় চোখ বার

করে গর্জে ওঠেন—'বটে! কাঁচা ঘুম পাকা ঘুম কাকে বলে জানো না? পুলিশের লোকের গায়ে হাত দেওয়া মোটেই শোভন কাজ করনি। শান্তিভঙ্গের অপরাধে—'

—'শান্তিভঙ্গ নয়—শান্তিভঙ্গ করিনি। আপনার পদযুগল ধরে ঘুম ভাঙাতেই—।'

—'নো-নো-নো ঘুম! আমি ঘুমু-ই নি। অন্ ডিউটিতে চোখ বুঁজে থাকার ভান করেছিলুম। তাই শান্তিভঙ্গের অপরাধে তোমাকে আমি লকআপে পুরে দিতে পারি।'

—'মাফ করে দিন হুজুর। আপনি আমাদের বড়বাবু, দুঁদে অফিসার। আপনি আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের বাপের মতো।'

বিহারী দারোগা হঠাৎ ফিক্ করে হেসে বলে—'আমাদের সম্পর্কে তোমার একটা ধারণাবোধ রয়েছে জেনে তোমাকে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর থেকে শর্তহীন জামিন দিলাম। তবে আমাকে 'বাপ' বলবে না।' বিহারী দারোগা হঠাৎ মুচকি হাসি হেসে বলে—'মানে কী জানো, আমি তো বিয়ে করিনি—চিরকুমার।'

হরিপদ কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বলে—'চিরকুমার কেন স্যার? তাহলে তো জেনারেশন অফ হয়ে যাবে!'

—'তা হোক ক্ষতি নেই। আমি জেনারেশনের চিন্তা করি না, আমি আমার এরিয়া থেকে ডাকাতি অফ্ করতে চাই। ডাকাত নিধনই আমার ব্রত।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিহারী দারোগা আবার বলেন—'চোর-ডাকাত ধরতে ধরতে বিয়ে করার সময় পাচ্ছি না। আমি চোর-ডাকাতকে দেশ ছাড়া করতে চাই।'

—'আপনার হাতে তাড়া খেয়ে সব ডাকাত এখন আমার বাড়িতেই ধাওয়া করছে!'

—'দ্যাটস্ ক্রিমিন্যাল অফেন্স। তুমি জানোনা? চোর-ডাকাতদের শেল্টার দেওয়াও অপরাধ!'

হরিপদ কাঁপতে-কাঁপতে বলে—'আমি ওদের শেল্টার দিতে চাইনি, ডাকাতরা শেল্টার নিতেই আজ আসবে।'

—'কোন ডাকাত স্যার?'

—'সেলিম ডাকাত স্যার। টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে, রাত্রি আটটার সময় সেলিম ডাকাত সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আসবে, ওদের পাঁচ ভরি সোনা দিতে হবে নইলে আমাকে সহ আমার পুরো ফ্যামিলি মেম্বারদের খতম করে' দেবে।'

হরিপদর কথা শুনে বিহারী দারোগা গর্জে ওঠেন। অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে বোর্ড বসিয়ে দেন। তারপর হাতের রুলবাড়িটা বন্‌বন্ করে ঘুরিয়ে বলেন—'দেখাচ্ছি মজা! সেলিম ডাকাত তোর একদিন কী আমার একদিন! লকআপে এনে অ্যায়সা টাইট দেব, তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো।'

—'কি হবে স্যার আমার? আমি যে ভয় রাখতে পারছি না। আপনি আমার

ফ্যামিলিকে বাঁচান।'

—'কোনও ভয় নেই! সেলিম ডাকাত কী ভুলে গেছে পুলিশ প্রশাসনের কথা? তুমি বাড়িতে ফিরে যাও। বিকেল থেকেই তোমার বাড়ির চারধারে পুলিশ পোস্টিং করে দিচ্ছি।'

—'দেখবেন স্যার।' হরিপদ গুড়ি-সুড়ি মেরে থানা থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

বিকেল থেকেই জনাদশেক বন্দুকধারী পুলিশ সেলিম ডাকাতের অপারেশনে রুখতে ঘিরে ফেলে হরিপদর বাড়ি। হরিপদকে বলে দেওয়া হয়েছে, বাড়ির ভিতরে নির্ভয়ে থাকতে।

পাঁচজন বন্দুকধারী রাইফেলের ট্রিগারে হাত রেখে অতি সাবধানে পায়চারি করতে থাকে। আর মাঝে মধ্যে বিহারী দারোগা জিপ হাঁকিয়ে এসে টহল দিয়ে যান। সব মিলিয়ে পুরো বাড়িটাই বিকেল থেকে পুলিশের দখলে। পুলিশের অনুমতি ছাড়া কুকুর-বেড়াল দূরে থাক্, একটা মশা-মাছিরও হরিপদ বেনের বাড়িতে ঢোকার জো নেই।

এমনি কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সারারাত কেটে যায়। পুলিশের শক্ত বুটের ভয়ে সেলিম ডাকাত ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা হানা দিতে ভয় পায়। ভোরের দিকে হরিপদ'র বউ ঘটি বোঝাই চা করে দেয় পুলিশদের। পুলিশের লোকজন চা খেয়ে, কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে খৈনি ডলতে-ডলতে বলে—'এবার আমাদের ডিউটি অফ্। সকাল হয়ে গেল তো, তাই থানায় গিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে।'

পুলিশের লোকজন বিদায় নেয়। হরিপদ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে—'ঠাকুর, সোনা রাখার জায়গা পাই, কিন্তু ভয় রাখার জায়গা পাই নে!'

পুলিশের লোকজন থানায় ফিরতেই বিহারী দারোগ তুড়ি দিয়ে বলে—'দেখলে তো, আমার নাম শুনেই সেলিম ডাকাত কুঁচকে গেছে, গর্তে ঢুকে গেছে। তোমরা জানবে এই বিহারী দারোগা ডাকাত দমন করেই লালবাজারের পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত প্রমোশন নেবেই।'

একজন কনস্টেবল বলে—'পুলিশ কমিশনার হয়ে আমাদের কথা ভুলে যাবেন না স্যার! দেখবেন তো?'

—'তোমাদের তখন দেখবো কী করে? পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত উঠতে পারলে তবেই বিয়ে করবো। আমি তখন আর চিরকুমার থাকবো না।'

—'আপনার বিয়েতে বলবেন তো স্যার?'

—'অবশ্যই-অবশ্যই' বিহারী দারোগা খাড়া-খাড়া গোঁফজোড়া নাচাতে থাকে।

ঠিক তখনই একটা বেঁটে সাইজের লোক হাতে বিরাট সাইজের কাতলা মাছ নিয়ে একমুখ হাসি ছড়িয়ে থানায় ঢোকে। লোকটিকে দেখতে পেয়ে বিহারী

দারোগা মনে-মনে বলে—'সাত সকালে ঘুমোবার সময় আবার কী নতুন ঝামেলা?'

লোকটি হাসতে হাসতে বলে—'ঝামেলা নয় স্যার, ঝামেলা নয়। আপনাকে একটা পুরস্কার দিতে এলাম।'

—'পুরস্কার কেন?'

—'আপনি যেভাবে ডাকাত দমন করেছেন, মানে হরিপদ বেনের বাড়ি পাহারা দিলেন তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে মগড়াহাটের নাগরিকবৃন্দের তরফ থেকে এই মাছটা দিয়ে গেলাম।'

বড় মাছটা মেঝেতে রেখে লোকটা নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয়।

ঠিক তারপরই হরিপদ কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে আসে থানায়—'আমার সর্বনাশ হয়ে গেল বড়বাবু, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! সেলিম ডাকাত সব লুটেপুটে নিয়ে গেল!'

—'সেলিম ডাকাত! সেলিম ডাকাত! কেন? আমাদের ফোর্স তো সারারাতই ছিল, এই তো মাত্র ফিরল।'

হরিপদ কাঁদতে-কাঁদতে বলে—'পুলিশের লোকজন ফিরতেই সেলিমের

লোকজন বোমা ফাটিয়ে আমার বাড়ি দখল নিল। তারপর ভোজালি-ছুরি দেখিয়ে সর্বস্ব লুঠ করে নিল।'

বিহারী দারোগা হুকুম দেয়—'রতন চাঁদ, এক্ষুনিই ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে যাও, তদন্ত করে এসো।'

হরিপদকে জিপে তুলে সেকেন্ডে অফিসার রতন চাঁদ বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে তদন্তে রওনা দিলেন।

তখনও ইয়া সাইজের কাতলা মাছটা মেঝেতে পড়ে আছে। মাছ দেখে বিহারী দারোগা হাঁফ ছাড়ে—'আন্নামাসি—আন্নামাসি, মাছটা নিয়ে যাও।'

আন্নামাসি হন্তদন্ত হয়ে বলে—'কি মাছ বড়বাবু?'

—'আমার পুরস্কার, ভালো কাজের পুরস্কার। ভালো করে রান্না করো দিকি। মাছটা খেয়ে ঘুমোব একটু।'

আন্নামাসি চলে যাবার পর বিহারী দারোগা মনে-মনে বলে—'সেলিমের কথার দাম নেই! রাত্রে আসবে বলে সকাল-সকাল হানা দিল। পুলিশ কি দিনরাত সব আগলে রাখবে নাকি!'

রান্নাঘর থেকে আন্নামাসি ছুটতে-ছুটতে এসে বলে—'চিঠি! চিঠি মাছের পেটে। আর সোনার হার।'

—'দেখি-দেখি।'

সোনার হারটা দেখে বিহারী দারোগা বলে—'স্টেঞ্জ! মাছটাও ডাকাত নাকি! মাছের পেটে এত বড় সোনার হার?'

তারপর ছোট্ট চিরকুটটা পড়তে থাকে—

শ্রদ্ধেয় দারোগাবাবু,

হরিপদ বেনের বাড়ি ডাকাতি করে, আপনার হিস্যা স্বরূপ ৫ ভরি ওজনের হারটা পাঠিয়ে দিলুম।

শ্রদ্ধাসহ
সেলিম ডাকাত

চিঠিটা পড়ে বিহারী দারোগা হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারেন না। একবার ভাবেন রেগে যাবে, একবার ভাবেন ভয় পাবেন..........।

এ রকম অনেক কিছু ভাবতে-ভাবতে বিহারী দারোগা বলেন—'সেলিম ডাকাতের ইনসাফ আছে বলতে হয়, শুধু নিজে না খেয়ে আমাদের কথাও চিন্তা করে।'

আন্নামাসি হাসতে-হাসতে বলে—'বড়বাবু, তোমাকে এবার বিয়ে করতে হবে। নতুন বউয়ের গলায় হারগাছটা মানাবে ভালো।'

বিহারী দারোগা ফিক্ করে হেসে বলে—'এসব কাউকে বলবে না, তোমাকে একজোড়া সোনার নূপুর করে দেব।'

আজ সন্ধ্যে সাতটায়

সনৎকুমার মিত্র

গজপতি চক্রবর্তী আর তাঁর স্ত্রী ব্যাঙ্কের লকার থেকে গহনা নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে দরজার তালা খুলে বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। গজপতিবাবুর এক হাতে তালা অন্য হাতে চাবি। তাঁর পিছনে তাঁর স্ত্রী হাসিরাশি দেবী। তাঁর হাতে ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতরে গহনাগুলো রাখা আছে। গজপতিবাবু তালা খুলে একটা পা ঘরের মধ্যে দিতেই তাঁর নজরে পড়ল একটুকরো ছোট সাদা কাগজ। কাগজটি তুলে নিলেন তিনি। কাগজটিতে লাল কালি দিয়ে লেখা, 'আজ সন্ধে সাতটায় আসব'। শেষ শব্দটি দু তিনবার বোলানো হয়েছে তবু অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। আর কিছু লেখা নেই। কোনও সই নেই। কারোর নাম নেই। লেখার শেষে দু-তিনবার ঘষে কী একটা আঁকার চেষ্টা করেছে অথবা লেখার চেষ্টা করেছে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গজপতিবাবুর মনে হল একটা ছোরা আঁকা আছে আর দু-তিন ফোঁটা রক্ত।

কাগজটা কে দিয়েছে? কেন দিয়েছে? কখন দিয়েছে?

কে আসবে? কেন আসবে? এই সব হাজার প্রশ্ন গজপতিবাবুর মাথায়

কিলবিল করতে লাগল।

গজপতিবাবু কাগজটি আবার পড়লেন। লাল কালিতে বেশ পরিষ্কার মুক্তাক্ষরে অথবা রক্তাক্ষরে লেখা রয়েছে 'আজ সন্ধে সাতটায় আসব।'

গজপতিবাবু ভাল করে বোঝার চেষ্টা করলেন এ কথার অন্তর্নিহিত অর্থ কী হতে পারে? আর তখনই তাঁর মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মত একটা আশঙ্কা ঝলসে উঠল। কোনও সমাজবিরোধী নাকি কোন ডাকাত?

তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যে আজ ব্যাঙ্কের লকার থেকে গহনা তুলে এনেছেন কেউ কি তা জেনেছে বা লক্ষ করেছে? তার ফলেই কি এই লাল চিঠি?

তিনি ঠিক করলেন স্থানীয় থানায় গিয়ে সমস্ত জানাবেন। সাবধানের মার নেই। তাঁর স্ত্রীকে বললেন—'আমি একটু থানা থেকে ঘুরে আসছি।'

তাঁর স্ত্রী হাসিরাশি দেবীর বুদ্ধি আরও প্রখর। তিনি বললেন,—'না, থানায় যেতে হবে না। তুমি বরং ফোন করে সমস্ত জানাও।'

গজপতিবাবু স্ত্রীর বুদ্ধির তারিখ করে থানায় ফোন করে সব কিছু বললেন।

থানার বড়বাবু গজপতিবাবুকে আশ্বাস দিলেন,—কোনও ভয় নেই। বিকেল পাঁচটা থেকে চারজন সাদা পোশাকের পুলিশ তাঁর বাড়ির চারিদিকে পাহারা দেবে।

থানার বড়বাবু গজপতিবাবুকে এই টিপস্ জানানোর জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন,—'একটা ডাকাতের দল গত একমাসের মধ্যে এরকম ডাকাতি তিনটে বাড়িতে করেছে। একটা বাড়িতে বাড়ির মালিককে ভোজালি দিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করেছে। এদের কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। এদের সাহস খুব

বেড়ে গেছে। আপনাকে এই সংবাদ জানানোর জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ এদের ধরবই।'

ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে থানার বড়বাবু গজপতিবাবুকে যা বললেন, তাতে গজপতিবাবুর বুকের মধ্যে কী রকম একটা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। ঠোঁট শুকিয়ে গেল। তিনি এক গ্লাস জল খেলেন। তাঁর কানের কাছে একটা ফাটা রেকর্ড অনবরত বাজতে লাগল,—'ডাকাত দল একটা বাড়িতে বাড়ির মালিককে ভোজালি দিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করেছে। জখম করেছে। জখম করেছে।'

তাঁর আশঙ্কা হল তাঁকেও আজ সন্ধে সাতটায় সেই ডাকাতদল ভোজালি দিয়ে খুন করে গয়নাগুলো নিয়ে পালাবে।

নাঃ! আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এই চিন্তাটা যেই মাথায় এল, গজপতিবাবু আর দেরি না করে পাড়ার রাজু মস্তানের কাছে ছুটলেন। অথচ রাজু মস্তান জিজ্ঞাসা করল,—'মেসোমশায় বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা আমাকে কী করতে হবে?' তখন গজপতিবাবু আমতা আমতা করে বললেন,—'না, মানে, ইয়ে—ঐ সময় একটা পাওনাদার আসবে আমার কাছে। কিন্তু যদি সে আমার গায়ে হাত তোলে তখন তুমি তাকে বাড়ির বাইরে বার করে দেবে।'

রাজু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলল,—'কিন্তু, মেসোমশায় 'আমার রেট পাঁচশ টাকা। আর সেটা আগাম দিতে হবে।'

গজপতিবাবু তাতেই রাজি হলেন। টাকা আগাম দিয়ে রাজুকে ঠিক করে বাড়িতে এসে ভাবতে লাগলেন আর কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে লাফিয়ে উঠলেন, 'ইউরেকা, ইউরেকা।' তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন,—'শিগগির গয়নাগুলো দাও।'

—'গয়নাগুলো নিয়ে কী করবে?'

—'জীবনের নিরাপত্তা আগে না গয়না আগে? তুমি শিগগির গয়নাগুলো দাও। ওগুলো ব্যাঙ্কে রেখে আসি।'

গজপতিবাবুর স্ত্রী অনিচ্ছা সত্ত্বেও গয়নাগুলো এনে দিলেন। গজপতিবাবু দুটো বাজার আগেই ব্যাঙ্কে পৌছে গয়নাগুলো আবার লকারে রেখে বাড়িতে ফিরে এলেন। এবার মনে বেশ একটা শান্তি পেলেন। যাক, অন্তত মূল্যবান গহনাগুলো তো আর ডাকাতদল আজ সন্ধে সাতটায় নিতে পারবে না।

গজপতিবাবু ঠিক করলেন, এবার নাওয়া খাওয়া-দাওয়া করে একটু ঘুমিয়ে নেবেন। সকাল এগারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত খুব টেনশানে গেছে।

বিকেল পাঁচটা বাজতেই রাজু এসে পিস্তল নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'মেসোমশায়, কোথায় পজিশন নেব?'

পিস্তল দেখে গজপতিবাবু বললেন,—'না,—না বাবা গুলিটুলি ছুঁড়তে হবে না। তুমি এখানেই বসে থাক, মানে আমার কাছে কাছে থাক। বিপদ বুঝলে আমি তোমাকে বলব।

সময় কাটছে। ছটা বাজল। সাড়ে ছটা বাজল। পৌনে সাতটা বাজল। গজপতিবাবু একবার চারিদিকে দেখে এলেন। হ্যাঁ, পুলিশের লোক এসে গেছে। তবু তাঁর বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করছে।

সাতটা বাজতে তিন মিনিট বাকি আছে। গজপতিবাবু আর ঘড়ির দিকে তাকাতে পারছেন না। শত্রু যেন ঘড়ির কাঁটার পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে আসছে। রাজু তাঁর কাছে বসে আছে। বাইরে পুলিশের লোক রয়েছে। তবু গজপতিবাবু চোখ বুজে দুর্গানাম জপতে শুরু করলেন।

হঠাৎ একটা গাড়ি এসে গজপতিবাবুর বাড়ির সামনে থামল। গাড়ি থামার শব্দ শুনেই গজপতিবাবু চোখ বন্ধ রেখেই রাজুর হাত চেপে ধরলেন, 'রাজু, কটা গাড়ি এসেছে?'

—'মেসোমশায় একটা অ্যামবাসাডর গাড়ি এসেছে। ও রাজু একাই উড়িয়ে দেবে। আঃ! হাতটা ছাড়ুন তো। পিস্তলটা বের করতে দিন।'

—'বাবা রাজু, দুম করে গুলি ছুঁড়বে না। আগে দেখে নাও ক'জন এসেছে।'

—'মেসোমশায়, মাত্র দু'জন। একজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা।'

রাজুর শেষ কথাটা শুনে গজপতিবাবুর বুকের ব্যথাটা কমে গেল। নিঃশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হল। তিনি চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করলেন এবং দেখেই লাফিয়ে উঠলেন—'আরে! বিশ্বনাথ,—তুমি!'

বিশ্বনাথ ওরফে বিশু অর্থাৎ গজপতিবাবুর একমাত্র শ্যালককে দেখে গজপতিবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'হ্যাগো, দ্যাখো কে এসেছে?'

গজপতিবাবুর স্ত্রী ছুটে এসে ভাইকে দেখে একগাল হেসে বললেন,—'তুই হঠাৎ?'

—'কেন? আমার চিঠি পাসনি?

—'চিঠি?'

—'আজ সকালে এসেছিলাম। তোদের কাউকে বাড়িতে পেলাম না। দরজায় তালা ঝুলছে দেখে পাশের বাড়িতে জিগ্যেস করলাম। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বললেন তিনি তোদের আধঘণ্টা আগে বাড়িতেই দেখেছিলেন। কিন্তু তোরা কোথায় গেছিস বলতে পারলাম না। তখন একটা কাগজে গিন্নির লাল লিপস্টিক দিয়ে কোনও রকমে লিখলাম 'আজ সন্ধে সাতটায় আসব, এইটুকু লেখার পরে দেখলাম আর লেখা যাচ্ছে না। অনেক ঘষে নামটা লেখার চেষ্টা করলাম। তাও লেখা গেল না। শেষে রাগ করে কাগজটা তোদের দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে আমি ফিরে গেলাম।'

গজপতিবাবুর গলায় কথাগুলো আটকে গেল, 'তুমি লিখেছিলে ঐ লাল কালির চিঠি? এ কথা আগে জানলে.....'

গজপতিবাবু খুশিতে নাচতে লাগলেন।

'বাবা রাজু, তুমি এসো বাবা। তোমাকে আর আটটা পর্যন্ত থাকতে হবে না।'

......'হ্যাঁগো চা কর। গলা শুকিয়ে গেছে। এবার একটু আরাম করে চা খাই।'

ডাকাতের চিঠি
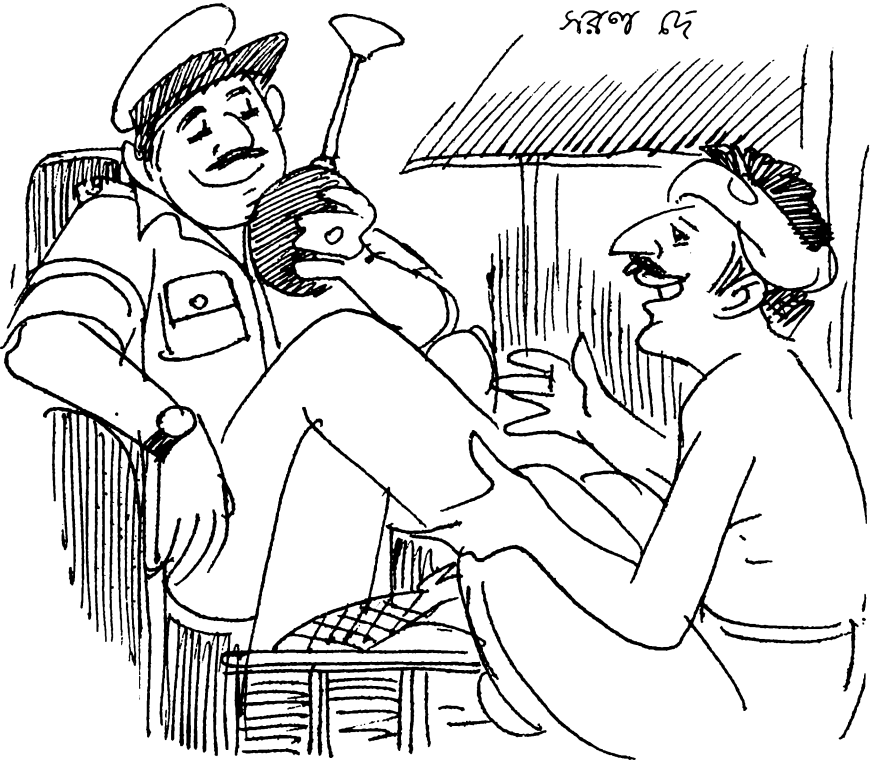
দারোগা বটে দুর্গাচরণ চক্রবর্তী। কী দাপট ছিল তাঁর। বাঘে-গরুতে নাকি জল খেত সেই দুগ্গা দারোগার এক হুমকিতে।

তা এমন যে ডাকসাইটে জবরদস্ত দারোগা, রঘু ডাকাত কিনা তাঁর চোখেই বারবার ধুলো দিয়ে সটকে পড়ছে। কী যে ধড়িবাজ ওই রঘুটা। আজ এখানে হা-রে-রে-রে তো কাল ওখানে হা-রে-রে-রে। দুর্গাচরণকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে শয়তানটা।

তবে রঘু কি যে সে ডাকাত?

সেকালে রঘুডাকাতের নামেই পিলে চমকে উঠত সকলের। অমুক বাড়িতে ডাকাতি করব বললে আর রক্ষে নেই। যতই আটঘাট বাঁধ, হবেই ডাকাতি।

মস্ত লাঠিয়াল রঘু। দশাসই চেহারা। ইয়া চওড়া বুকের পাটা। কালো কুচকুচে গা। মাথায় বাবরি। চোখ দুটো জবাফুল। বনবন করে লাঠি ঘুরিয়ে, সেপাই-পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে সে পালাত। ধন্যি তার সাহস। আগেভাগে চিঠি দিয়ে সে ডাকাতি করত। দিনক্ষণ জানিয়ে। রণপায়ে চেপে হনহনিয়ে ছুটত ডাকাতি করতে—এক এক রাতে পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূরে।

দুর্গাচরণ এখন নৈহাটি থানার দারোগা।

সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে—রঘুকে জ্যান্ত বা মরা ধরতে পারলে অনেক টাকার পুরস্কার। আর থানায় থানায় হুকুম এসেছে—যেভাবেই হোক রঘু ডাকাতকে ধরতে হবে। এই নিয়ে তো অষ্টপ্রহর দুশ্চিন্তা দুর্গাচরণের। কী যে করবেন তিনি!

হঠাৎ একটা চিঠি পেলেন দুর্গাচরণ।

কার চিঠি?

রঘু ডাকাতের। লিখেছে—

দারোগাবাবু, আপনার সহিত আমার শীঘ্রই দেখা হইবেক। প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ হয়।

ইতি—
দীন সেবক
রঘু

চিঠি পড়ে তো দুগ্গা দারোগা রেগে আগুন তেলে বেগুন। কী এতবড় স্পর্ধা রোঘোটার? দারোগার সঙ্গে মস্করা। আচ্ছা, আসুক না একবার ধারে-কাছে, দেখাচ্ছি মজা।

কিন্তু মজা দেখাল রঘুই।

দুর্গাচরণ একদিন থানার বারান্দায় গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক খাচ্ছেন। আর ভাবছেন, কী করে ধরা যায় রঘু ডাকাতকে। নিজেই সে আসবে? আসুক না। সেপাই-সান্ত্রি সব হুঁশিয়ার। চারদিকে কড়া পাহারা। এলেই—

কে যেন থানার দিকেই আসছে না?

ওঃ, ও তো একটা জেলে। বিরাট সাইজের দু-দুটো পাকা রুই তার মাথায়। লোকটার মাছের দিকেই নজর দিলেন দারোগাবাবু।

বাঃ, খাসা মাছ তো?

লোকটা গুটি গুটি বারান্দায় উঠে এল। মাছ দুটোকে ধপাস করে ফেলল দারোগাবাবুর পায়ের কাছে। তারপর হেঁটমুণ্ডু হয়ে প্রণাম করে ট্যাক থেকে একটা চিরকুট বের করল।

একটা চিঠি। সুখচরের জমিদার চিঠিটা লিখেছেন দুর্গাচরণবাবুকে।

মান্যবরেষু,

আমার নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বড় দীঘিতে জাল ফেলা হইয়াছিল। শুনিলাম ব্যস্ততা হেতু আপনি আসিতে অপারগ। যাই হইক, সামান্য দুইটি মাছ পাঠাইলাম। গ্রহণ করিলে আমার নাতির মঙ্গল হইবেক। বাহক আমার বিশ্বাসী প্রজা।

দুর্গাচরণ তো খুব খুশি। জমিদারের লোকটিকে উপযুক্ত বখশিস দিয়ে বিদেয় করলেন। সে নমস্কার করে হাসিমুখে চলে গেল।

রঘু ডাকাতকে ধরার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেন দুর্গাচরণ। তক্কে-তক্কে

থাকেন। খবর পেলেই দলবল নিয়ে ছোটেন। ওঁৎ পেতে ফাঁদ পেতে বনে-জঙ্গলে মশার কামড় খান।

কিন্তু সবই বৃথা। রঘু ডাকাত ধরা পড়ে না।

এমন সময় আর একটা চিঠি পেলেন দুর্গাচরণ।

দারোগাবাবু,

কথা রাখিয়াছি। আপনার সহিত দেখা করিবার কথা ছিল, সেদিন দেখা করিয়াছি। মাছ কেমন খাইলেন?

ইতি—

আপনার দাসানুদাস

রঘু

চিঠিটা পড়ে দুগ্গা দারোগ তো হায় হায় করে উঠলেন। এমন নাগালে এসেও ফসকে গেল রঘুটা?

ওঃ কী শয়তান! কী ধূর্ত!

দুর্গাচরণ আঙুল কামড়াতে লাগলেন।

রঘু কিন্তু গরিব মানুষের বন্ধু ছিল। ভুলেও সে গরিবের গায়ে হাত দিত না। ডাকাতির টাকাপয়সা এককথায় বিলিয়ে দিত তাদের মধ্যে। কত যে উপকার করত। গরিবের ওপর বড়লোকদের অন্যায় জোর-জুলুম দেখলে রুখে দাঁড়াত। অত্যাচারীকে শাস্তি পেতে হত।

রঘু ডাকাতকে নিয়ে কত যে গল্প লোকের মুখে ছড়িয়ে আছে।

একবার এক বামুনের মেয়ের বিয়ে।

মেয়ের বাবা বড় গরিব। বিয়ে যদি বা ব্যবস্থা হল, শেষপর্যন্ত পণের টাকা যোগাড় হল না।

বামুনের মাথায় হাত!

বিয়ের দিন নৌকো এসে ভিড়ল নদীর ঘাটে। নৌকোয় বর ও বরযাত্রীর দল।

বরের বাবা নৌকো থেকে খবর পাঠাল—বেয়াই-মশাই, পণের টাকা আগে পাঠান, না হলে এই ঘাট থেকেই বিয়ে ভেঙে দিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হব।

কিন্তু কনের বাবা কোথায় পাবেন অত পণের টাকা?

এদিকে লগ্ন যে বয়ে যায়।

হায়, হায় কী হবে উপায়?

বিয়েবাড়ির সব আলো যেন কেউ একফুঁয়ে নিভিয়ে দিল। কান্নার রোল উঠল। কনে কাঁদে। কনের মা-মাসি কাঁদে। পাড়াপড়শীও কাঁদে। আর কনের বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন ঘরের বাইরে, চণ্ডীমণ্ডপের ধারে পথের ওপর।

সন্ধে পেরিয়ে গেছে। আঁধার ঘন হয়েছে।

শুকনো পাতায় খড়মড় শব্দ।

কে যেন আসছে।

লম্বাচওড়া ষণ্ডামার্কা একটা লোক।

'পেন্নাম হই ঠাকুর। এমন ভরসন্ধ্যেবেলায় মাথায় হাত কেন? কী হয়েছে তোমার?

বাজখাঁই গলার আওয়াজে চমকে উঠলেন বেচারা বামুন।

'কে তুমি?'

'আমি যেই হই। তোমার কী হয়েছে খুলে বল, নইলে আমি নড়ছিনে এখান থেকে।'

বামুনকে বলতেই হল তাঁর দুঃখের কথা।

সব শুনে সেই অচেনা লোকটি বলল, 'এই ব্যাপার? আচ্ছা, তবে তুমি বিয়ের আয়োজন কর, ঠাকুর। আমি এখুনি বর নিয়ে আসছি। কিছু ভেবো না, তোমার মেয়ে বিয়ে হবেই।'

বলেই লোকটি উধাও হয়ে গেল।

খানিক বাদে ওদিকে এক কাণ্ড। নদীর ঘাটের কাছে ঝোপ-ঝাড়ে হঠাৎ মশাল জ্বলে উঠল। সেই আলোয় ফুটে উঠল কয়েকটা মুখ।

নৌকোর কাছে এগিয়ে এল তাগড়াই চেহারার একদল মানুষ। একজন আবার যেমন লম্বা তেমন চওড়া। সেই বোধহয় পালের গোদা।

লোকটি এসেই হুকুম করল, 'নৌকো থেকে নাম সব। বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে, বরকে এখুনি বিয়েবাড়িতে নিয়ে যাও।'

হঠাৎ এমন হুকুম শুনে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। একটু সামলে নিয়ে বরকর্তা গলা চড়িয়ে বলল, 'ইস, বললেই অমনি নেমে যেতে হবে? যতক্ষণ না পণের টাকা আসছে আমরা নামবই না নৌকো থেকে।'

'তোমাদের নামতেই হবে।'

'তোমার হুকুমে নাকি?'

'হ্যাঁ, আমার হুকুমে।'

'উরি বাস রে! বিষ নেই কুলোপানা চক্কর! কে হে তুমি, যে এমন হুকুম করার সাহস পাও?'

লোকটি এবার তড়াক করে নৌকোয় লাফিয়ে উঠল। বুক চিতিয়ে বলল, 'আমি রঘু ডাকাত।'

রঘু ডাকাত!

বরের বাবার তো আক্কেল গুড়ুম! তার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। বর ও বরযাত্রীরা ভয়ে কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

রঘু ডাকাত গর্জে উঠল 'কি, যাবে এবার? না লাঠিপেটা করে নিয়ে যেতে হবে?'

ব্যস, অমনি সুড়সুড় করে সবাই নেমে এল নৌকো থেকে। বর, বরযাত্রী বরকর্তা—সবাই।

বিয়েবাড়িতে গিয়ে কনের বাবার হাতে পণের টাকাও গুঁজে দিল রঘু।

বামুনের মেয়ের বিয়ে হল।

শাঁখ বাজল। উলুধ্বনি হল।

মেয়ের মুখে হাসি ফুটল। সেই হাসি ছড়িয়ে গেল মেয়ের মা-বাবার মুখেও।

এই ছিল রঘু ডাকাত। বড়লোকের যম, গরিবের বন্ধু।

যতই যাই হোক, রঘু তো আসলে ডাকাত। তার একটা ডাকাতির গল্প শোন এবার।

এক ধনী জমিদার ছিলেন। তাঁর বিরাট জমিদারি, বিস্তর তালুক-মুলুক, প্রচুর সোনা-দানা টাকা-পয়সা।

সেই জমিদারের খুব গর্ব—রঘু ডাকাতের সাধ্যি নেই যে তাঁর বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢোকে। বাড়ির চারদিক ঘিরে বিরাট উঁচু পাঁচিল। অনেক পাইক-বরকন্দাজ, সেপাই-লেঠেল সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে। ছুঁচটিও সহজে গলবে না তাঁর বাড়িতে।

জমিদার বাবুটি প্রায়টি তাঁর ইয়ার-বন্ধুদের কাছে বলতেন, 'আমার বাড়িতে ডাকাতি করবে রঘু? আসুক না দেখি।'

কথাটা রঘুর কানে গেল।

জমিদারবাবু চিঠি পেলেন।

আপনার বাড়িতেই যথাশীঘ্র দেখা করিবঁ। প্রস্তুত থাকিবেন।

ইতি—

রঘু

তা প্রস্তুত হতেই হল জমিদারকে। রঘুর চিঠি। মুখে যতই বড়াই করুন, বেশ কিছুটা ভয় পেলেন মনে মনে।

পাহারা জোরদার হল। সারারাত লণ্ঠন জ্বেলে দারোয়ানরা খাড়া রইল। আরও লেঠেল এল।

তাতেও নিশ্চিত হতে পারলেন না জমিদার; থানার দারোগাকে অনুরোধ করলেন, পাহারা বসাবার জন্যে। দারোগাবাবু নিজে এসে প্রতি রাতে জমিদার বাড়িতে থাকতে লাগলেন। সঙ্গে অনেক পুলিশ-টুলিশ।

একদিন এক ভদ্রলোক এলেন ফিটনে চেপে। গায়ে ফিনফিনে মসলিনের জামা, পরনে শান্তিপুরী ধুতি, গলায় সোনার চেন, পায়ে নাগরা জুতো। সব মিলিয়ে বেশ বড়লোক বলেই মনে হয়।

ভদ্রলোক জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।

গেটের দারোয়ান সেলাম ঠুকে গেট খুলে দিল।

জমিদার তখন মোসাহেবদের নিয়ে খোশমেজাজেই ছিলেন। রঘুকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছিলেন। বলছিলেন, ওহে, তোমাদের রঘু ডাকাতের কী হল, গর্তে ঢুকে গেল নাকি? সেই কবে থেকে এই আসে এই আসে করে অপেক্ষা করছি, তা এল? তার জন্যেই এত আয়োজন সবই যে বৃথা হল দেখছি।'

মোসাহেবরা বলল, 'আপনার বাড়িতে রঘু ব্যাটা আসবে? সে মুরোদ কি আছে তার?'

কথাবার্তায় বাধা পড়ল সেই ভদ্রলোকটি ঘরে ঢুকতে।

জমিদারবাবুকে নমস্কার করলেন ভদ্রলোকটি। জমিদারবাবুও পাল্টা নমস্কার করে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন।

'মশায়ের নাম? নিবাস কোথায়?'

'আজ্ঞে আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস সুখচর।'

'তা কী প্রয়োজনে আসা বলুন।'

ভদ্রলোক তাঁর প্রয়োজনের কথা বললেন। সুখচরে জমিদারের যে তালুক আছে, সেটা তিনি কারুকে পত্তনি দিতে চান শুনেই ভদ্রলোক এসেছেন। বললেন, 'ওই পত্তনি যদি দয়া করে আমাকে দেন তো বড়ই উপকৃত হই।'

জমিদার রাজি হলেন। কথাবার্তা পাকা হল।

ভদ্রলোক নমস্কার করে, ফিটন হাঁকিয়ে অদৃশ্য হলেন।

তারপর দিন যায়।

রঘু ডাকাতের দেখা নেই। ভয় কমে। পাহারার কড়াকড়িও কমতে থাকে। থানার পুলিশ-চৌকি উঠে যায়। জমিদারের তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত-নিশ্চিন্ত ভাব।

না, রঘু ডাকাত আর আসবে না।

বেশ কিছুদিন পরের কথা।

অমাবস্যার ঘুরঘুট্টি রাত।

তীরবেগে একটা ছিপনৌকো এসে লাগল জমিদারবাড়ির ঘাটে। নৌকা থেকে কারা যেন নামল। ছায়ামূর্তির মতো। তাদের হাতে হাতে লাঠি-সড়কি বর্শা-বল্লম।

নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে তারা চলে এল পাঁচিলের গায়ে। এদিককার এক-একটা গাছের ডাল ধরে তারা টপাটপ লাফিয়ে পড়ল পাঁচিলের মাথায়, তারপর ওদিকে বাগানের বড় বড় গাছের ডাল ধরে ঝুপঝাপ নেমে পড়ল মাটিতে।

রাত তখন গভীর। জমিদারবাড়িটা যেন ঘুমপুরী। যে যেখানে সবাই ঘুমিয়ে।

ওরা ঢুকল খিড়কি দিয়ে। সোজা উঠে গেল বাড়ির বারান্দায়। সেখানে লণ্ঠন জ্বেলে দারোয়ানরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়রঘড়র করে নাক ডাকছে। তাদের তলোয়ারগুলো দেয়ালে ঝোলানো।

ওরা করল কি, লণ্ঠনগুলো আগে নিভিয়ে দিল। তারপর সবকটা তলোয়ার হাতিয়ে নিয়ে উঠে গেল উপরতলায়।

তখন আর তাদের পায় কে?

রাতের নিশুতি খানখান করে চিৎকার করে উঠল ডাকাতের দল—হা-রে-রে-রে।

তারপর দরজা ভাঙার শব্দ—দমাদ্দম দমাদ্দম।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল গোটা পাড়া।

ডাকাত পড়েছে জমিদারবাড়িতে!

সোনা-দানা টাকা-কড়ি যেখানে যা ছিল—সব লুঠ হয়ে গেল।

কে তাদের বাধা দেবে?

দারোয়ানরা হাত বাড়িয়ে দেখে—তাদের তরোয়ালগুলো সব বেহাত হয়ে

গেছে। খালি হাতে কে লড়বে?

লুঠপাট শেষ করে ডাকাত সর্দার ঢুকল জমিদারবাবুর ঘরে। ভয়ে গোঁ গোঁ করে তিনি বোধ হয় মূর্ছা গেলেন।

জমিদারবাবুর তখন কীসের ভয়? প্রাণের?

না, ডাকাতসর্দার তাঁকে প্রাণে মারল না, শুধু হাত-পা বেশ করে বেঁধে ফেলল। তারপর খাটের ওপর শুইয়ে রেখে চলে গেল।

কদিন পরেই একটা চিঠি পেলেন জমিদার।

রাজাবাবু,

আপনার বাড়িতে সেদিন দেখা করিয়া সুখচরের পত্তনি পাইয়াছি। পরে গত অমাবস্যার রাতে আপনার বহু মূল্যবান সম্পদ যাহা পাইয়াছি নির্বিঘ্নে লইয়া আসিয়াছি। আপনি ঘুমাইতেছিলেন, তাই দেখা হইল না। যাহা হইক আমি আপনার বা আপনার পরিবারের কাহারও গায়ে আঁচড় পর্যন্ত কাটি নাই। আপনার যাহা কিছু লইয়াছি, সবই গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিব। ক্ষমা করিবেন।

ইতি—

আপনার সেবক

রঘু

পড়লে তো সেকালের রঘুডাকাতের চিঠি?

আজ এসব গল্পকথা। কিন্তু প্রায় সবটাই সত্যি। তখনকার সরকারি দলিল-দস্তাবেজে, নথি-পত্রে আর পত্র-পত্রিকায় রঘু ডাকাতের নানা কীর্তি-কাহিনী ছাপা হয়েছিল। সেসব বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বাংলার ডাকাত' নামে বইটিতে রঘুডাকাতের কথা লিখেছিলেন। বইটি তোমাদের জন্যেই লেখা। পড়ে দেখতে পার।

রঘু ডাকাতের এক বংশধরের সঙ্গে কয়েক বছর আগে আমার আলাপ হয়েছিল। সে বোধহয় রঘুর নাতির নাতি। নাম কালী সর্দার। তারও বিশাল চেহারা। গায়ের রং মিশমিশে কালো।

তিন পুরুষ আগে নাকি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। এখন যেসব নেই। কালী চাকরি করে রেলে। থাকে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে।

কালীর কাছে রঘু ডাকাতের অনেক গল্প শুনেছি। তাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে গিয়ে বিরাট আকারের একটা খাঁড়াও দেখেছি। সেটা নাকি রঘু ডাকাতের খাঁড়া। সত্যি, খাঁড়াটা দেখলেই গা ছমছম করে!

রঘু ডাকাতকে নাকি শেষ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারেনি। আর একটা আশ্চর্য কথা কালী সর্দার আমাকে বলে। রঘু সবাইকে বলত, 'মরতেই যদি হয় শুয়ে মরব কেন? আমি দাঁড়িয়ে মরব।'

রঘু তার কথা রেখেছিল।

মৃত্যুকালে রঘুকে ধরে দাঁড় করানো হয়। দাঁড়িয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ডাকাত সর্দার রঘু।